বার্ষিক মূল্য—২৲

প্রতি সংখ্যা ।৹

বৈশাখ, ১৩৩৬

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

মুকুল

(নব পর্য্যায়)

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ সম্পাদিত

মুকুল কার্য্যালয়—১১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ক্লাসি[illegible] হইতে
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলপনা

মুকুল

নববর্ষের প্রার্থনা

চেয়ে দেখ পিতা, নবীন বরষে
আসিনু হরষ মনে,
বিকশি উঠিছে ভকতি-কুসুম
হৃদয় কুসুম-বনে।
ভালবেসে আজি পূজিব তোমায়,
তুমি মোরে ভালবেসে,
কল্যাণ করে কর আশীর্ব্বাদ
হৃদয়ের কাছে এসে।
সরসীর জল করে টল্ টল্
শতদল রহে ফুটি,
তার মত যেন জ্ঞানের আলোকে
আমিও ফুটিয়া উঠি।

অতি সুকুমার পুষ্পিত লতাটি,
মাধুরী বিকশি রয়,
সেইরূপ যেন মাধুর্য্যে আমার
স্বভাব মধুর হয়।
হরিত গোলাপ সবুজ পাতার
আড়ালে ফুটিয়া অই,
সকল শোভায় অমনিই যেন
আমিও ফুটিয়া রই।
যাহা কিছু ভাল সব যেন মোরে
মহৎ করিয়া রাখে;
নিরন্তর যেন তোমার করুণা
সহায় হইয়া থাকে।

চরিত্রের তেজে সত্যপথে যেন
দাঁড়ায়ে থাকিতে পারি,
অপরের দুঃখে দুঃখী হয়ে, যেন
মুছাই নয়ন বারি।
ওগো পিতা মোর বড় সাধ মনে
এই ধরণীর মাঝে,
প্রিয় হয়ে তব, সবাকার প্রিয়
হইব সকল কাজে।

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

স্বর্গের যাত্রী, না নরকের যাত্রী?

হারুণ অর্ রশীদ্ এক বড় বাদ্‌শা ছিলেন। বাগ্‌দাদ্ নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। একবার কোনও ঘটনায় তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল—"আমি স্বর্গের যাত্রী, না নরকের যাত্রী?" নিজে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া, তিনি বাগ্‌দাদের বড় বড় পণ্ডিত দিগকে লইয়া এক সভা করিলেন; এবং তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন—"হারুণ আর্ রশীদ্ স্বর্গের যাত্রী, না নরকের যাত্রী?" তিনি পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, "আপনারা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক, অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছেন, এবং পরমেশ্বরের বিচার প্রণালী জানেন। আপনারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।"

পণ্ডিতেরা কেহই উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "হারুণ অর্ রশীদ স্বর্গের যাত্রী, কি নরকের যাত্রী, সে কথা কেবল অন্তর্য্যামী খোদাতালাই জানেন। কোনও মানুষ ইহা বলিতে পারবে না। শাস্ত্রে ইহা লেখা নাই।"

বাদ্‌শা এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কারণ, প্রশ্নটির উত্তর জানিবার জন্য তাঁর মন নিতান্ত ব্যাকুল ছিল। তিনি দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সভার এক প্রান্তে একটি বালক দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব।" সভাস্থ সকল লোকের দৃষ্টি বালকটির উপর পড়িল। কেহ কেহ বলিল, "এই বালক নিশ্চয়ই পাগল। যেখানে বাগ্‌দাদের সমস্ত প্রবীণ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণ পরাস্ত, কোন্ সাহসে সে সেখানে দণ্ডায়মান হয়!" বাদ্‌শা কিন্তু তাহাকে বালক বলিয়া তুচ্ছ করিলেন না। তিনি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "বেশ, তুমি উত্তর দান কর।"

বালক সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, এখন আপনার দ্বারা আমার প্রয়োজন, না, আমার দ্বারা আপনার প্রয়োজন?"

বাদ্‌শা বলিলেন, "তোমার দ্বারাই আমার প্রয়োজন?"

বালক—তবে, আপনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করুন। মীমাংসাকারী পণ্ডিতের জন্য উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

বাদ্‌শা এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া, সিংহাসন হইতে নামিয়া, বালককে তথায় বসাইলেন; এবং স্বয়ং তাহার সম্মুখে নতমস্তকে দাঁড়াইলেন।

বালক বলিল, "প্রথমে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দান করুন, পরে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

বাদ্‌শা—তোমার কি প্রশ্ন, বল।"

বালক—আচ্ছা, আপনার কি কখনও এমন হইয়াছে, যে, আপনি কোনও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, তখন ঈশ্বরভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন?

বাদ্‌শা—হঁা, এরূপ হয়।

তখন বালক জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "তবে আমি বলিতেছি—হারুণ-অর্ রশীদ্ স্বর্গের যাত্রী।"

বালকের এই মীমাংসা শুনিয়া পণ্ডিতেরা গোলযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি করিয়া হয়?—কোন প্রমাণে এই কথা বলিলে?"

বালক উত্তর করিল, "কেন আপনারা কি কোরাণ শাস্ত্র পড়েন নাই? কোরাণই ইহার প্রমাণ।"

সকলে বলিলেন, "কোরাণে কোথায় এমন কথা আছে?"

বালক বলিল, "কোরাণে আছে—যে ব্যক্তি পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছে ও ঈশ্বরভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে, স্বর্গলোকে তাহার স্থান।"

পণ্ডিতেরা আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সকলে বালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কোরাণ শাস্ত্রে জ্ঞান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি বাল্যকালেই এমন, সে বড় হইলে, না জানি কিরূপ হইবে।"

বাদ্‌শাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বালকটিকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

এই বালকটির নাম শাফী। শাফী বড় হইয়া পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল—এমাম শাফী। তাঁর জীবনের উন্নতির কারণ ছিল—পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যের পথে চলা—স্বর্গের যাত্রী হওয়া।

শ্রী অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানের কথা।

তোমাদের আজ দুটি কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ কর্‌ছি। তোমাদের আজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুটি কথা বলব। তোমরা অনেকেই 'বিজ্ঞান পাঠ' ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই পড়। হয়তো বিজ্ঞানের শুকনো কথাগুলো তোমাদের ভাল লাগে না। কিন্তু মন দিয়ে ভাল করে যদি বিজ্ঞান পড় তবে এ থেকে যে কত আনন্দ ও জ্ঞান পাবে তা বলা যায় না। আজ তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুটি কথা বলব।

তোমরা পরী ও পরীরাজ্যের গল্প শুনিতে ভালবাস, না? পরীরাজ্যের সকলই সুন্দর এবং কবিত্ব ও মধুর কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া দেখিতে আনন্দ

পাও। শুভ্র ডানাশোভিত সুন্দরী পরীদিগের কথা তোমরা অত্যন্ত কৌতূহল ও বিস্ময়ের সহিত শুনিয়া থাক। কিন্তু আজ আমি তোমাদিগকে যে পরীর গল্প বলিব তাহাদের এমন অসাধারণ ক্ষমতা আছে যে, যাহা তোমাদের নিকট অসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করে! এই সব পরীরা এমন আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটাইতে পারে যে তোমরা তাহাদের কাজ দেখিলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া যাইবে এবং এই তরুণ বয়সে যেমন বৃদ্ধ-কালেও তাহাদের তেমনি ভালবাসিবে। কারণ তোমরা জলে স্থলে, শূন্যে, বনে, প্রান্তরে যেখানেই থাক না কেন, তাহাদিগকে ইচ্ছা করিবামাত্র নিকটে ডাকিতে পারিবে এবং যদিও তাহারা অদৃশ্য থাকিবে; তথাপি তোমরা তোমাদের চতুর্দ্দিকে তাহাদের কাজ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে।

তোমরা নিশ্চয়ই সেই রাজকুমারীর গল্প শুনিয়াছ, যিনি কোন পরীর রাগে অভিশপ্ত হইয়া এক শত বৎসর ঘুমাইয়া ছিলেন। সেই পরীর শাপে তাঁহার বিশাল প্রাসাদের সর্ব্বত্রই মৃত্যুর ন্যায় নীরব হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অশ্বশালায় অশ্বগুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রাঙ্গণে কুকুরগুলি, গৃহের ছাদে পক্ষিগণ, রন্ধনশালায় রাঁধুনী ও দাস-দাসী সকলেই একশত বৎসর নিদ্রিত ছিল। তারপর একদিন এক সুপ্রভাতে এক তেজস্বী রাজ-কুমারের মধুর স্পর্শে সেই রাজকুমারী এবং পরিজ-নেরা সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। তোমরা এই গল্প শুনিয়া নিশ্চয়ই অবাক হইয়া যাও, না? কিন্তু আজ তোমাদের বলিতেছি যে বিজ্ঞানও এই-রূপ অদ্ভুত কাজ করিতে পারে। আচ্ছা, বল ত, জলের অপেক্ষা কর্ম্মে ব্যস্ত ও ক্রিয়াশীল এ পৃথিবীতে আর কে আছে?

জল যখন খরবেগে নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, কিম্বা বড় বড় পাথরের উপর দিয়া ভীমবেগে লাফাইয়া নীচে পড়ে, অথবা মাটি ভেদ করিয়া ঝির ঝির করিয়া ঝরণা দিয়া বহিয়া যায় এবং প্রবল বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে নদীতে উত্তাল তরঙ্গ তুলে, তখন কি মনে হয় না যে জল সর্ব্বদা কি কর্ম্মে ব্যস্ত, সর্ব্বদাই কাজ করিয়া যাইতেছে? কিন্তু যে সব দেশে বরফ পড়ে সেই সব দেশে শীতকালে দেখিবে যে ঐ ঝরণার ঝির ঝির জল বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে, নদীর খরস্রোত আসিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ঠিক ঐ গল্পের রাজ-কুমারী যেমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি প্রকৃতির সব যেন কাহার শীতল স্পর্শে নিথর হইয়া পড়িয়া-ছে। কিন্তু অপেক্ষা কর, মুক্তিদাতা রাজকুমার শীঘ্রই আসিতেছে। শীতের অবসানে বসন্তের প্রারম্ভে যখন সূর্য্য-কিরণে আবার দেশ উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ করে তখনি দেখিবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীর জল আবার কুলকুল নাদে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঝরণার জল ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইয়া সমস্ত প্রকৃতি আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন তোমাদের নিকট কি পরীর গল্পের মতই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয় না? বিজ্ঞান এই রকম অদ্ভুত গল্পই বলে।

তোমরা আর একটি পরীর গল্প জান কি? এই পরী একটা আখরোট ফলের মধ্যে পুরিয়া তিনটী সুন্দর রেশমী শাড়ী আনিয়াছিলেন। একটির রঙ ছিল সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, আর একটির রঙ জ্যোৎস্নার মত নীল, তৃতীয় শাড়ীটীর নীল জমিতে জরির ফুল তোলা ছিল, তাহাতে ইহাকে ঠিক যেন নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের মত দেখাইতেছিল। তিনটী শাড়ীই এমন নরম ও

সূক্ষ্ম ছিল যে একটি আখরোট ফলের মধ্যে তিনটী-কেই অনায়াসে পুরিয়া রাখা যাইত। তোমরা এই গল্পটী শুনিয়া নিশ্চয়ই অবাক হইয়া যাইতেছ। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা অশ্চর্য্যজনক গল্প বলিতে পারে। বিজ্ঞানের এইরূপ এক গল্প তবে শুন।

বিজ্ঞান পড়িলে আমরা একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র shellএর বিবরণ জানিতে পারি। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের একদলকে একত্র করিয়া একটি পিনের মাথায় রাখা যাইতে পারে। আর তাহা-দের হাজার হাজারকে এক সঙ্গে করিয়া একটি আখরোট ফলের মধ্যে রাখা যায়। এই এক একটি ক্ষুদ্র shell কেবল একটা অচেতন পোষাক নহে প্রত্যেকটি একটী জীবন্ত প্রাণীর বাসস্থান। এই shellএর প্রাসাদ-নির্ম্মাণ-প্রণালী এরূপ সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্যময় যে প্রত্যেকটি দেখিলে মনে হয় এটি অন্যটির চেয়ে সুন্দর। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ক্ষুদ্র প্রাণীটি এই অপরূপ কারু-কার্য্যময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে সে সমুদ্রের ফেণা হইতে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীটীর আকার এক ফোঁটা জেলির মত। এখন বল, বিজ্ঞানের এই গল্পটি ও কি ঐ পরীর গল্প অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলপূর্ণ ও আশ্চর্য্যজনক নয়?

তোমাদের মধ্যে যাহারা অদ্ভুত পথিকদের গল্প পড়িয়াছ তাহাদের বোধ হয় সেই পথিকটির কথা মনে আছে, যাহার দৃষ্টিশক্তি এমন প্রখর ছিল যে সে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গাছে উপবিষ্ট একটি চক্ষু অনায়াসে তীর দিয়া বিঁধিতে পারিত। তোমরা এই গল্পটি শুনিয়া নিশ্চয়ই অবাক হইয়া যাও। কিন্তু বিজ্ঞান তোমাদিগকে ইহার চেয়েও অদ্ভুত অথচ সত্য গল্প বলিতে পারে। বিজ্ঞানের সেই কথাটি তবে তোমরা শোন। তোমরা কি গ্যাস জ্বালিবার আগে তাহাকে দেখিতে পাও? কখনো পাও না। গ্যাস যখন ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে তখনি তাহাকে তোমরা দেখিতে পাও; তাহার আগে নয়। কিন্তু তোমরা যদি বিজ্ঞান পড়িয়া spectroscope নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে শিখ, তাহা হইলে তোমরা তাহার সাহায্যে ৯১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যের মধ্যস্থিত বিভিন্ন গ্যাসের প্রত্যেক পরিচয় পাইতে পারিবে, এমন কি কোটি কোটি মাইল দূরস্থিত নক্ষত্রগুলির গ্যাসের বিভিন্ন প্রকৃতির কথা তোমরা জানিতে পারিবে এবং আমাদের এই পৃথিবীতে যে সকল ধাতু আছে ঐ সব নক্ষত্রে তাহা আছে কিনা তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে বলিতে পারিবে।

বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা এইরূপ শত শত পরীর গল্পের মত আশ্চর্য্যজনক গল্প দেখিতে পাই। এখন চল বিজ্ঞান পরীদের সহিত পরিচয় করিয়া লই।

আমাদের চারিদিকে ঐ গল্পের পরীদের অপেক্ষা অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিস্ট কতকগুলি শক্তি নিয়ত কার্য্য করিতেছে। এই সকল শক্তির কার্য্যকরী ক্ষমতা ঐ সব মিথ্যা পরীদের ক্ষমতা অপেক্ষা হাজার হাজার গুণে চমৎকার, আশ্চর্য্য-জনক ও সুন্দর। এই সব শক্তিও আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। এই সব অদৃশ্য শক্তিকে জানিতে চাহিলে তবে ইহাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও অদ্ভুত কাজের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার পরিচয় একবার পাইলে বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইতে হয়। কত লোক এই সব আশ্চর্য্য শক্তির কথা জীবনে একবারও জানিতে না পারিয়া এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। এই সব লোক এ পৃথিবীতে যেন চক্ষু বন্ধ করিয়াই চলে। তাহা-দের চারিদিকে যে কত আশ্চর্য্যজনক কাজ সব হইতেছে তাহা দেখে না। হয়ত কেহ যদি তাহা

দিগকে দেখিতে শিখাইত তাহা হইলে তাহারা এই সব কাজ দেখিয়া কত আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু তাহারা নিজেদেরই ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা লইয়া সর্ব্বদা খুঁত্ খুঁত্ করে কিম্বা নিজেদেরই কাজ লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত থাকে। তাহারা জানে না যে একবার যদি চক্ষু খুলিয়া প্রকৃতির এই সব মনোরম ও অদ্ভুত কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইতে পারিত তবে তাহাদের অশান্ত মন কেমন শান্ত ও সুখী হইতে পারিত।

সুন্দর প্রভাতে খেলামাঠে গিয়া বসিয়া একবার প্রকৃতির কাজগুলি চুপ করিয়া দেখ। কেমন ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। তাহার মধুর স্পর্শে শরীর কেমন ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ সাদা সাদা মেঘগুলি কেমন অলসভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নদীর দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন মৃদু মন্দ ঢেউ তুলিয়া কুল কুল স্বরে নদী বহিয়া যাইতেছে। ফুলের দিকে দেখ, কেমন কুঁড়িগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতির এই সব কাজ দেখিয়া কি তোমাদের জিজ্ঞাসা কবিতে ইচ্ছা হইতেছে না যে, "কাহার শক্তিতে এই সব কাজ হইতেছে ?"

(ক্রমশঃ)

দুই বন্ধু

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করে ও বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নলিন ও বিপিন দুই বন্ধু। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে ভবানীপুরের পাশাপাশি দুই বাড়ীতে উভয়ের বাল্যকাল কাটিয়াছিল। পরে নলিনের পিতা কলিকাতার উত্তরাংশে বহুবাজার অঞ্চলে উঠিয়া যান। সেখানে দালালি ব্যবসায় করিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন ও তিনখানি বাড়ী তৈয়ারী করেন। একখানিতে বাস করিবেন, আর দুখানি ভাড়া দিবেন। বিপিনের পিতা ভবানীপুরেই রহিয়া গেলেন।

তার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। উভয়েরই বাবা মা মারা গিয়াছেন। উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু নলিন কুসঙ্গে পড়িয়া সুরাপান অভ্যাস করিয়া অনেক টাকাকড়ি নষ্ট করিয়াছে। বিপিন একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির হিসাবী মানুষ। সে পরিশ্রম করিয়া নিজের অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়াছে। কুসঙ্গে পড়িয়া নলিনের মতি-গতি বদলাইয়া যাওয়াতে বিপিন মনে মনে বড়ই কষ্ট পায়। কিন্তু এখনও উভয়ে উভয়কে আগের মতই ভালবাসে। বিপিন বয়সে একটু বড় বলিয়া নলিন তাঁহাকে বিপিন্ দা বলিয়া ডাকে।

পৌষ মাস। ঠিক সন্ধ্যার সময় এক দিন নলিন কালীঘাটের ট্রাম হইতে ভবানীপুর থানার সম্মুখে নামিয়া পড়িল। তাহার পর প্রায় দশ মিনিট চলিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বারবান তাহার গোঁপযোড়াতে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে নলিনের পানে অর্দ্ধমিনিট কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"নেহি হ্যায়।"

নলিন বলিল—"বাবু কাঁহা গিয়া ?"

দ্বারবান কথাটা কাণে তুলিল না—খানসামার সহিত গল্প করিতে লাগিল। বড়লোকের বাড়ীতে যাহারা মোটরকার বা ভাল গাড়ীতে চড়িয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের দেখিয়া দ্বারবানেরা দাঁড়াইয়া উঠে, সেলাম করে;—যাহারা ভাড়া গাড়ীতে যায়, তাহাদের কতকটা খাতির করে, কিন্তু যাহারা পায়ে হাঁটিয়া যায়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্যই করে না।

নালন কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—"এ দারোয়ানজী, বাবু কাঁহা ?"

হিন্দুস্থানীদের জী বলিয়া ডাকিলে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। নলিন"জী" বলাতে দ্বারবানের অনুগ্রহ হইল; বলিল—"বাবু ময়দানসে হাওয়া খানেকো গয়ে হ্যায়। কাহে, কুছ কাম হ্যায় ?"

"হাঁ ?—বহুত জরুরি কাম হ্যায়।"

"আপ কৌন হ্যায় ?"

"বাবু হামকো পছান্তে হেঁ।"

"বৈঠিয়েগা ? আইয়ে।" বলিয়া দ্বারবান নলিনকে ভিতরে লইয়া গেল। বাগান পার হইয়া বাহির-বাটীর প্রশস্ত বারান্দা। সে বারান্দায় একদিকে একটি ঘর, অপর প্রান্তে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। ঘর হইতে একখানি চেয়ার বাহির করিয়া দ্বারবান, নলিনকে সেই বারান্দায় বসাইল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গৃহস্বামী ভ্রমণ করিয়া ফিরিলেন। নলিন তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। গৃহস্বামী বলিলেন—"কে ?"

নলিন ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"আমি" আলোক নলিনের পশ্চাতে ছিল। তাই গৃহস্বামী অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। নলিন তখন বলিল,—"বিপিন দা, চিনতে পারলে না ?" বিপিন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"নলিন ? এস, এস। কখন এলে ?"

"এই কতক্ষণ।"

"চল, উপরে চল"—বলিয়া নলিনের হাতটী ধরিয়া তিনি উপরে লইয়া গেলেন। একটি বিদ্যুৎ আলোকিত সুসজ্জিত ঘরে গিয়া দুজনে বসিলেন। চাকর আসিয়া বিপিনবাবুর বুট খুলিয়া চটি জুতা পরাইল, অলষ্টার খুলিয়া লইয়া আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিল।

"তারপর নলিন—খবর কি বল। কতদিন যে এদিকে আসনি মনেই পড়ে না। আমার বোধ হয় দুবছর কি তিন বছর হবে। একদিন বউমাকে খুকীকে নিয়ে এসেছিলে মনে পড়ে ? খুকী কেমন আছে।"

"ভাল আছে। তারপর একটি ছেলেও হয়েছে।"

"বটে—বেশ বেশ। ছেলেটি কতদিনের হল ?"

"দুবছরের হয়েছে।"

"দেখ —এখবরটা পর্য্যন্ত আমায় দাওনি ? অথচ এক সময় ছিল—যখন তোমায় আমায় প্রতিদিন অন্ততঃ একবার দেখা না হলে, দিনটে অন্ধকার মনে হত। এই বাড়ীর প্রত্যেক ঘর, বাগান আস্তাবল পর্য্যন্ত ছেলেবেলায় দুজনে কত তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। ওঃ—কি দুষ্টুই ছিলাম আমরা।" বলিয়া বিপিনবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। নলিন দুঃখের স্বরে বলিল,—"আর আজ তোমার দারোয়ানটা বল্লে, বাবু আপ কোন হ্যায় ?"

"ওর অপরাধ কি বল ! তুমি ত আজকাল আসই না। ও ত এক বৎসর মাত্র আমার চাকরী করছে। ও তোমাকে চিনবে কি করে ? সে কথা থাক্। বউমা ভাল আছেন ত ? একটু চা

খাবে ?”—বলিয়া বিপিন বাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিলেন।

চা পান করিতে করিতে বিপিন বাবু বলিলেন, —“এখনও সে সব পুরো দমে চলছে নাকি ?”

নলিন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। বিপিন-বাবু বিষণ্নস্বরে বলিলেন—“দেখ নলিন, ও সব-গুলো এখনও ছাড়তে পারলে না ? এখন তোমার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, তুমি ছেলেপিলের বাপ হয়েছ। আর কেন ? একেবারে ছাড়তে না না পার, ক্রমে পরিমাণে কমাও। কমাতে কমাতে একেবারে বন্ধ করে দিও।”

নলিন আকুল নয়নে বলিল, “দেখ বিপিন-দা, আমার কি অনিচ্ছা আমি ছাড়ি ? কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠিনে যে। প্রতি বৎসর তিনবার করে প্রতিজ্ঞা করি যে আর মদ স্পর্শ করব না—একবার ইংরাজী নববর্ষে, একবার বাংলা নববর্ষে, একবার নিজের জন্মদিনে প্রতিজ্ঞা করি।* কিছুদিন ভাল থাকি। তারপর আবার যে-কে সেই”—বলিয়া নলিন আবার মস্তক নত করিল। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বিপিনবাবু বলিলেন—“দেখ, তুমি যদি ছাড়তে চাও, তা হলে শুধু মদ ছাড়ব এই প্রতিজ্ঞা করলেই হবে না। যাদের দলে পড়ে তুমি মদ ধরেছ সেই দল পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে। সেই দলে মিশবে —অথচ মদ ছাড়বার প্রতিজ্ঞা বজায় থাকবে— এ অসাধ্য—অসম্ভব। দলটী ছাড়।”

“তাই ছাড়ব। এক সপ্তাহ ওদের কাছে মোটেই যাই নি। আমি আজ এক সপ্তাহ মদ খাইনি—তা জান বিপিনদা ? কিন্তু এবারও সত্যি সত্যি ছাড়তে পারলাম, কিম্বা অন্য অন্য বার যেমন হয়েছে, এবারেও তেমন হবে—তা এখনও বলতে পারি-নে। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি। জোর করে মদ খাওয়া বন্ধ রেখেছি বলে শরীরে অসহ্য যাতনা ভোগ করছি। দিনে রাতে পনেরো ষোল বার চা খাই। এই তুমি চা দিলে, খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করছি। যা হোক্ এবার ত আমার মদ না ছেড়ে আর উপায় নেই। এবার একেবারে ডুবতে বসেছি—তা জান ?”

বিপিন বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—“না—কি হয়েছে, কি হয়েছে ?”

“অনেক ধার হয়ে গিয়েছে। বাড়ী তিন-খানা কয়েক বৎসর থেকে ঋণের জন্য মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। তারা নোটিস দিয়েছে, এক মাসের মধ্যে যদি টাকা পরিশোধ না করি, তা হলে তারা বাড়ী নিয়ে নেবে।”

বিপিনবাবু বিমর্ষভাবে বলিলেন—“সুদে আসলে কত টাকা ঋণ হয়েছে ?”

“বিশ হাজারের উপর প্রায় একুশ হাজার।”

“অ্যাঁ ?—বল কি ! এই ক-বছরে তুমি এই ক'রে বসেছ ?”

নলিন নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—“আর এক পেয়ালা চা আনাও ভাই।”

বিপিনবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া চা আনিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—“এখন উপায় ?”

নলিন কম্পিত স্বরে বলিল—“ভাই, এখন উপায় তুমি। তাই আমি আজ তোমার কাছে এসেছি। তিন বছর তোমার কাছে আসি নি—

* মুকুলের পাঠক পাঠিকা তোমরা বল ত, কোনও মন্দ অভ্যাস ছাড়িতে হইলে, বা ভাল অভ্যাস করিতে হইলে, যে লোক তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া আরম্ভ করে, সে সফল হয় ? না, যে ভাল দিনের জন্য অপেক্ষা করে, সে সফল হয় ?

আজ এসেছি। তুমি ত ছেলেবেলা থেকে আমার শত অপরাধ ক্ষমা করেছ, আর একবার ক্ষমা কর। তুমি আমায় টাকাটা ধার দাও, আমি বাড়ীগুলো উদ্ধার করি। নইলে আমার সবই গেল। ছেলে-পিলে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে”—বলিয়া নলিন মুখ নত করিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিপিনবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

চা আসিল। পান করিতে করিতে নলিন তাহার বাল্যবন্ধুর পানে চাহিয়া তাঁহার মনের গতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপিন কি টাকা ধার দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে? বিপিনবাবু যেন একটু অন্যমনস্ক।

নলিন বলিল,—“কি বল বিপিনদা, টাকাটা দিবে?”

“অ্যাঁ?—টাকা”—বলিয়া বিপিনবাবু পুনরায় ঘড়ির পানে চাহিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া এক-খানা চিঠি মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন। চিঠি পড়া শেষ হইলে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—“গাড়ী যোৎনে বোলো—রমেশ বাবুকে হুঁয়া হামরা নিমন্ত্রণ হ্যায়।”

নলিন এতক্ষণ বিষণ্ণ মনে অপেক্ষা করিতে-ছিল। এখন বলিল—“বিপিন দা, কি বল? আমি ভাড়াটে বাড়ী দুখানা বিক্রী করে দেনা শোধ করি,—আর বাকী যে ক’টা টাকা হাতে থাকবে, তাও বছর খানেকের মধ্যে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিই, তারপর অন্নাভাবে মুটেগিরি করি—তাই কি তোমার ভাল মনে হয়?”

বিপিনবাবু অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। চা শেষ করিয়া নলিন বলিল—“বিপিনদা, কি বল? তুমিই আমার বাড়ীগুলো বন্ধক রাখ—রেখে আমাকে টাকা ধারা দাও”—বলিয়া সে বিপিন-বাবুর মুখপানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিপিনবাবু বলিলেন,—“ধার করে ধার শোধ করা যেন একটা গর্ত্ত কেটে আর একটা গর্ত্ত বুজানো। তাতে কি লাভ? তার চেয়ে একখানা ভাড়াটে বাড়ী বিক্রী করে ফেল না কেন?”

“তাতে কুলোবে না বিপিনদা। ভাড়াটে বাড়ীগুলোর দাম তত বেশী নয়। ভাড়াটে দুখানা বাড়ীই যদি বিক্রী করা যায়, তা হলে ধার শোধ হ’তে পারে বটে—বরং হাজার পাঁচেক টাকা উদ্বৃত্তও থাকতে পারে। কিন্তু বাড়ী দুখানার ভাড়া থেকে আমার সংসার খরচটা চলে যায়। বাড়ী দুখানা যতদিন আছে, ততদিন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য কোনও ভাবনা নেই। তা ছাড়া আরও একটা কথা। পৈত্রিক টাকা নাই, জিনিষ পত্র যা কিছু ছিল সবই ত আমি মদ খেয়ে খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছি, শুধু বাড়ী ক’খানা বাবার চিহ্ন বাকী আছে, তাও যাবে একথাটা ভাবতেও প্রাণে লাগে। আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি, এবার রক্ষা পেলেই পৈত্রিক ব্যবসা আরম্ভ করব। বাবা ত এই দালালী করেই যেমন করে হোক মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার করেছেন। তিনি যে সব কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করিতেন আমি তাদের বড় সাহেবদের সঙ্গে এ কদিনে দেখাও করেছি। বাবার নাম শুনে, তারা সকলেই আমাকে কাজ দিবার আশা দিয়েছেন। তবু অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করাটা ঠিক নয়। মনে কর, আমি যদি দুদিন পরে মরেই যাই, আমার ছেলেপিলে খাবে কি?”

“তা তো ঠিক”—বলিয়া বিপিনবাবু ঘড়ির পানে দৃষ্টি করিলেন। চেয়ারের উপর একবার এ

পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন যেন একটা অস্থিরতা আসিয়া পড়িয়াছে।

"কত টাকা বল্লে?"

"একুশ হাজার টাকা দেনাশোধ করবার জন্যে। আর হাজার চারেক টাকা দালালী ব্যবসায় আরম্ভ করবার জন্যে দরকার—এই পঁচিশ হাজার।"

বিপিনবাবু কেবল মাত্র বলিলেন—"হুঁ"

নলিন বলিল—"ভাই, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। এটুকু উপকার কি তোমার কাছে আমি প্রত্যাশা করিতে পারিনে? ব্যাঙ্কে তোমার কত লাখ টাকা পড়ে রয়েছে। এক শত টাকায় বছরে চার পাঁচ টাকার বেশী সুদ পাও না। আমার মহাজনেরা আমার কাছ থেকে বছরে শত করা বারো টাকা সুদ নেয়—আমি সেই সুদ তোমায় দেব। প্রতি বছরের সুদ আসলে গিয়ে জমা হবে। আমার দুখানা ভাড়াটে বাড়ী আর একখানা বসতবাড়ী এই তিন খানার যা দাম, দশ বছরের সুদে আসলেও তত টাকা হবে না। তোমার টাকা মারা যাবে না ভাই।"

বিপিনবাবু নলিনের কথার উত্তর না দিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য কোন কোন বস্ত্রাদি বাহির করিতে হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া অবশেষে নলিন বলিল, "দেখ বিপিনদা, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছ, "এতগুলো টাকা এই অপব্যয়ী লোকটাকে ধার দিব—শোধ করতে কখনও পারবে না। অথচ এর নামে নালিশ করে বাড়ীগুলো বিক্রী করে নেওয়া, সেও বিষম চক্ষু-লজ্জার ব্যাপার। বাল্যবন্ধুকে ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করলে লোকেই বা বলবে কি। আচ্ছা ভাই, আমি আর একটা প্রস্তাব করছি। বাড়ী তিনখানা আমি পাঁচ বছরের মেয়াদে তোমায় 'কট্‌কবালা' লিখে দিচ্ছি। তাতে লিখে দিচ্ছি যে, যে দিন পাঁচ বছর শেষ হবে, সে দিন বা তার আগে, সুদে আসলে যদি তোমার সমস্ত টাকা আমি পরিশোধ করতে পারি, উত্তম, তা হ'লে বাড়ী আমার থাকবে। যদি না পারি, তবে পাঁচ বছর পূর্ণ হ'লে সেই দিনই বাড়ী তোমার হয়ে যাবে। তোমাকে আর নালিশ করতে বা মোকদ্দমা করতে হবে না। এ প্রস্তাবে কি বল?"

এতক্ষণে যেন বিপিনবাবুর অন্যমনস্ক ভাবটা ঘুচিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, শয়ন কক্ষে বস্ত্রাদি প্রস্তুত। বিপিনবাবু বলিলেন—"আভি থোড়া দের হায়। দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী যোতা হইয়াছে। তাহাকে বলিলেন—"আভি আধা ঘণ্টা দের হায়।" নলিনীর মনে ভরসা হইল।

তখন অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া দুইজনে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। বিপিনবাবু টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নলিন বলিল—"আমি দালালী ব্যবসা করে যা কিছু উপার্জ্জন করব বিপিনদা,—সব দিয়ে এই ঋণ শোধ করব। সংসার খরচ আমি বাড়ী দুখানার ভাড়া থেকেই চালিয়ে নেব। যেমন করে আমার ত খুব আশা হয় তিন বছর হলে টাকাটা শোধ হয়ে যাবে। তবু আরও দুটো বছর হাতে রাখবার জন্য পাঁচ বছর নিলাম। না—এবার আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। মদ আমার কাছে আজ থেকে গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। নাক খৎ কাণ মলা—যদি আমি আর মদের সীমানায় যাই। যে রাস্তায় মদের দোকান সে রাস্তা দিয়েই আমি আর হাঁটব না। আর এক পেয়ালা চা হুকুম কর।"

সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত ঠিক ঠাক হইয়া গেল। দলিলাদিও রেজেষ্ট্রী হইল। (ক্রমশঃ)

অতীতের প্রতিধ্বনি

গাছের কথা

(অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু)

গাছেরা কি কিছু বলে ? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন ? গাছ কি কোন দিন কথা কহিয়া থাকে ? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে ? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না ; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটা কথা বলে, তাহাও এমন আধআধ ভাঙ্গাভাঙ্গা, যে, অপরের সাধ্য নাই যে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহাও নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়াও বলে না ; চক্ষু, মুখ, হাত নাড়া, পা নাড়া প্রভৃতি আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা কয় ; আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ী হইতে একটি মুরগী উড়িয়া আসিয়া আমাদের প্রাচীরে বসিল। বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মুরগীর সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়, খোকা মুরগীর অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। "মুরগী কি রকম ডাকে ?" বলিলেই ডাকিয়া দেখায় ; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বলিতে আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। একদিন বাড়ী আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে ; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত বালক সমস্ত দিন বাড়ী অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর মুরগীর ডাক ডাকিল। ঐ মুরগীর ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, "খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ ? খোকা তোমাকে বড় ভালবাসে।" আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোন কথা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, মুরগীর ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে ? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায় ; অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলে অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিম্বা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি খালি লাগিত। তার পর আমার গুরু আমাকে গাছ, পাখী, কীট পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখাইয়া দেন ; আমি এখন তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে তাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে

পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন দান উদ্ভিদে সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন যেন মানুষের জীবনের ছায়া। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটী ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের তলাতে এক পার্শ্বে একটী শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে। আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছু কাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা বল ত এই গাছ ও এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটী বাড়িতেছে আর মরা ডালটী ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে আর অন্যটীতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটী লক্ষণ এই যে তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে কোন জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম। বীজের মধ্যেও এইরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটী, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা, তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানা প্রকার, কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্ম। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে শস্যের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখীরা ফল খাইয়া দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমূল ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায়, তখন তাহার মধ্য হইতে দু একটী বীজ তূলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম। হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তূলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন রাত্রি দেশ দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না কেহ বলিতে পারে না। হয় ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটী চাই।

সেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ শিশু অনেক দিন পর্য্যন্ত বীজের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকে।

বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটীকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে। ম্যাপে মিশর দেশ দেখ। সে দেশে 'পিরামিড' নামে এক প্রকার সমাধি মন্দির দেখা যায়। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক একটী ঘরে সেকালের রাজাদের সমাধি আছে। মৃতদেহ একটী বাক্সে বন্ধ করিয়া সেই ঘরে রাখিয়া দিত, সেই সঙ্গে পাত্রে নানাবিধ শস্য মৃত ব্যক্তির সম্মুখে রাখিত। সেই সব শস্য পাওয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, সেই ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন বীজ মাটীতে রোপণ করিবার পর তাহা হইতে গাছ জন্মিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য কথা! এত সহস্র বৎসর বীজ ঘুমাইয়া ছিল, মাটীর স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। এতকাল কে যত্ন করিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে। ধান যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটী গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটী বীজ সমস্ত দিন রাত্রি মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙ্গা ইট কিম্বা মাটীর ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটীতে বীজটী ঢাকা পড়িল এখন বীজটী মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী ধাত্রীর ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষশিশুটী মাটীতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপ নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটী ঘুমাইয়া রহিল।

মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয় গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দু এক দিন বৃষ্টি হইল। জলের স্পর্শে ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্য্যের কিরণ দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটী খসিয়া পড়িল, দুটী কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া মাটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল আর এক অংশ মাটী ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটী যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নূতন দেশ উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

(ক্রমশঃ)

সোণার খণির সন্ধানে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পরে)

একাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলা ও সরযূ যে বাড়ীতে থাকে, তাহারই নিকটে একবাড়ীতে যাত্রাগান হইতেছিল। সেখানকার বাজ্‌না ও গান শুনিয়া বাড়ীর আব্দারে ছেলেটি তাহা শুনিতে যাইবার জন্য আব্দার আরম্ভ করিল। অমনি মায়ের হুকুম হইল, "নির্ম্মলা, এখনি খোকাকে যাত্রা শুনাতে নিয়ে যাও।" তা, যাত্রা শুনিতে যায় ত যাউক না, তাহার গলায় আবার সোণার হার পরাইয়া ভিড়ের মধ্যে পাঠানো কেন? গিন্নির যে কি রকম বুদ্ধি, তাহা কে বলিবে? নির্ম্মলা সেই আব্দারে ছেলে, আর নিজের বোন সরযূকে লইয়া যাত্রা শুনিতে গেল। তাহারা অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যাত্রার আসরে ঢুকিল।

সেদিন রাম-রাবণের যুদ্ধ যাত্রা হইতেছিল। প্রথমে জন কয়েক লোক গায়ে লোম লাগাইয়া, মুখে কালি মাখিয়া, পেছন দিকে একটি লেজ জুড়িয়া দিয়া, হনুমান সাজিয়া আসরে আসিল। তার পরেই রাক্ষসের দল দেখা দিল। তাহাদের মুখে, রঙমাখা, দাঁত বাহির করা রাক্ষসের মুখোস। বাজনা বাজিল, সেই সঙ্গে রাক্ষস আর হনুমানের দল হাতে এক একখানা গাছের ডাল লইয়া ধেই ধেই নাচিতে লাগিল। নাচের পরেই দুই দলে কথার কাটাকাটি, কথার কাটাকাটির পরেই আবার বাজ্‌না বাজিল, দুই দলে লড়াই আরম্ভ হইল। নির্ম্মলা ও সরযূ উহা দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। অবশেষে দুঃখিনী সীতা আসরে আসিলেন, রাক্ষসীরা তাঁহার কোমল অঙ্গে প্রহার করিতে লাগিল। সীতার দুঃখ দেখিয়া নির্ম্মলার দুই চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

যাত্রা শেষ হইলে পরে, মানুষগুলি ঠেলাঠেলি করিয়া আসর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল। এই গোলমালের ভিতর কখন কে যে বাড়ীর দুষ্টু ছেলেটির গলার সোণার হার চুরি করিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিতেই পারিল না। ছেলেকে লইয়া বাড়ীতে আসার পরেই গিন্নি কহিলেন, "খোকার সোণার হার কি হল?"

আর হার কি হইল? সে ত চুরি গিয়াছে। কিন্তু গিন্নি নির্ম্মলা ও সরযূকে কহিলেন, "ও হার তোমরাই চুরি করেছ, এখনি তোমাদের ধরে পুলিসের হাতে দেব।"

এই কথা শুনিয়াই ভয়ে নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কহিল, "গিন্নি মা, সত্যি বল্‌ছি, আমরা হার চুরি করি নি; আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের পুলিসের হাতে দিবেন না; পুলিস যে মেরে আমাদের খুন কর্‌বে।"

গিন্নি বলিলেন—"খুন কর্‌লে আমার কি হবে? পুলিসের হাতে না দিলে, আমিই কি ছেড়ে কথা বল্‌ব নাকি? মেরে হাড় গুঁড়ো কর্‌ব না?"

গিন্নি একখানা লোহার হাতা হাতে লইয়া দুটি মেয়েকে খুব মারিলেন, তাহার পরে একটি ছোট ঘরে তাহাদের বন্ধ করিয়া রাখিলেন; বলিলেন, "আজ আর তোমাদের নাইতেও দেব না,

খেতেও দেব না, সমস্ত দিন এই ঘরেই দুজনকে বন্ধ করে রাখ্‌ব।”

দুটি বোন অনাহারে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত ঘরের ভিতরেই বন্ধ রহিল। তাহার পরে কি জানি কি ভাবিয়া গিন্নি ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কিছু খাইতে দেবার নামও করিলেন না। অথচ তিনি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছেন, ঐ দুটি মেয়ের কেহই হার চুরি করে নাই, তেমন স্বভাবই তাদের নয়; ভিড়ের মধ্যে চোরই হার চুরি করিয়াছে!

নির্ম্মলা আজ আবার তাহার ছোট বোনটিকে সঙ্গে লইয়া, মোজা বিক্রি করিবার জন্য সেদিনকার সেই মেয়েদের বোর্ডিংয়ে চলিল। আমরা অনেক আগে যে সরলা মেয়েটির কথা লিখিয়াছি, সে পড়াশুনা করিবার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিয়াছে এবং মেয়েদের বোর্ডিংয়েই আছে। আজ ছুটির দিন কিনা, তাই সে একটি ঘরে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল। এমন সময়ে তাহারই ঘরের কাছে নির্ম্মলা ও সরযূ গিয়া দাঁড়াইল। সরলা চাহিয়া দেখিল, পরীর মতন সুন্দর দুটি মেয়ে, অথচ তাহাদের পরণের মলিন কাপড় দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বড়ই দুঃখিনী। সরলা মেয়ে দুটিকে কাছে ডাকিয়া বড় মেয়েটিকে কহিল, “তোমার নাম কি?”

নির্ম্মলা। আমার নাম নির্ম্মলা।

সরলা। তোমরা কোন্ জাত?

নির্ম্মলা। বামুন।

সরলা। তুমি কি কর?

নির্ম্মলা। ছেলেমেয়ে রাখি।

সরলা। তোমাদের আর কে আছেন?

নির্ম্মলা। কেউ নেই।

সরলা। সে কি? তোমাদের কেউ নেই? তবে তোমরা কোথায় থাক?

নির্ম্মলা তাহাদের সমস্ত কাহিনী সরলাকে বলিল। সরলা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে নির্ম্মলাকে কহিল, “তুমি যে বল্‌ছ, তোমার এক দাদা ছিলেন, তিনি জলে ডুবে মরেছেন, সে দাদার নাম কি ছিল?”

নির্ম্মলা। সুরেশ।

সরলা আপন মনে বলিল, “কি আশ্চর্য্য! এই দুটি মেয়ে যে তা হলে সুরেশ দাদারই বোন। তিনি ত আমাকে তাঁর জীবনের কাহিনী বল্‌বার সময়ে বলেছেন, নির্ম্মলা নামে তাঁর একটি বোন ছিল। এদের চেহারা দেখ্‌লে ত সুরেশ দাদার কথাই মনে পড়ে।”

সরলা তৎক্ষণাৎ মেয়ে দুইটিকে লইয়া বোর্ডিংয়ের কর্ত্রীর কাছে গেল। অনেক মেয়েও সেখানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সরলার অনুরোধে, নির্ম্মলা আবার করুণস্বরে তাহাদের সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সরলা কহিল “মেয়ে দুটি তাদের যে দাদার কথা বল্‌ছে, তিনি বেঁচে আছেন। কিছুদিন দার্জ্জিলিঙে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার মা তাকে আপনার ছেলের মত এবং আমি তাঁকে ভায়ের মতনই মনে করতুম। কিন্তু এখন তিনি নিরুদ্দেশ, কোথায় যে আছেন, আমরা তা কিছুই জানি না।”

বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী কহিলেন, “সরলা আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুটি মেয়ের চোখ মুখ একেবারে তোমারই মতন! মেয়ে দুটী যেন তোমারই বোন।”

দুটী মেয়ের উপরে সরলার মনটা যেন একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল, ভালবাসায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সরলা কহিল, “তোমাদের মুখ

দেখে মনে হয়, তোমরা দুজনেই খুব কেঁদেছ ; কি হয়েছিল, বল ত ? আজ তোমরা কিছু খেয়েছ ?"

নির্ম্মলা। আজ আমরা কিছুই খেতে পাইনি। গিন্নির ছেলের হার চুরি গিয়াছে কি না,—আমরাই তা চুরি করেছি মনে করে গিন্নি আমাদের একটী ঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করে রেখেছিলেন।

নির্ম্মলার কথা শুনিয়া বোর্ডিংয়ের মেয়েরা কহিল, "মাগো মা! গিন্নি কি রকম মানুষ? তোমরা আবার হার চুরি করবে? এমন মিথ্যা কথায় কার বিশ্বাস হবে ?"

সরলার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে এই কয় মাস হইল এখানে আসিয়াছে, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মহত্বের পরিচয় পাইয়া শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ অবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

আজ সরলার জন্মদিন। তাই বোর্ডিংয়ের সবাইকে খাওয়াইবার জন্য তাহার পিতা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই আজ সকলের খাবার জন্য লুচি, তরকারি, মাংস ও মিষ্টান্ন রান্না করা হইয়াছে, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা ও নানারকম সুমিষ্ট ফল বাজার হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। সরলা স্বহস্তে দুখানি থালায় ও রেকাবে খাদ্য সামগ্রী সাজাইয়া খাবার ঘরে লইয়া গেল, তার পরে মেয়েদুটীকে সেখানে ডাকিয়া, সে তাহাদের কাছে বসিয়া নানা রকম খাবার খাওয়াইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বোর্ডিংয়ের ছাত্রী শোভা সুধাকে কহিল—

"সত্যি ভাই, সরলা দিদি যে কি রকম ভাল মেয়ে, আমি যেন তা বলে বোঝাতে পারিনে।" রাজার মেয়ের মতন দেখতে সুন্দরী, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, অথচ বাবুগিরি একটুকু নেই। গয়নার ভিতর হাতে কয়েক গাছি সোণার চুড়ি। এক-টুকু অহঙ্কার নেই, মুখে একটী মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।

সুধা। সরলা দিদির মধুর স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কেউ তাকে কখনো রাগ করতে দেখেছে? আমরা মেয়েদের যে দোষ দেখে রেগেই আগুন হই, সরলা দিদি সে সব হেসেই উড়িয়ে দিতে চান। তা ছাড়া পড়াশুনাতেও সকলের চেয়ে ভাল মেয়ে, যখন বই নিয়ে বসেন, তার ভিতরে যেন ডুবে যান, আবার হাসি গল্পের সময় তাঁর আনন্দ কে দেখে!

নির্ম্মলা ও সরযূর আহারের পরে, সরলা দুটি বোনকে আপনার ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাদের কাছে বসাইয়া কহিল, "আমাকে দিদি বলে ডেক। প্রত্যেক রবিবার বিকালে তোমরা আমার কাছে এস।"

সরযূ অবাক্ হইয়া সরলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলা যে কি বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মা নিরুদ্দেশ এবং ডাক্তার সেনের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পরে, আর কাহার কাছে সে এমন প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়াছে?

সরলার সুকুমার হৃদয় মেয়ে দুটির উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে প্রতি রবিবার তিনটার সময় তাহাদের জন্য পথের পানে চাহিয়া থাকিত। নির্ম্মলা ও সরযূ কাছে আসিলে, তাহাদের মুখ দেখিয়া সরলার চক্ষু যেন জুড়াইয়া যাইত। সে প্রথমেই দুটি মেয়েকে মিষ্ট দ্রব্য ও ফল খাওয়াইত, তাহার পরে তাহাদের বই পড়াইত ও গান শিখাইত। এক এক দিন তাহারা সরলার কাছে গল্প শুনিত।

এক রবিবার নির্ম্মলা ও সরযূ সরলার কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি, আজ একটা গল্প বলুন।" সরলা হাসিয়া গল্প আরম্ভ করিল—

"এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর ছিল দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটীর নাম অশ্রুমুখী। সে দেখ্‌তে টুকটুকে ক্ষীরের পুতুল, আর সে খুব ভাল মেয়ে। তাই আর সকলেই তাকে ভালবাস্‌ত, শুধু তার সৎমা ছোট রাণী তাকে দুই চোখে দেখ্‌তে পারতেন না। তার পরে অশ্রুমুখীর নিজের মা মরে গেল।"

নির্ম্মলা। তাই নাকি? নিজের মা মরে গেল? কেন?

সরলা। ছোট রাণী তাঁকে যন্ত্রণা দিত বলে। শেষকালে কি হল, শোন। রাজা নিজেই অশ্রু-মুখীকে ভালবেসে মানুষ করতে লাগ্‌লেন। তার দুই ভায়েরও বোনটির উপরে খুব ভালবাসা ছিল। তারা একটি দিন বোনটিকে না দেখে থাক্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু ছোটরাণী অশ্রুমুখীকে রাজবাড়ী থেকে তাড়াবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সরযূ। ছোটরাণী তা হলে ভয়ানক দুষ্টু?

সরলা। দুষ্টু বই কি! ছোটরাণীর অশ্রুমুখীর উপরে অত হিংসা কেন, তা জান? তাঁর নিজের মেয়েটি দেখ্‌তে ভারি কুৎসিত; তার গায়ের রং একেবারে দোয়াতের কালী, বড় বড় এক একটি দাঁত যেন রাঙা মুলো; মস্ত কাণ দুটি যেন দুখানি কুলো। চোখের ভুরু নেই বল্লেও হয়; মাথার চুলগুলিও সুমুখের দিক থেকে উঠেই যাচ্ছে।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "দিদি, তা হলে ত অমন মেয়েকে কোন রাজার ছেলে বিয়েই কর্‌বে না।"

সরলা। তা ত কর্‌বেই না, সেই জন্যেই ত ছোটরাণীর আরো রাগ। কোন রাজার ছেলে তাঁর নিজের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় না, কোন মানুষই সে মেয়েকে ভাল বলে না, আর কিনা রূপবান ও গুণবান এক রাজপুত্রের সঙ্গেই অশ্রুমুখীর বিয়ের কথা হচ্ছে, রাজ্যের সমস্ত লোকই তার প্রশংসা কর্‌ছে;—এ সব ছোটরাণীর মোটেই সহ্য হয় না। তাই তিনি মনে কর্‌লেন, যেমন করেই হো'ক, অশ্রুমুখীকে রাজবাড়ী হতে তাড়াতে হবে। চট্‌ করে রাণীর মাথায় দুষ্টুবুদ্ধিও যোগালো। ঐ রাজ্যে ছিল এক মায়াবিনী স্ত্রীলোক, রাণী তাকে গোপনে রাজবাড়ীতে এনে বল্লেন, তোর মায়ামন্ত্রে রাজকুমারী অশ্রুমুখীকে একটা হরিণ কর্‌তে পার্‌বি কিনা বল্‌ দেখি? তা পার্‌লে আমার গলার মুক্তাহার তোকে বক্‌সিস দেব?"

নির্ম্মলা। মানুষ আবার হরিণ হয় কি করে? মিথ্যা কথা।

সরলা। তা ত বটেই, এ যে গল্প। তার পরে কি হল শোন। মায়াবিনী তার আশ্চর্য্য মন্ত্রে রাজকন্যাকে একটি সোণার হরিণ কর্‌ল। হরিণটি কিছুতেই রাজবাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। তবু দুষ্টু রাণীর নিজের লোক হরিণটিকে জঙ্গলের ভিতরে এক পাহাড়ের কাছে রেখে এল। এ দিকে রাজবাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। অশ্রুমুখী কোথায়? কোথাও যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজার সিপাহি কেউ বা হাতীতে চড়ে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে তার খোঁজ করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথাও রাজকন্যার খোঁজ পাওয়া গেল না। দুই রাজপুত্র ত ছোট বোনটির জন্যে কেঁদেই সারা। রাজাও মনের দুঃখে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

সরযূ। দিদি, অশ্রুমুখীর জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সরলা। অনেক দিন পরে অশ্রুমুখীর দুই ভাই হাতী, ঘোড়া, তীর, ধনুক ও তলোয়ার নিয়ে বনে হরিণ শিকার কর্‌তে চল্লেন। জঙ্গলে পাহাড়ের কাছেই ঝরণা। একটি সুন্দর হরিণ সেই ঝরণার জল খাচ্ছিল। দুই রাজপুত্র হরিণটিকে দেখে,

ধনুক হাতে নিলেন, যখন দুজনেই হরিণের গায়ে তীর ছুঁড়ে মার্‌বেন, তখন হরিণটি দুই রাজপুত্রের পানে চেয়ে বল্লে—

"মেরো না মেরো না আমায় ভাই,
আমার মত দুঃখিনী কেউ নাই।"

দুই রাজপুত্র হরিণের মুখে মানুষের মতন কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলো। তাঁরা হরিণটিকে ধরে রাজবাড়ীতে নিয়ে চল্লেন। দুজনে যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার এক গাছের উপরে ছিল শুক আর শারী; অর্থাৎ একটি পুরুষ টিয়ে, আর একটি মেয়ে টিয়ে। মেয়ে টিয়ে অর্থাৎ শারী শুককে বল্লো, "দেখেছ, দুই রাজপুত্র কেমন একটি সুন্দর হরিণ নিয়ে যাচ্ছে।" শুক বল্লো, "তুই বড় বোকা কি না, তাই বল্‌ছিস্ ওটা হরিণ।" শারী বল্লো, "মাগো ওটা হরিণ নয় ত কি? চোখ কি নেই নাকি?" আবার শুক বল্লো, "আসল কথাটা কি জানিস্? এক রাজকন্যা ছিল; তার সৎমার কাছে মুক্তাহার বক্‌সিস পেয়ে এই রাজ্যের মায়াবিনী তাকে হরিণ করে রেখেছে।"

সরযূ। দিদি, তার পরে কি হল?

সরলা। শুকের কথা শুনে দুই রাজপুত্রের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাঁরা রাজার কাছে হরিণটিকে নিয়ে গেলেন এবং শুকশারীর কথাও রাজাকে বল্লেন। হরিণটিকে দেখেই রাজার মনে স্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌লো। তিনি হরিণটিকে কাছে নিয়ে গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন। হরিণকে সবুজ রঙের কচি ঘাস এনে দেওয়া হল, কিন্তু সে তা খেল না, শুধুই রাজার মুখের পানে চেয়ে রইল। রাজা মায়াবিনীকে ধরে আন্‌বার জন্যে সিপাহি পাঠালেন। সিপাহিরা মায়াবনীর দুই হাত বেঁধে রাজসভায় নিয়ে এল। রাজা বল্লেন, "ওরে মায়াবিনী, তুই কোন্ রাজকন্যাকে হরিণ করে রেখেছিস? এখনি এই হরিণকে রাজকন্যা করে দে, নইলে ঐ যে জল্লাদ তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে এখনি তোর মাথা কেটে ফেল্‌বে।" মায়াবিনীর মন্ত্রে হরিণ আগের মতনই রাজকন্যা হয়ে রাজার পাশে দাঁড়ালো। তখন রাজা বল্লেন, "এস মা, আমার আরো কাছে এস, তুমিই আমার অশ্রুমুখী? তোমাকে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।" দুই রাজপুত্র বল্লেন, "তুমি আমাদের স্নেহের বোন? তোমাকে দেখে মনে যে আনন্দ আর ধরে না।" হরিণই রাজকন্যা হয়েছে শুনে রাজবাড়ীতে দলে দলে লোক ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো, সকলেই রাজকন্যাকে দেখে খুব সুখী হল। আচ্ছা, কার ভয়ানক দুঃখ হল বল ত?

নির্ম্মলা কহিল, "দুঃখ হল দুষ্টু ছোট রাণীর। আমার ত মনে হয়, রাজা তাকে আর মায়াবিনীকে মাটিতে পুতে ফেল্‌বার হুকুম দেবেন।"

সরলা। ঠিক্ বলেছ, রাজার হুকুমে জল্লাদ মাটীর ভিতর প্রকাণ্ড গর্ত্ত করে, দুষ্টু রাণীর ও মায়াবিনীর হাত পা বেঁধে, তার মধ্যে ফেলে দিল। তার পরে সে মাটী দিয়ে গর্ত্তের মুখ বন্ধ কর্‌লে।

সরযূ। বেশ হল, আমি খুব খুসী হলুম।

ক্রমশঃ

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

ইউরোপের বুড়োদের কথা।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকেরা ষাট বৎসর পার হলেই এত বুড়ো হয়ে পড়েন যে তখন তাঁদের শুধু হরিনাম জপ আর নাতি নাত্‌নীদের আজগুবী গল্প শোনানো ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। কিন্তু আমরা যদি একবার ইউরোপের লোকদের জীবনের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব সেখানকার বুড়োরা—একবারে বাণপ্রস্থ অবলম্বন না করে—খুব উৎসাহের সঙ্গে নানা কাজে যোগ দিয়ে অন্যান্য সকলকেও খুব উৎসাহিত করেন। সেখানে অন্ততঃ সত্তর বৎসর পার না হ'লে পাকা দরের বুড়োদের দলে ভিড়বার অধিকার নাই। আমাদের দেশে কিন্তু সত্তরের কোটায় পা দেবার আগেই অনেককেই—এই পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়।

আজ কয়েকজন ইউরোপীয় বুড়োদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রব। যাঁরা অল্পদিন হোল খুব বেশী বয়সে মারা গিয়াছেন—আর যে সব বুড়ো এখনো বেঁচে আছেন ও নানারূপ কাজ কর্‌ছেন—তাঁদের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানাবার চেষ্টা করব।

অল্পদিন হলো ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক টমাস হার্ডি ৮৮ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তাঁর পরেই এখন ইংলণ্ডে সাহিত্যিকদের মধ্যে ডাঃ রবার্ট ব্রীজেস্ সব চেয়ে বয়সে বড়। তাঁর বয়স ৮৪ বৎসর। প্রফেসর জর্জ্জ সেণ্টবেরীর বয়স এখন তিরাশী, তিনি ইংলণ্ডের "বাথ" সহরে বাস করেন ও নিয়মিত নানা পত্রিকায় লেখেন। সার এডমণ্ড গস্ কিছুদিন হোল ৭৯ বৎসর বয়সে মারা গিরাছেন—তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নানা পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁর চেয়ে এক বৎসরের ছোট মিঃ আগষ্টিন বীরেল প্রত্যেক রবিবারে সংবাদপত্রগুলিতে কিছু না কিছু লেখেনই। কিন্তু সত্তর বৎসর পার হবার পরে যাঁরা সাহিত্য চর্চ্চায় খুব নাম করেছেন—তাঁদের মধ্যে জর্জ্জ বার্ণার্ডশ্‌এর নামই উল্লেখযোগ্য। তাঁর "সেণ্ট জোয়ান" নাটকখানি পড়লে মনে হয় না যে তা একজন সত্তর বছরের বুড়োর লেখা।

সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য কাজেও আমরা অনেক বুড়োকে দেখ্‌তে পাব। ইউরোপের শাসকদের মধ্যে আজ কাল জার্ম্মনীর প্রেসিডেণ্ট ফন্ হিণ্ডেনবার্গ সবচেয়ে বড়—তাঁর বয়স ৮২ বৎসর। সুইডেনের রাজা গাস্তভের বয়স সত্তর—কিন্তু তিনি যখন সৈনিকদের সঙ্গে প্যারেড করেন ও টেনিস খেলেন—তখন তাঁকে দেখলে মনে হয় না যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। জেকোস্লাভোকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিকের বয়স সবে ৭৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। রোমের পোপ একাদশ পায়স (Pope Pius xi)মাত্র একাত্তরে পা দিয়াছেন। আর্কবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরী এখন ৮১ বৎসর বয়সে খুব উৎসাহের সহিত কর্ম্মবিষয়ক জটিল মীমাংসায় ব্যস্ত আছেন।

অনেকেরই বিশ্বাস বুড়োরাই বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ হয়—কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে সে ধারণাটা ভুল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইনের মন্ত্রীপরিষদের সভ্য লর্ড বালফুরের বয়স ৮০। অন্যান্য সভ্যদের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। মিঃ বলডুইনের বিপক্ষ দলে—লর্ড পারমুরের বয়স ৭৬।

বিজ্ঞান বিভাগে এডিসন সাহেবর বয়স ৮১—

কিন্তু তিনি এখনও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার কর্‌ছেন ও নিয়মিত "জন অফ লণ্ডন" পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। সার অলিভার লজের বয়স ৭৭। সার জে, জে টমসনের বয়স ৭২ আর সার চার্লস্‌ পারসনের বয়স ৭৪।

সার্কারণের বিশ্বাস অভিনয়কারীরা খুব বেশী-দিন বাঁচে—তবে আমরা খুব বেশী বুড়ো অভিনয়-কারীদের দেখি নাই। ডেম এলেনটেরী এখন ৮১ বছরের বুড়ী—কিন্তু তিনি অভিনয় করা থেকে অনেক দিনই অবসর নিয়েছেন। ডেম জ্যাম ফেণ্ডালের বয়স ৭৯—তিনি এখন খুব অল্পই অভিনয় করেন। নরনম্যান ফরবেশ ও মিঃ ক্রেওকার এই দুইজন বুড়ো এখনো অভিনয় করেন। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌ পাচম্যান ৮০ বছর বয়সে এখনো তাঁর গান শুনিয়ে লোককে মাতিয়ে দেন।

জেনারেল হিগ্‌সন ৯৯ বৎসর বয়সে মারা যাওয়াতে লর্ড মেথুয়েন এখন সবচেয়ে বুড়ো সেনাপতি। তাঁর বয়স ৮৩। তার পরেই ৭৮ বৎসরের বুড়ো ডিউক অফ্‌ কনট এখনো খুব শক্ত আছেন। নৌবিভাগের অ্যাডমিরাল সার এডওয়ার্ড সেমুরের বয়স ৮৮। ৮৭ বছরের বুড়ো সার এডওয়ার্ড ক্লার্ককে এখনো ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বিখ্যাত আইনজ্ঞ লর্ড মার্থেকে ভুললে চলবে না। লর্ড ফিলমোরের বয়স ৮৩। লর্ড শ ৭৭ আর লর্ড কারসন ৭৩।

এই সব লোকের জীবনী আলোচনা করলে জান্‌তে পারা যায় যে তাঁরা নাকি নিজের নিজের উদ্ভাবিত নিয়ম মেনে চলে এতদিন বাঁচতে পেরে-ছেন। সার হ্যারী পোলাণ্ড ঠাট্টা করে বলেন—তিনি না কি বিয়ে করেন নি বলে অনেকদিন বেঁচে আছেন।

জাপানের পথে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পরে)

১০ই জুলাই—

তখনও রাত্রি আছে, একেবারে ফর্সা হয় নাই। ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে দেখি Chief officer আমায় ডাক দিলেন, তার আগে আমায় কতক্ষণ ডেকেছেন আমি শুনি নাই। উঠে ভাল করে জামাটা গায়ে দিলাম, তারপর সেই অন্ধকার জাহাজের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের পিছনে পিছনে গেলাম। আমায় যেতে যেতে বললেন, নীচে আর এক যাত্রীর বড় অবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌ছে। দেখ্‌-লাম, একজন লোক জাহাজের Deck-এর ভিতর যেখানে চীনা হোটেল তার কাছেই ইঞ্জিনের ঘর, সেইখানে অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছে। লোকটী বহুদিন ব্যাপিয়া কাশরোগের যন্ত্রণায় ভুগছিল, নিঃশ্বাস রোধ হয়ে যাচ্ছিল শরীর খুব শীর্ণ—তার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা। তাকে উপরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলাম, সেখানে মুক্ত বায়ু সেবনে তার শ্বাস যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। তাকে উপরে হাঁসপাতালে রেখে দিলাম, তার এক বন্ধু ছিল তাকে দেখতে বলে এলাম; কিন্তু সে লোক কিছুক্ষণ পরেই চলে যায়। স্বার্থান্ধে ভরা—খালি স্বার্থান্ধ হয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পরাঙ্মুখ নয়। এই দুনিয়ার নিয়ম এবং এই বন্ধুত্ব। . আমি তাকে বাঁচাবার যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগলাম। তাকে ঔষধ খেতে দিলাম। সে খেতে পারল না—আহা তার অবস্থা দেখে আমার ভারি কষ্ট হল। এমন কেউ ছিল না যে তাকে একটু সাহায্য করে। আরও অনেক লোক নীচে দেখে এলাম যারা দুর্ব্বল শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে, শরীর ফুলে গেছে, গায়ে রক্তহীনতা—এরা যে কেমন করে স্বস্থানে পৌঁছিবে আমার তাই দুর্ভাবনা হল। সেই গভীর অন্ধকার গহ্বরে পড়ে আছে—বাতাস অভাবে পচে মরে যাচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজের দোলায় আরও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য রোগীদের সব ব্যবস্থা করে দিলাম, একজনকে Injection করতে চাইলাম, সে ত একেবারে ভয়েই ছুটতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে শুনলাম,একজন মারা গেল। শরীর নীল হয়ে গেছে। মাছিতে চারিদিক ঘিরে ফেলেছে—সে আজ মহানিদ্রায় নিমগ্ন। তাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হল। সে চলে গেল—তার যন্ত্রণার সব ঐ নীল লবণাম্বু পরে শেষ হল—নবীন উৎস ধারা সেই স্রোতে প্রবাহিত হল। নশ্বর আজ মহানের সাথে মিলতে ছুটেছে। এই রকম মৃত্যুদৃশ্যে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল, আরও শুনলাম যে সিংঙ্গাপুর হতে হংকংয়ের পথে জাহাজের মধ্যে এরূপ প্রায়ই মারা পড়ে। যারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এই জাহাজে উঠে ব্যাধিমুক্ত হয়ে কালের কবলে চলে যায়।

১১ই জুলাই—

সকালবেলা উঠে জামাটা বদলে একটু বসলাম। কয়দিন একটা ১০ পাউণ্ড ওজনের ভারী বল নিয়ে খেলছিলাম, কাল হঠাৎ হাতের বুড়া আঙুলটায় লেগে গিয়ে বড় টাটিয়ে উঠেছে। আজ তার ভারি যন্ত্রণা হচ্ছে। ক্রমশঃ আমরা হংকং বন্দরের কাছে উপনীত হলেম। দূর থেকে তাহার দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। অনেক পাহাড় দেখা যেতে লাগল। আমাদের জাহাজখানা পাহাড়ের গা দিয়েই প্রায় চলে যায়। এই অসংখ্য গিরিশ্রেণী—তারই মধ্য দিয়া যেন জল এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাস ও শৈবালে ভর্ত্তি। চারদিকটা যেন সবুজ ভেলভেট পাতা রয়েছে—বড় চিত্তাকর্ষক। সেই পাহাড়ের গায়ে কেটে কেটে পথ বক্রগতিতে চলে গেছে, দুপাশে অনেক গাছ রয়েছে, ফুলের সৌন্দর্য্যে চারিদিক সুরভিত। তারিই মধ্যে মধ্যে ছোট বড় কত রকমের বাড়ী সাজান রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন পর পর বায়স্কোপের ছবি দেখে যাচ্ছি। বাড়ীগুলির নির্ম্মাণ কৌশল ভারি সুন্দর। কোন বাড়ীটা গাছের আড়াল দিয়ে একটু দেখা যাচ্ছিল, কোনটা বা চারিদিকে বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে আবার কোনটা বা সাম্‌নেই চক্‌ চক্‌ করছিল। বাড়ীগুলি সব যেন থিয়েটারের দৃশ্যের মতন আঁকা বসান রয়েছে। ছোট ছোট সুসজ্জিত বাড়ীগুলির ভিতর হইতে সব আলোকরশ্মি সমুদ্রের জলে এসে পড়েছে। রাত্রিকালে এই দৃশ্য দেখলে ঠিক মনে হয় যে তারায় ভরা আকাশ যেন ধরার মাঝে নেমে এসেছে। পাহাড়ের বুকে ছোট রেল লাইনগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ঘরে বসে আছি, 'নামস্যাং' জাহাজের ডাক্তার আমার কাছে দেখা করতে এলেন। আমরা দুজনেই পরস্পর অপরিচিত। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পরিচিত হয়ে গেলাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে একটু বাহিরে যাবার উদ্যোগ করি, সঙ্গে Mr. Miller জাহাজের Wireless officer এসেছিলেন। জাহাজ আমাদের Cowloon Portএ

ছিল সেখান থেকে Ferry serviceএ পার হয়ে আমরা হংকং বন্দরে আসি। সেখানে নেমে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিকদের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাদের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হয়। এখানকার রাস্তা দার্জ্জিলিং Cart Roadএর মতন চলে গেছে, খাড়াই ও উতরাই সব জায়গায় গাড়ী যেতে পারে না। Invalid chairএর মতন রয়েছে, তাইতে একজন চড়তে পারে এবং দুজনে ধরে তাকে নিয়ে যায়। রাস্তাগুলি অত্যন্ত পরিস্কার। সামনেই Cantonment, Y. M. C. A: দেখা যায়। কটিদেশবেষ্টিত সমুদ্র এবং এই গিরিশ্রেণীর উজ্জ্বলতা ও সৌধমালা যেন পথিকের মনে এক বিস্ময় এনে দিচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত।

চয়ন

সংকল্প

(তুমি) দিয়েছ আমায় যে ক্ষুদ্র শকতি
ক্ষুদ্র দেহে যেই বল
তাই দিয়ে আমি মুছাব যতনে
তাপিতের অশ্রুজল।
ক্ষুদ্র প্রাণে মোর তুমি দয়া করে
দিয়েছ যে স্নেহ-প্রীতি
সেই স্নেহটুকু দিব সযতনে
দুঃখীদের নিতি নিতি।
যদিও আমার নাহিক শকতি
হরিতে সবার দুঃখ;
করিব যতনে স্নেহ সুধা দানে
একেরি প্রফুল্লমুখ।
শোক দুঃখ তাপে দুঃখিগণ যথা
করে সদা হাহাকার;
হবনা বিমুখ মুছাতে তাদের
যাতনার অশ্রুধার।
(তুমি) পাঠায়েছ মোরে এ ধরা মাঝারে
দিয়ে স্নেহ মধুরতা,
দিব স্নেহ তারে জীর্ণ শীর্ণ রোগী
অযতনে পড়ে যথা।
যাহা আছে যার তাই দিয়ে চল
সাধি পর উপকার,
স্নেহের অঞ্চলে মুছাই যতনে
অনাথের অশ্রুধার।
দিয়েছেন পিতা যে শকতি যারে
নিয়োগ করিব তাই,
তাদের হিত সাধিতে সতত
যাহাদের কেহ নাই।

আদর্শ

ভক্তি ভগবানে শ্রদ্ধা গুরুজনে
স্নেহ ভালবাসা অপর সবে
সেবায় তৎপর শিষ্ট আচরণ
মানব জীবন সফল তবে।

অঙ্ক কৌতুক

চৌষট্টিকে পঁয়ষট্টি করা।

এটির জন্য সিকি ইঞ্চি দূরে দূরে খাড়াভাবে ও আড়ভাবে রূলটানা একটু কাগজ চাই। ইচ্ছা হইলে সাদা কাগজে নিজেই ঐরূপ রূল টানিয়া লইও,অথবা ঐরূপ রূলটানা একটু Squarod paper আনাইয়া লইও।

নীচের প্রথম চিত্র দেখ। ইহাতে দুই ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া একটি "স্কোয়ার" আঁকা আছে। লম্বায় ও চওড়ায় সিকি ইঞ্চি পরে পরে রূল টানা হইয়াছে বলিয়া, ইহাতে ৮×৮ অর্থাৎ চৌষট্টিটি ঘর আছে। চিত্রে দেখিবে যে তিনটি মোটা লাইন টানিয়া সমস্ত স্কোয়ারটিকে চারি
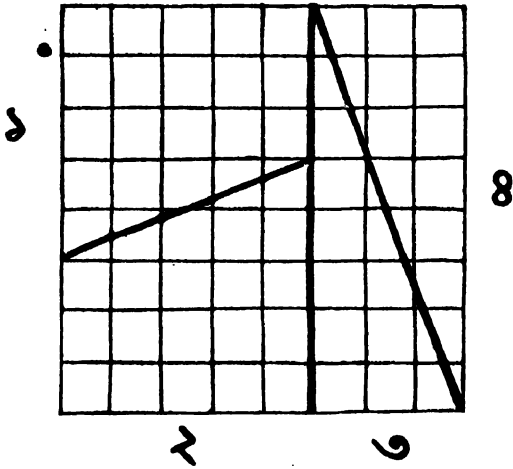
১ নং চিত্র।

ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তোমার নিজের কাগজখানিতে তুমি আগে সাবধানে সম্পূর্ণ স্কোয়ারটি ও তাহার চৌষট্টিটি ঘর আঁকিয়া লও। তার পরে চিত্রের ঐ তিনটি মোটা লাইনের স্থানেও তিনটি সোজা রূল টান। ইহার পর সাবধানে কাঁচি ধরিয়া আগে সম্পূর্ণ স্কোয়ারটি কাট, পরে মোটা লাইনগুলির উপর দিয়া কাঁচি চালাইয়া স্কোয়ারটিকে চিত্রের মতন চারি টুকরা কর।

এখন এই চারি টুকরাকে দ্বিতীয় চিত্রের মতন করিয়া সাজাও। কি দেখিতেছ? আগে ছিল ৮×৮ অর্থাৎ চৌষট্টি ঘর; এখন সেই কাগজেই দেখা যাইতেছে, ১৩×৫ অর্থাৎ পঁয়ষট্টি ঘর। কি আশ্চর্য্য! তবে কি ৬৪ = ৬৫? এ যেন অঙ্কশাস্ত্র উলটিয়া যাইতেছে।
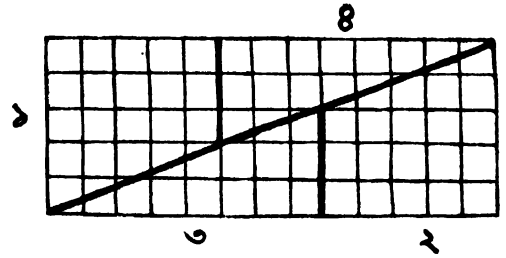
২ নং চিত্র।

বাস্তবিক যে ৬৪ কখনও কখনও ৬৫তে পরিণত হয়, তাহা নয়। যদি সত্যসত্যই তাহা হইত, তাহা হইলে তো সমগ্র অঙ্কশাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া যাইত। কিন্তু দেখায় যেন সত্যই তাহা হইয়াছে। চোখে এমন ধাঁধা কেন লাগে, তাহা আগামী বারে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

ধাঁধা।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রেরিত

(১) দুইটি বানর বন্ধু নিরিবিলি খুঁজি,
বসিবে ভোজনে, লয়ে নিজ নিজ পুঁজি,
হেনকালে এল তথা এক হনুমান,
তাহার হয় নি কোন খাদ্যের সন্ধান।
বানর দুটির পুঁজি কদলী সে দিন,
একের পাঁচটি আর অপরের তিন।
হনুমান বলে, "এস তিন জনে ভাই
আটটি কদলী মোরা সমভাগে খাই।

আমার ভাগের দাম দিব চুকাইয়া,
দুই আনা দিব ; নিও দুজনে বাঁটিয়া।”
তিন জনে সম অংশে আহার করিল,
আটটি পয়সা আনি হনুমান দিল।
তাই ল'য়ে বানরেরা দুইজনে তবে,
তুলিল বিষম তর্ক, কে কয়টি লবে।
হাতাহাতি, দাঁতাদাঁতি, গলাধাকা, কিল,
কিছুতে মিটে না প্রশ্ন, এমনি জটিল।
হনুমান্ বলে, “কি বা ঝগড়ায় ফল,
আছে এক চোখা ছেলে, তার কাছে চল।
মুকুল-পাঠক সেই, আঁকেতে প্রবীণ,
কলার বিষয়ে কভু নহে উদাসীন।
ধাঁধার উত্তরে, তার নাম ছাপা হয়,
তার কাছে গেলে হবে মীমাংসা নিশ্চয়।”
আমিও তাহাই বলি, পাঠক চতুর,
সদুত্তর দিয়ে কর বিসম্বাদ দূর।

(২) পাঁচ অক্ষরের একটি বইয়ের নাম বাহির করিয়া দাও। (১, ২, ৩, ৪, ৫, এগুলি অক্ষরের সংখ্যা)

১, ৫, মাষ্টার মশায় ইহা না দিলে ক্লাশের বাহিরে যাওয়া যায় না। ২,৪, অলঙ্কার। ৩,৪, মুখখানি এমন করিতে নাই। ২,৫, মানুষের আছে, গোরুর নাই। ৩,৫, সকলেই খায়। ১, ৪, বড় গাল।

বালক বালিকাদিগের রচনা

সস্তার গাড়ী

বিগত বৎসরের মাঘ মাসে প্রকাশিত। সস্তার গাড়ী শীর্ষক চিত্রাবলম্বনে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে একটি কবিতা কিম্বা গল্প লিখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। আমাদের একজন গ্রাহিকা কুমারী কমলা দাস নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। লেখাটী ভাল হইয়াছে বলিয়া লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। আশা করি, ভবিষ্যতে অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে এইরূপ প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে। গত চৈত্র মাসে স্থানাভাবে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

উডির সাথে হ'ল যখন গুড সাহেবের বিয়ে,
দুইজনেতে হাওয়া খেতেন নদীর পারে গিয়ে ;
হঠাৎ কি এক খেয়াল হ'ল—বুদ্ধি এল পেটে,
শুনলে সে সব মোটা লোকের চর্ব্বি যাবে ফেটে।
সাতশো টাকার সেলাম দিয়ে মোটর কিনে কষে,
জোরসে গাড়ী ছুটায় সাহেব বিবির পাশে বসে।
রাজ্যে যত মানুষ ছিল থমকে গেল পথে,
উডি, গুডি আজকে বুঝি কেল্লা করে ফতে।
অনেকদিনের সখ মিটিয়ে আরাম করে তবে,
বলছে সাহেব মিনার্ভা কি রোলস্-রয়েসই হবে।
লম্বা সে এক ফার্লো নিয়ে মালিক গেল বাড়ী,
জলের দরেই আমার কাছে বিকিয়ে গেল গাড়ী।
গল্প শুনে উডি আরো এগিয়ে আসে কাছে,
গাড়ী যে হায় পাল্কী হ'য়ে ঢুলকী তালে নাচে।
ভেল্কী বাজীর মতন যে তার পেছন পড়ে খসে,
দুজন তবু রোলস্-রয়েসের গদীর পরে বসে।
সন্ধ্যাবেলায় হাওয়া খেতে নদীর দিকে ছোটে,
হুড ছুটে যায়,—হনিমুনের মুন তো তবু ওঠে।
থেবড়ে যে যায় মাডগাড আর ধেবড়ে যে যায় চাকা,
ঘেবড়ে যে যায় দিল্লী, লাহোর, ফরাক্কাবাদ, ঢাকা।
সাহেব তবু বুক ফুলিয়ে চলছে হুসিয়ার,
চাপা পড়ে যায় কে আবার গাড়ী তলে তার।
এক সেলামে সাতশো টাকার সেলাম কে নেয় কেড়ে,
পথের মানুষগুলোর সাথে উঠবে কে আর পেরে!
তা না হ'লে এক শোয়াসে চলতো গাড়ী ছুটে,
পড়লো হরির লুটের গাড়ী পথের পরে লুটে।
ব্যাঙ্কে গুডির 'চেক' রয়েছে, 'কেক্' রয়েছে বাড়ী,
'ব্রেক' রয়েছে দুইহাতে তার, কোথায় গেল গাড়ী।
অনেক ভেবে বল্লে গুডি আস্তে উডির কাছে,
'মাথার পরে টুপি, এবং গোঁফজোড়া তো আছে।'

কুমারী কমলা দাস

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

মুকুল

(নব পর্য্যায়)

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ সম্পাদিত

বঙ্গের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বালকবালিকাগণের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

মুকুল কার্য্যালয়—১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুই ভগ্নি।

মুকুল

অতীতের প্রতিধ্বনি

গাছের কথা

(অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু)

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে তাহার নাম মূল। আর এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই "মূল" আর "কাণ্ড" এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্য্যের কথা, গাছকেই

যেরূপে রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকেই থাকিবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দু একদিন পরে দেখিতে পাইলাম, যে গাছ যেন টের পাইয়াছে, সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, ও মূলটী ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, শয়তার পাতাগুলি নীচের দিকে ও মূলটী উপরের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতাগুলি ও ফুলগুলি উপরের দিকে উঠিতেছে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিষ খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিম্বা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ, রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অনুবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহা দিয়া অতি ক্ষুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিম্বা মূল যদি এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা কারয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এই সব নল দ্বারা মাটী হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার নীচের দিকে অনেকগুলি ছোট ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া এই সব মুখ দেখা যায়। ইহাদের ছোট ছোট ঠোঁট আছে! যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না, তখন ঠোঁট দুটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি,—তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। এই বায়ু যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্য্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্য্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া—গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো বড় ভালবাসে। আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এই জন্য তাহারা জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্য্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্য্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে

যে আলো ও তাপ বাহির হয় তাহা সূর্য্যের তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্য্যের তেজ আছে, তাহা এই প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়াই—বাঁচিয়া আছি।

কোনও কোনও গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্ব্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজরক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটী ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। সেই ফুলের ঘরে বীজ ঘুমাইয়া থাকে! গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয় গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ ত মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহার করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে একপ্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোণা হইয়া যায়। আমাদের মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়াছে। ভালবাসার স্পর্শেই মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া গিয়াছে।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়। বোধ হয় গাছেরও যেন কত আনন্দ। আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধুবান্ধব দিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে, "কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব, আজ আমার বাড়ীতে এস। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ী যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙ্গের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙ্গীন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আইসে। কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখীর ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখী তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল সন্ধ্যা হইলেই চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধুপান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপ ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছুদিন পূর্ব্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ডালগুলি তালে তালে নাচিত! এখন শুষ্ক গাছটী বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক একটী ঝাপটা লাগিলে গাছটী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙ্গিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

দুই বন্ধু।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

—পাঁচ বৎসর পরে।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

বহুবাজারের একটী গলির ভিতরে নাতিবৃহৎ একখানি দ্বিতল অট্টালিকা। ইহা নলিনের পৈতৃক বাসভবন।

পৌষ মাস, বেলা নয়টা বাজিয়াছে। উপর তালার একটি কক্ষে তক্তপোষের উপর মলিন ছিন্ন শয্যায় নলিনের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী তাহার পীড়িত শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। গায়ে ছিটের দোলাই বাঁধিয়া একটী নয় বৎসরের বালিকা কক্ষখানির সর্ব্বত্র চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং মাঝে মাঝে মার কাছে আসিয়া বলিতেছে—"কি খাব ?"

কক্ষখানিতে দৈন্যদশা যেন মূর্ত্তিমতী। নামে হেমাঙ্গিনী হইলেও, গৃহিণীর গায়ে কোথাও এক তোলা সোণা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। গহনা পরার কালো দাগ এখনও গায়ে আছে, এবং কেমন করিয়া গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, তাহার ইতিহাসের মতন অনেকগুলি আঘাতের দাগ অভাগিনীর বক্ষে পৃষ্ঠে বাহুতে মুদ্রিত আছে। এমন কি, শেষ আঘাতের ক্ষতটী পর্য্যন্ত এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই।

বালিকা ক্রমে কান্নার সুর ধরিল। মা তখন অঞ্চল দিয়া তাহার মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"ছি মা, কাঁদে কি ? একটুখানি সবুর কর,—তোমার বাবা এলেন বলে।"

বালিকা আরও কিয়ৎক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল। মাঝে মাঝে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তার যতদূর দেখা যায়, দেখিতে লাগিল, পিতা আসিতেছেন কি না। কৈ তাঁহার ত কোন চিহ্নও নাই।

ক্রমে দশটা বাজিল। বালিকা আসিয়া বলিল—"আর যে থাক্‌তে পারছি না মা। বাবা কোথা গেছেন ?"

"তিনি বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় কর্‌তে গেছেন, মা; এখনই আস্‌বেন। টাকা ভাঙ্গিয়ে বাজার ক'রে নিয়ে আস্‌বেন, তোমার জন্য খাবার নিয়ে আস্‌বেন, খোকার জন্য বেদানা নিয়ে আস্‌বেন। এই এলেন বলে।"

বালিকা বলিল—"একটা পয়সা দাও না মা —দোকান থেকে মুড়্‌কি কিনে এনে ততক্ষণ খাই।"

"পয়সা ঘরে থাক্‌লে কি এতক্ষণ দিতাম না মা ?"—বলিতে বলিতে মাতার চক্ষুযুগল জলসিক্ত হইয়া উঠিল।

হায়,—এমন অবস্থাই হইয়াছে! ঘরে আজ এমন একটী পয়সা নাই যে, মেয়ে মুড়কি কিনিয়া আনিয়া খায়। অথচ দুই বৎসর পূর্ব্বে এই বালিকা তাহার টমি কুকুরকে পর্য্যন্ত রসগোল্লা খাওয়াইয়াছে।

মাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা বড় অপ্রতিভ হইল। তাড়াতাড়ি বলিল—"না মা, থাক্। বাসি মুড়কি খেলে আমার অম্বল হয়। বাবা আসুন,—তখন খাবার খাব।"

পাঁচ বৎসরে ইহাদের এই দশা কেন হইল? তবে সেই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস শোন। প্রথম বৎসরে নলিন তাহার বন্ধু বিপিনবাবুর কাছে টাকা লইয়া মহাজনের ঋণ শোধ করিল; এবং দালালী ব্যবসাও আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতেই কুসঙ্গীদের দলে পড়িয়া "বিয়ার" নামক মদ ধরিল। নলিন যে খুব খারাপ লোক, অথবা সে যে স্ত্রীকে সন্তানকে ভালবাসে না তা নয়। কিন্তু আগের সেই দলটিকে সে ছাড়িতে পারিল না। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সাহেব লোকেরা জলের পরিবর্ত্তেই "বিয়ার" পান করেন, অতএব উহা পানীয়বিশেষ, মদ্য নহে; "বিয়ার" পান করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে বিয়ারের এত খালি বোতল তাহার ঘরে জমা হইল য তাহা বিক্রয় করিয়া বাটীর ভৃত্য নিজের স্ত্রীর জন্য একজোড়া সোণার শাঁখা গড়াইয়া লইল। এই এক বৎসরে দালালী ব্যবসায়ে নলিন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিপিনকে ঋণের একটী পয়সাও শোধ দিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় বৎসরে নলিনের দালালী ব্যবসায়টী একেবারেই নষ্ট হইল। বিয়ার ছাড়া অন্য নানারূপ মদও চলিতে লাগিল। সে বৎসরের শেষে ব্যবসায়ের মূলধনের সেই চারি হাজার টাকার একটী পয়সাও অবশিষ্ট রহিল না।

তৃতীয় বৎসরে অর্থাভাবে নলিন মাঝে মাঝে বলিত, "বিলাতী অপেক্ষা দেশী মদ অনেক ভাল, তাহাতে লিভার খারাপ করে না।" কিন্তু হাতে টাকা আসিলেই বিলাতী মদ, ও অন্য সময়ে দেশী মদ চলিতে লাগিল!

ভাড়াটে বাড়ী দুইখানির ভাড়া হইতে সংসার-খরচ নির্ব্বাহের পর আর বড় কিছু বাঁচে না। সুতরাং মদ্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ক্রমে নলিন তাহার আংটি, ঘড়ি-চেন, শাল, শালের জামা বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে ছড়িছাতার বাঁট হইতে রূপা খুলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে আলমারি, টেবিল, ভাল ভাল ল্যাম্প প্রভৃতিও গেল। এইরূপে তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল। ওদিকে ঋণ শোধ দিবার পাঁচ বৎসরের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, এবং ঋণের সুদ ক্রমাগতই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে নলিনের হুঁস নাই। মদের অভ্যাস যে করে, তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। শেষে এমন হয় যে একদিন মদ খাইতে না পাইলে সে পাগলের মত ক্ষেপিয়া যায়।

চতুর্থ বৎসরে স্ত্রীর অলঙ্কারগুলির প্রতি নলিনের দৃষ্টি পড়িল। অসহায়া হেমাঙ্গিনী আপত্তি করিতে গিয়া নলিনের হাতে কত মার খাইল। ক্রমে সে চোখের জলে মাটী ভিজাইয়া একে একে সব গহনাগুলি বাহির করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চবর্ষ পূর্ণ হইল।

দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া শেষে নলিনের মনের গতি আবার ফিরিল। একদিন স্ত্রীর মাথায় হাত রাখিয়া সে দিব্য করিল যে, আর জীবনে কখনও মদ্যপান করিবে না। আজ দুই সপ্তাহকাল নলিন মদ্যপান করে নাই। মাসের টাকা আদায় করিয়াই সে এক মাসের উপযোগী প্রথমে বাড়ী ভাড়ার চাউল ডাল প্রভৃতি কিনিয়া রাখিত। তাই, গত রাত্রেও তাহাদের আহার জুটিয়াছে। কিন্তু আজ আর চাউল না আসিলে রান্নাই চড়িবে না।

গির্জ্জার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। নলিনের পৈতৃক আমলের একটী পুরাতন ঝি ছিল। সে ইহাদের বড় ভালবাসিত, তাই নলিনের এই সকল কাণ্ড দেখিয়াও সে পালায়

নাই। ঝি আসিয়া বলিল—"বউমা, কয়লা ধরাব কি? বাবু ত এখনও এলেন না।"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"ধরাও গিয়ে ততক্ষণ।"

ঝি বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ গা, বাবু এত দেরী করছেন কেন? আমি ত ভাল বুঝছিনে। মলঙ্গা কি কলুটোলা (ভাড়াটে বাড়ী দুখানা যে যে পাড়াতে) তো দুকোশ দশ কোশ নয়। সেই প্রাতঃকালে বেরিয়েছেন, এখনও দেখা নেই। হাতে নগদ টাকা পেয়ে আবার জগন্নাথ শার মদের দোকানে ঢুকলেন না কি? তা হ'লে তো এখন আর বাড়ী আসছেন না। তা হ'লে তিনটের আগে—"

হেমাঙ্গিনীর মনেও এই আশঙ্কা গোপনে জাগিতেছিল। কিন্তু সে মুখে বলিল—"না না, তা যান নি। খোকার আজ জ্বর, তিনি এলে তবে খোকা বেদানার রস খাবে, তা কি তিনি জানেন না?"

"খোকা এখন কেমন আছে, বউমা?"

"এখন আর গা গরম নেই,—ঘুমুচ্ছে।"

"তবে আমি কয়লায় আগুন দিয়ে এসে খোকাকে নিই, তুমি তারপর চান করে ফেলে—"। ঝি বলিতে যাইতেছিল, "একটু মুখে জল দিও", কিন্তু তাহার স্মরণ হইল, ঘরে কিছু নাই; তাই সে থামিয়া গেল।

যত বেলা হইতে লাগিল, হেমাঙ্গিনীর আশঙ্কাও তত বাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে খোকাকে তক্তপোষে শোয়াইয়া দিয়া সে স্বয়ং জানালার কাছে গিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হেমাঙ্গিনী দেখিল, টলিতে টলিতে নলিন আসিতেছে। চাউল ডাল আনিবার কোন চিহ্ন নাই। নলিনের হাতেও কোন জিনিষ নাই, তাহার সঙ্গে কোন মুটেও নাই। যে আলোয়ানখানা গায়ে দিয়া নালন সকালে বাহির হইয়াছিল, তাহাও তাহার গায়ে নাই।

দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে সে দুই হাতে জানালার গরাদ শক্ত করিয়া ধরিল।

সিঁড়ি দিয়া কোনমতে নলিন উপরে উঠিয়া আসিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পকেট হইতে মুঠা করিয়া কয়েকটা টাকা পয়সা বাহির করিয়া সজোরে ঘরের মেজেতে ছড়াইয়া দিল। জড়িত-স্বরে বলিল—"এই নাও, ঝিকে বাজারে পাঠাও। আমি শুলাম।" বলিয়া ধড়াম করিয়া মেঝের উপর পড়িল। সেখানে একটা কাঁসার গেলাস ছিল, তাহার কাণায় লাগিয়া মস্তকের এক স্থান কাটিয়া গেল—রক্ত পড়িতে লাগিল।

"হায় হায় হায়" বলিয়া হেমাঙ্গিনী মাতাল স্বামীর মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল। কন্যা তাড়াতাড়ি ঘটী করিয়া জল আনিয়া দিল। হেমাঙ্গিনী নিজ পরিধানের ছিন্নবস্ত্র ছিন্ন করিয়া, জলে ভিজাইয়া আহত স্থান টিপিয়া ধরিল। কন্যাকে বলিল,—"পাখা নিয়ে বাতাস কর।" নলিন অচেতন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শুশ্রূষার পর অল্পে অল্পে নলিনের জ্ঞান হইল, সে চক্ষু খুলিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল। শেষে ভগ্নস্বরে বলিল,—"মাতাল স্বামীর সেবা করছ?"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কেন আবার খেলে?—তুমি যে আমার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করেছিলে, আর খাবে না, তবু তুমি কেন খেলে?

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নলিন বলিল—"হিমু!"

"কি বল।"

"যদি কেউ কারু মাথায় হাত দিয়ে দিব্য করে, আর সে কথা সে রাখতে না পারে, তা হ'লে কি হয়, হিমু ?"

"যার মাথায় হাত দিয়েছিলে, সে মরে যায়। তুমি আমার মাথায় হাত রেখেছিলে, আমি মরে যাব।"

পূর্ব্ববৎ স্বরে নলিন বলিল—"তাই আজ আমি শেষ বোতল খেয়ে এসেছি। শুধু তুমি মরে যাবে না, হিমু! তুমি মরে যাবে, আমি মরে যাব, খোকা ম'রে যাবে, খুকী ম'রে যাবে। আমরা সবাই মরে যাব।"

স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল—"ছি ছি বলতে নেই। অমন কথা মুখে আনতে নেই। তুমি ঘুমোও।"

"না হিমু, এখন মুখে আন্‌তে আছে! তুমি ম'রে যাবে, খোকা ম'রে যাবে, খুকী ম'রে যাবে; না খেতে পেয়ে আমরা সবাই ম'রে যাব। একটা কাবুলিওয়ালার কাছে গায়ের আলোয়ান বিক্রী ক'রে পাঁচটী টাকা পেয়েছিলাম। আট আনার মদ খেয়েছি, সাড়ে চারি টাকা আছে,—ঘরে ছড়িয়ে ফেলেছিলাম। কৈ সেগুলো?"—বলিয়া নলিন মেঝের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

"সে টাকা ঝি কুড়িয়ে রেখেছে—বাজার করতে গেছে।"

"আমার খুকী কৈ ? আমার খোকা কৈ ?"

"ঝি খোকাকে কোলে করে, খুকীর হাত ধরে, বাজারে গেছে। ওদের খাবার কিনে দেবে, চাল ডাল তরকারী সব কিনে আনবে। মেঝের উপর শুয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে, চল বিছানায় শোবে চল। ওঠ।"

"উঠছি। যতদিন ঐ সাড়ে চারিটাকা আছে, ততদিন খাওয়া চল্‌বে। তার পর উপসাস। অনাহারে মৃত্যু। সর্ব্বস্ব গেছে, হেম! মলঙ্গা লেনের বাড়ীতে ভাড়া চাইতে গেলাম,—ভাড়াটে বাবুটি আমাকে এটর্ণি-বাড়ীর একখানি চিঠি দেখাল। তাতে লেখা আছে, 'ওবাড়ী এখন ভবানীপুরের বিপিন বাঁড়ুয্যের সম্পত্তি হয়ে গেছে, অন্য কাউকে যেন সে ভাড়ার টাকা না দেয়। ভাড়া এখন থেকে বিপিন বাবুর প্রাপ্য।' ভাড়াটে বাবুটি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'একথা ঠিক ?' আমার মনে পড়্‌ল, দলিলে লিখে দিয়েছিলাম, পাঁচ বৎসরে বিপিনের ধার শোধ কর্‌তে না পারলে বাড়ী তিন-খানি আপনা-আপনিই বিপিনের হয়ে যাবে। ধার শোধ দূরে থাক্, আমি ত এক পয়সাও দি নাই। পাঁচ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই বাড়ী তার হ'য়ে গিয়েছে। আমি ভাড়াটে বাবুকে বল্লাম, 'তোমার কথা খুব ঠিক'।—ব'লে কলুটোলায় গেলাম। সেখানকার বাড়ীর ভাড়া চাইলাম, সে ভাড়াটেও ঐ রকম একখানা চিঠি বের করল। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'এ যা লিখেছে, তা ঠিক ?' আমি বল্লাম —'খুব ঠিক।' আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মদ না খেয়েও তখন আমি মাতালের মত হয়ে গেলাম। মনে মনে 'খুব ঠিক, খুব ঠিক' বলতে বলতে একটা কাবুলিওয়ালার দোকানে গিয়ে আলোয়ান বিক্রী করলাম। ভাবলাম, 'এইবার তো আমরা না খেতে পেয়ে মরেই যাব; যাই, শেষবার একবার মদ খেয়ে নিই।' ভেবে জগন্নাথ শার দোকানে ঢুকলাম।—এতদিনে ঠিক হয়েছে, নয়, হিমু ? যে মদ খায়, ক্রমে তার সর্ব্বস্ব যায়,—তাকে পথের ভিখারী হতে হয়। না খেতে পেয়ে তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়ে, সব মরে যায়, নয়, হিমু ? একথা খুব ঠিক—খুব ঠিক!"—নলিনের চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিতে লাগিল।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বলিল—"ছি, অমন কথা তুমি কেন বল্‌ছ? সর্ব্বস্ব গেছে,—যাক! তুমি ভাল হও, সৎপথে থাক, আবার কত হবে। ওঠ—বিছানায় চল। জামাটা ছেড়ে ফেল, ভিজে গেছে।"

নলিন অসহায় বালকটীর মত হেমাঙ্গিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করিল। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর শয্যায় শয়ন করিয়া বলিল,—"এ বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্যেও নোটিশ দেবে। এ বাড়ীও তো বিপিনের হয়ে গেছে। তারপর, গাছতলায় পড়ে, অনাহারে আমাদের মৃত্যু।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "না, না, তুমি ভেব না। বাড়ী থেকে উঠ্‌তে হয়, উঠে যাব, তার আর কি? দেশে গিয়ে থাক্‌ব।"

"দেশে একখানা ভাঙ্গা ফুটো বাড়ী আছে বটে কিন্তু বিষয়সম্পত্তি ত কিছু নেই। খাব কি?"

"সে জন্যে তুমি কিছু ভেব না। ভগবানের রাজ্যে কেউ কি না খেয়ে মরে? গাছের পাখীকে, বনের পশুকে, জলের মাছকে যিনি আহার যোগাচ্ছেন, তিনি কি আমাদের না খেয়ে মরতে দেবেন? কখনই না।"

নলিন বলিল, "গাছের পাখী, বনের পশু কি আমার মতন পাপী? তারা কি মদ খাবার জন্যে স্ত্রীর গায়ের গহনা কেড়ে নেয়?"

"তা নেয় না, সত্যি। তুমি আর মদ খেও না। তুমি ভাল হও, আবার কত হবে। আমি আজ পাঁচ বছর সকালে সন্ধ্যে হরির তলায় কত মাথা খুঁড়েছি, দেবতাকে কত মানত করেছি, যাতে তোমার সুবুদ্ধি হয়। আমার সে সব প্রার্থনা কি নিষ্ফল হবে? এত কষ্টের পরেও কি দেবতা আমার পানে মুখ তুলে চাইবেন না? তুমিও ভগবানকে ডাক—অবিশ্যি তাঁর দয়া হবে, আবার সব হবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মন খারাপ ক'রো না। একটু ঘুমোও দেখি! ঝি বুঝি এতক্ষণে এল,—নীচে তার সাড়া পাচ্ছি। তুমি ঘুমুলে তবে আমি রান্না করতে যাব। ঘুমোও।"

নলিন কাতর কণ্ঠে বলিল—"মনের যন্ত্রণায় আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে, আমার কি ঘুম হবে?"

"খুব হবে। তুমি স্থির হয়ে থাক। খুকী খাবার খেয়ে এসে তোমার পায়ে হাত বুলুবে এখন আমি একহাতে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—একহাতে পাখার বাতাস করি।"—বলিয়া হেমাঙ্গিনী সেইরূপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণপরে নলিন আবার চক্ষু খুলিল। স্ত্রীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"হিমু!"

"কি!"

"আমি কতদিন তোমায় মেরেছি—তোমায় জুতো পর্য্যন্ত মেরেছি, তুমি কেন আমার সেবা করছ?"

অল্প হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—"কেন সেবা কর্‌ছি? বেশ কর্‌ছি! আমার খুসী। তুমি তো ঘুমোও", বলিয়া তাহাকে বাতাস করিতে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ক্রমে নলিন ঘুমাইয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী রান্না করিতে গেল।

ক্রমশঃ

সোণার খনির সন্ধানে

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরে)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে এপ্রিল মাস আসিয়া পড়িল। সেই সময়ে গ্রীষ্মের ছুটি হইবে, সরলা দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবে। যাওয়ার দিন সরযূ সরলাকে কহিল— "দিদি, আপনি দার্জ্জিলিং যাবেন না।"

সরলা। গেলে কি তোমার কষ্ট হবে?

সরযূ কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার মুখখানি ম্লান হইল। সরলা কহিল—"চল না সরযূ, তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাই।"

সরযূ। তা হলে আমার দিদির যে বড় কষ্ট হবে।

সরলা। আচ্ছা নির্ম্মলা, আমি যদি সরযূকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলে কি হয়?

নির্ম্মলা। আমি যে সরযূকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি নে।

সরলা যেদিন দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল, সেদিন দুটি মেয়ের জন্য তাহার ত কষ্ট হইলই, কিন্তু নির্ম্মলা ও সরযূ বড়ই কাঁদিতে লাগিল। কেনই বা কাঁদিবে না? সরলার মতন আর কে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহাদের ভালবাসিয়াছে?

সরলা দার্জ্জিলিঙে পিতামাতার নিকটে গিয়া পৌঁছিল। তাহার পরে এক সপ্তাহ ধরিয়া দিনরাত বৃষ্টি। যেদিন বৃষ্টি থামিয়া গেল, খুব রৌদ্র উঠিল, সেদিন সরলার মা, মেয়েকে কহিলেন, "বাক্স খুলে কাপড় জামাগুলি রদ্দুরে দাও ত।"

সরলা কয়েকটি বড় বড় বাক্স খুলিল এবং তাহার ভিতরের কাপড়গুলি রৌদ্রে শুকাইতে দিল। সরলাদের একটি ঘরে অনেক দিনের একটি পুরাতন বাক্স পড়িয়াছিল। সকলেই মনে করিত, সেই বাক্সটির মধ্যে কতকগুলি অনাবশ্যক পুরাতন জিনিস পড়িয়া আছে। কিন্তু সরলা সেই বাক্সটি খুলিয়া, তাহার ভিতরে ছোট একটি ফ্রক দেখিতে পাইল। ফ্রকটির উপরে রাঙা সূতায় যাহা লেখা রহিয়াছে, তাহা পড়িয়া সরলা এরকম বিস্মিত হইল যে, কোন মায়াবীর মায়ামন্ত্রে তাহাদের সুবৃহৎ টিনের ঘর হঠাৎ স্বর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হইলেও সে তেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। সরলা দেখিল, ফ্রকের গায়ে রাঙা সূতায় লেখা আছে—সুহাসিনীর জন্মদিনে উপহার। সুরেশ দাদা, ডিব্রুগড়।"

সরলা ছোট ফ্রকটি হাতে লইয়া তখনি মায়ের কাছে গেল এবং কহিল, "মা, সুরেশদাদার যে দুটি বোন জলে ডুবে মরেছে, তার বড়টির নাম ছিল সুহাসিনী। কি আশ্চার্য্য! সুহাসিনীর ফ্রক আমাদের বাক্সে এল কি করে?

সরলার মাতা কমলাদেবী ফ্রকটি দেখিলেন এবং তাহার লেখাটিও পড়িলেন। তাঁহার মুখ একেবারে বিষণ্ন হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "সরলা তোমার বাবাকে একটিবার এখানে ডেকে নিয়ে এস ত।"

সরলা তাহার পিতা নগেন্দ্রনাথকে মায়ের কাছে ডাকিয়া আনিল। তিনি ফ্রকটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করিলেন। তাহার পরে সরলাকে কহিলেন, "মা, এক বিষয়ে

তোমার কাছে আমাদের বড় অপরাধ আছে। তুমি কি সেই অপরাধ মাপ কর্‌তে পার্‌বে? তুমি কি বাপ মা মনে করে আমাদের কাছেই থাক্‌বে, না অন্য কোথাও চলে যাবে?"

সরলা। বাবা, তুমি কি বল্‌ছ? আমার কাছে তোমাদের আবার অপরাধ? আমিই ত দিনের মধ্যে দশবার তোমাদের কাছে অপরাধ করে থাকি। তোমাদের কাছে না থাক্‌লে, আমি আর যাব কোথায়?

নগেন্দ্রনাথ। তুমি আমাদের আপনার মেয়ে নও। আমরা একবার আসামের পরশুরাম তীর্থে গিয়েছিলাম; তীর্থ হতে ফিরে আসার সময়ে, ব্রহ্মপুত্র নদীর এক জেলের নৌকায় তোমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম। তোমার পরীর মতন সুন্দর চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি জেলের মেয়ে নও, তারা তোমাকে কোথাও পেয়ে কুড়ায়ে নেছে। কে বলবে তোমাকে দেখেই কেন আমাদের স্নেহের উদয় হল? তাই অনেক টাকা দিয়ে জেলেদের বশ কর্‌লুম এবং তাদের নৌকা হতে তোমাকে আমরা নিয়ে এলেম। তার পরে আমরাই তোমাকে লালন পালন করে মানুষ করেছি। যে ঝড়ের রাত্রে সুরেশদের নৌকা ডুবে যায়, জেলেরা সেই রাত্রেই নদীর তীরে বালির উপরে তোমাকে অজ্ঞানে অবস্থায় পেয়েছিল। তোমারই গায়ে এই ফ্রকটি ছিল। তোমার নাম কি, তখন আমরা তা জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুমি আধ আধ ভাষায় বলেছিলে, আমার নাম সুহাসিনী, শেষকালে আমরাই তোমার নাম সরলা রেখেছিলুম। তুমি যে আমাদেরই মেয়ে, এই কথাটা আমরাই তোমাকে বলে বলে শিখিয়েছিলুম। এতদিন তোমার এই ফ্রকটির কথা মনেই ছিল না। আজ এইটি পেয়ে একটি রহস্যকথা বুঝ্‌তে পারা গেল। তুমি যে সুরেশ এবং নির্ম্মলা ও সরযূরই বোন, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই রইল না। এখন সুরেশ ইচ্ছা কর্‌লেই তোমাকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে যেতে পারে।"

সরলা আর কি বলিবে? সে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া, দুখানি হাত যোড় করিয়া কহিল, "করুণাময় ঈশ্বর, আমার যা স্বপ্ন ছিল, তা আজ সত্য হয়ে গেল! আমি আমাকে সুরেশদাদার বোন বলে কল্পনা কর্‌তুম, তুমি যথার্থই আমাকে তাঁর বোন কর্‌লে? আর প্রাণের দুটি বালিকা নির্ম্মলা ও সরযূও আমার আপনার বোন হল? আমি অবোধ বালিকা, তোমাকে ধন্যবাদ কর্‌বার উপযুক্ত ভাষা ত আমার নেই।"

সরলার দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কমলাদেবী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তোকে মানুষ করে তুলেছি, তুই আমাদের ছেড়ে কোথাও যাস্ নে।"

সরলা কমলাদেবীর বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, "মা, আমি কি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি? তোমরা কেন বল্‌ছ, আমি তোমাদের মেয়ে নই? স্বয়ংই ঈশ্বরই আমাকে তোমাদের মেয়ে করে দিয়েছেন, কে আমাকে তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে? এমন শক্তি কার? আমি শুধু মাঝে মাঝে সুরেশদাদাকে আর নির্ম্মলা ও সরযূকে দেখ্‌তে চাই, তাদের ভালবাসা দিতে চাই, তা ছাড়া আর ত কিছুই আমি চাই নে।"

সরলা নগেন্দ্রনাথকে কহিল, "বাবা, তুমি খবরের কাগজে সুরেশদাদার জন্য একটি বিজ্ঞাপন দাও। তাঁর বোনদের যে পাওয়া গিয়াছে, সে কথাও যেন বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে। আমার আশা হয়, তা

হলেই তিনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।”

নগেন্দ্রনাথ সেই দিনেই কয়েকখানি সংবাদ-পত্রে সুরেশের সন্ধান পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপিতে পাঠাইলেন। কিন্তু, সুরেশ যে কোথায় কিভাবে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরে তাহার জীবনের কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, এখন সেই বিষয়েই বর্ণনা করিব।

সুরেশ ঘুরিতে ঘুরিতে পাটনা সহরে আসিয়া পৌঁছিল। পাটনা সহর খুব বড়, সেখানে লোকও বিস্তর; কিন্তু সুরেশ কোথায় যাইবে? কাহাকেও ত সে জানে না। তাই সে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া গঙ্গার তীরে গেল, গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিল। গঙ্গার ধারেই পাটনা কলেজের বৃহৎ অট্টালিকা। সেই কলেজ-গৃহের বারান্দায় শত শত কলেজের ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সুরেশ তাহাদের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল—

“আমার বাবা বেঁচে থাকলে, আজ আমিও বি, এ, পাশ করে, এম, এ, ক্লাসে পড়তুম। আমার কি দুর্ভাগ্য! যে সন্ন্যাসী আমাকে পালন করেছিলেন, তিনিও যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে তাঁর কাছে ধর্ম্মশিক্ষা পেয়ে ঈশ্বরকে কত ভাল করে জানতে পারতুম। সন্ন্যাসী বলতেন, ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁর প্রিয় হতে পারলে যে সুখ, তেমন সুখ আর কিছুতেই নেই। হে আমার ঈশ্বর, আমার ত লেখাপড়া শিখে সুখী হবার আর আশা নেই, আমি কি তোমাকে ভালবেসে, তোমার ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে পারি নে?”

সুরেশ একটু পরে আবার মনে মনে বলিল—“ঈশ্বরের করুণা হলে কি না হয়? তাঁর দয়া হলে, এখনো আমার লেখাপড়া শিখে সুখী হবার আশা আছে। আমি আপনাকে এত হীন মনে করি কেন? ঈশ্বর আমার শরীরে আশ্চর্য্য পরিশ্রমের শক্তি দিয়েছেন, আমি কুলিমজুর হয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে কেন পড়াশুনা করি নে? শুনেছি, আমেরিকার কত অসহায় ছেলে রাস্তা পরিষ্কার করে, পয়সা রোজগার করে লেখাপড়া শিখে। আমার প্রতিজ্ঞা পড়াশুনা আমি করবই, তা যেমন করেই হো'ক। আমি আজ থেকে এই পটনা সহরেই মুটের কাজ করব। মানুষের বোঝা বয়ে পয়সা উপার্জ্জন করতে আমার লজ্জা কি? তাতে আর আমার কারো অধীন হতে হবে না। স্কুলে যাবার সময়ে স্কুলে যাব, অন্য সময় মুটের কাজ করব। ঈশ্বর আমাকে এমন শক্তি দিয়েছেন, অন্য ছেলেরা একদিন পরিশ্রম করে যে পড়া তৈরী করে, আমি তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করেই তা তৈরী করতে পারি। আমি কাল থেকেই স্কুলে ভর্ত্তি হব, আর এখনি বাজারে গিয়ে মুটের কাজে লেগে যাব।”

“সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়”—এ কথা বড়ই সত্য। সুরেশ মহৎ সংকল্প করিয়া বাজারে গেল; সে দেখিল, একটি ভদ্রলোক দোকানে চাউল কিনিতেছেন। সুরেশ তাঁহাকে কহিল, “আমি বড় অসহায়, আমার কেউ নেই, দয়া করে যদি অনুমতি করেন, তা হলে আমিই মুটে হয়ে এই চালের বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেব।”

ভদ্রলোকটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি সুরেশের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাহার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ সংক্ষেপে আপনার জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিল। অধ্যাপক কহিলেন, “তোমাকে আর বোঝা বইতে হবে না, আমার বাড়ীতে চল, সেখানে থেকে পড়াশুনা করবে।”

সুরেশ। আমার মাথায় বোঝা তুলে দিতে যদি আপনার কষ্ট হয়, তা হলে আমাকে আপনার রান্নাবান্নার বামুনঠাকুর করে রাখুন ; নিজের মুখেই বল্‌ছি, আমি চমৎকার রান্না কর্‌তে পারি।”

“এখন ত আমার সঙ্গে এস, তার পরে যা হয়, ভেবে দেখা যাবে।” অধ্যাপক এই কথা বলিয়া সুরেশকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সুরেশ দুই তিন দিন অধ্যাপকের বাড়ীতে বাস করিল। অধ্যাপক আর তাঁহার স্ত্রী সুরেশের ভাল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অধ্যাপকের স্ত্রী কহিলেন, “আচ্ছা সুরেশ, তুমি যদি খুব ভাল রান্না কর্‌তে পার, তা হলে প্রত্যেক রবিবার মাংস ও মিষ্টান্ন তৈরী করে আমাদের খাওয়াবে। তা ছাড়া অন্য সময় আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা কর্‌বে।”

সুরেশ অধ্যাপক এবং তাঁহার স্ত্রীর সুমধুর স্নেহে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে যথার্থ ই সুখী হইল। সে খুব মন দিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল। সুরেশ তাহার পরে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল এবং কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি পাইল।

কিন্তু হায়, এই আনন্দের মধ্যেও আবার দুঃখ বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া সুরেশের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন সেই দুঃখের কথাই লিখিতেছি।

সুরেশ পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া দানাপুরে একটি বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই সময়ে এক সার্কাসওয়ালা সাহেব দলবল লইয়া সেখানে আসিয়া আড্ডা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁর দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড সিংহ লইয়া খেলা দেখাইতেন। সেইজন্য বিস্তর লোক সার্কাস দেখিতে আসিত। একদিন সার্কাসওয়ালাদের অসাবধানতায় এক সিংহ লোহার খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাহার দুর্জ্জয় শক্তি কে দেখে ? সে ছুটিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে, যাহাকে সাম্‌নে পাইল, তাহাকেই কামড়াইয়া পালাবার চেষ্টা করিতে লাগিল। “ঐ সিংহ আসছে, ঐ সিংহ আসছে” বলিয়া লোকেরা ভয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। সার্কাসের সাহেব বন্দুক ও তলোয়ার লইয়া সিংহের পশ্চাতে ছুটিল।

সুরেশ এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল, “আমি মর্‌লে কার্‌ই বা কি লোকসান হবে ? আমিই কেন সিংহটাকে মারিবার চেষ্টা করি না ?” সুরেশ সার্কাসওয়ালা সাহেবের নিকট হইতে তলোয়ার চাহিয়া লইল এবং সিংহের পিছনে পিছনে ছুটিল। সুরেশের আশ্চর্য্য দৌড়াইবার শক্তি। সে সিংহের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল। বৃহৎ সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার উপরে পড়িল। সুরেশ সিংহের মাথায় তলোয়ারের আঘাত করিয়াই অজ্ঞান হইল। ইতিমধ্যে দানাপুরের ব্যারাকের কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য বাহির হইয়া সিংহকে গুলি করিল। সিংহ মরিল বটে, কিন্তু সুরেশকেও অর্দ্ধেক মারিয়া গেল। তখনই সুরেশকে দানাপুরের হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী

সন্ধ্যাকালে বাহিরে গিয়া দেখ ঘাসের উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কেমন শিশির পড়িতেছে। ঝড়ের সময় আকাশের কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলা দেখা বজ্রের ভীষণ কড় কড় শব্দ ক্ষুদ্র প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করে। বলত, এই সব নানারকমের আশ্চর্য্য ঘটনা কোন শক্তিতে ঘটিতেছে? তোমাদের জানিতে কি কৌতূহল হয় না? তোমরা ইহা অবশ্যই দেখিতেছ যে এই সব ঘটনা মানুষের শক্তিতে ঘটিতেছে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেও এই সব কাজ নষ্ট করিতে কিংবা থামাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে সমস্ত অদৃশ্য শক্তির কথা বলিয়াছি এই সব ঘটনা তাহাদেরই কাজ। দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, ঝড় বৃষ্টি কিংবা পরিষ্কার দিনে এই সকল শক্তি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে ইহাদিগকে জানিতে পারি। তোমরা বিজ্ঞান থেকে এই সব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা জান্‌তে পারবে।

এই সকল শক্তিকে জানিতে হইলে আমাদের একটি মানসিক শক্তি থাকা প্রয়োজন। তাহার নাম কল্পনা শক্তি। এই কল্পনা শক্তি মানে এই নহে যে মনে অসম্ভব রাক্ষসের মূর্ত্তি কিংবা মিথ্যা ছবি সব কল্পনা করা। এই কল্পনা শক্তি মানে এই যে যাহা সত্য অথচ আমাদের নিকট অদৃশ্য রহিয়াছে তাহার মূর্ত্তি মনে গড়িবার এবং ধারণা করিবার শক্তি। শিশুদের মধ্যে অনেকেরই এই সুন্দর শক্তিটি আছে। যে গল্পটী তাহাদের বলা যায় তাহারা সেই গল্পটী বার বার শুনিতে চায়। কেন জান? এইরূপে বার বার শুনিয়া শুনিয়া তাহারা মনের মধ্যে গল্পটির প্রত্যেক ঘটনা সত্যরূপে দেখিতে পায়। সুতরাং বিজ্ঞানের কথা যদি তাহাদিগকে বলা যায়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেই সব কথা মনের মধ্যে সত্যরূপে ধারণা করিতে পারিবে। তোমাদের যদি এই কল্পনা শক্তি থাকে তবে চল তোমাদিগকে বিজ্ঞান পরী অর্থাৎ আমাদের চারিদিকের অদৃশ্য শক্তির সহিত পরিচয় করিয়া দিই।

এক পশলা বৃষ্টির দিকে মনযোগ দিয়া দেখ। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কোথা হইতে পড়িতেছে বল ত? ফোঁটাগুলির আকার গোলাকার কিংবা একটু ডিমের অকারের মত, না? বল ত কেন এরূপ হয়!

বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা দ্বারা গঠিত, তাহারা বৃষ্টির ফোঁটারূপে পৃথিবীতে পড়িবার পূর্ব্বে বাতাসের মধ্যে "তাপ" (heat) শক্তি দ্বারা আলাদা আলাদা ভাবে অদশ্য হইয়া

সংযোজন (cohension) এই শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি নিকটস্থ হইবামাত্র তাহাদিগকে একত্রে বাঁধিয়া ফেলে।

মধ্যাকর্ষণ (gravitation) ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সার আইজাক নিউটন সৃষ্ট জগতের এই অদৃশ্য শক্তির তথ্য আবিষ্কার করেন। দুইটী জড় পদার্থ তাহাদের পরিমাণ ও দূরত্ব অনুসারে পরস্পরের অভিমুখে আকর্ষিত হয়। যে বস্তু যত দূরে, সে বস্তু তত কম শক্তিতে আকৃষ্ট হয়।

বেড়ায়। জলকণাগুলি এইরূপে পৃথক হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরের খুব নিকটে আসে। তখন "সংযোজন" (cohension) নামক আর একটি অদৃশ্য শক্তি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা-গুলিকে ধরিয়া ফেলিয়া এক একটি ফোঁটার আকারে পরিণত করে। তারপর ফোঁটাগুলি ক্রমশঃ বড় হইতে আরম্ভ করিলে মধ্যাকর্ষণ নামক আর একটি অদৃশ্য শক্তি (gravitation) ফোঁটাগুলিকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনে। তখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়। এই বৃষ্টির ব্যাপারটা তোমরা একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখ।

এই দেখিতে দেখিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল কিন্তু ইহার ভিতরে কত ঘটনা ঘটিয়া গেল, কত অদৃশ্য শক্তির খেলা হইল, তাহা তোমরা যদি না জানিতে তাহা হইলে কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতে? দেখ, বিজ্ঞান তোমাদিগকে কত অজ্ঞাত রাজ্যের কথা জানাইয়া দিতেছে, তোমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিতেছে। যাহারা বিজ্ঞান জানে না তাহাদের নিকট এই সকল অপূর্ব্বতত্ত্ব চিরকালেই অজ্ঞাত রহিয়া যায়।

ক্রমশঃ

স্মৃতি

Thomas Hood এর কবিতার ভাব অবলম্বনে)

১

মনে পড়ে কুটীরখানি
লতায় পাতায় ছাওয়া।
খোলা পথের জানালা দিয়ে
আসত দখিন হাওয়া।
মনে পড়ে, মনে পড়ে
অতীত স্মৃতির কথা।
সেথায় ছিল আমার কুটীর
লতায় পাতায় গাঁথা।

২

বাতায়নের খোলা পথে
পোড়ত রবির আলো
সেই আলোটী লাগত আমার
বড়ই মধুর ভালো।
সোণার বরণ অরুণ কিরণ
পড়ত আঙ্গিনায়,
পরাণ আমার গলে যেত
সুরের মূর্চ্ছনায়।

৩

মনে পড়ে বাগানবাড়ী
অমল পুষ্প বীথিবণ,
নিত্য সেথা ফুটত গোলাপ,
চাঁপা কেয়া মল্লিবন।
কুঞ্জ বনের আগে ভাগে
গাইত দোয়েল পাপিয়া।
বেহাগ সুরে গাইত গীত
উঠত হৃদয় কাঁপিয়া॥

৪

মনে পড়ে চাঁদের কিরণ
পড়ত কুটীর দ্বারে।
ধবল মেঘে রজত আলো
পেতাম বারে বারে॥
উধাও হয়ে মনটি আমার
যেত পরীর দেশে।
নিদ্রা সেথা মিলিয়ে যেতো
সুখ স্বপনের বেশে॥

৫

আজও জাগে প্রাণের মাঝে
সেই পুরাতন কথা
যেথা আমার ছিল কুটীর
লতায় পাতায় গাঁথা।

শ্রীসুকুমার হাজরা।

মণ্টি ক্রীষ্টো *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কয়েদীর বুদ্ধি

ছোট একটী অন্ধকার ঘর। দেওয়ালের উপরের দিকে লোহার গরাদের ছোট একটী জানালা—তারি ভিতর দিয়া অল্প অল্প আলো ঘরে আসিতেছে। সেখানে একটী যুবক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। সে একজন কয়েদী। ঘরখানি মার্সেলিস সহরের সরকারী জেলখানার একটী কুঠরী। জেলের নাম শ্যাটো ডিইফ্। যারা খুব খারাপ কয়েদী—তারা যাহাতে পালাইয়া যাইবার সুবিধা না পায় এজন্য তাদের এখানে বন্দী করিয়া রাখা হইত।

যুবকটী হঠাৎ মাথা তুলিয়া খুব মন দিয়া কি যেন শুনিতে লাগিল। তারপরে বলিল, "আবার সেই খস্ খস্ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে। ব্যাপারটা কি? একি কোন লোক কাজ করছে তার শব্দ? না; আর এক জন কয়েদী আমার কাছে আস্‌বার চেস্টা করছে! এটা কি করে বোঝা যায়? ঠিক হয়েছে! আমিও ঐ রকম শব্দ করি—সে যদি কয়েদী হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ভয় পেয়ে শব্দ করা থামিয়ে দেবে।"

এই ভাবিয়া যেখান হইতে শব্দ আসিতেছিল—সেখানে গিয়া সে তিনবার টক্-টক্-টক্ শব্দ করিল। অমনি সেই খস্ খস্ আওয়াজ থামিয়া গেল। যুবকটীর চোখ মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "এ নিশ্চয়ই কোন কয়েদী, আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। ওঃ আমি যদি তাকে কোন রকমে সাহায্য করতে পারতাম! কিন্তু আমার ত কোন যন্ত্রপাতি নেই।" সে নিরাশ হইয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইল। তাহার ঘরে ছিল একটী চৌকী, একটী টেবিল, একখানি চেয়ার আর একটী জলের কুঁজো! তাহার মাথায় একটী মতলব আসিল। সে ভাবিল—"আচ্ছা! আমি যদি জলের কুঁজোটা ভাঙ্গি—তবে সেই ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে হয়ত দেওয়ালে একটা গর্ত্ত করতে পারব।"

---

* বালক বালিকাদিগের উপযুক্ত করিয়া লেখা।

মতলবটা তাহার বেশ ভাল লাগিল। সে তখনই কুঁজোটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিল—সেটা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। তখন সে একটী টুক্‌রা লইয়া দেওয়ালে গর্ত্ত করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কোন লাভ হইল না। কারণ দেওয়াল ছিল খুব শক্ত, আর তাহার যন্ত্র খুব পাতলা। কিছুক্ষণ কাজ করার পরে সেগুলি তাহার হাতেই ভাঙ্গিয়া গেল।

তাহার ভারী দুঃখ হইল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—এ রকমে হবে না—আর একটা উপায় ঠিক করতে হচ্ছে। যখন সে নতুন উপায় ভাবিতেছে—সেই সময় জেলখানার রক্ষক একটী সস্‌প্যানে কয়েদীর জন্য রাত্রির খাবার লইয়া আসিল। অল্প আলোতে সে মেঝের উপরে ভাঙ্গা কুঁজোর টুক্‌রোগুলো দেখিতে পায় নাই। তারি একটাতে হোঁচট খাইয়া সে পড়িয়া যাইতে যাইতে কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া টেবিলের কাঁচের ডিসের উপরে ধপ করিয়া সস্‌প্যানটী রাখিল—ডিসখানি টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়া গেল।

জেলবাবু চটিয়া গিয়া বলিল—"এ সব তোমার জন্যেই হোল, ২৭ নম্বরের কয়েদী। তুমি যদি তোমার কুঁজো না ভাঙ্গতে—কেমন ক'রে যে ভাঙ্গলে তুমি? না—তা'হলে আমি তোমার ডিস্‌ ভাঙ্গতাম না। আমি এখন সিঁড়ি ভেঙ্গে তোমার জন্যে ডিস আন্‌তে যেতে পারছি না। তুমি এই সস্‌প্যানে ক'রে খাও—তবে তোমার ঠিক শিক্ষা হবে।" এই বলিয়া জেলবাবু চলিয়া গেলেন। কয়েদী কিন্তু খুব দুঃখিত হইল না-বরং খুসীই হইল। সে একটা মতলব ঠিক করিল। সে এই সস্‌প্যানের হাতোলটাকে খুঁড়িবার যন্ত্র করিবে মতলব করিল। সে তাড়াতাড়ি খাইয়া তাহার কাজ আরম্ভ করিল। এইবার আগের চেয়ে তাহার কাজ খুব ভাল হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি সে খুব খাটিল। যখন সকাল হইল তখন দেওয়ালে বেশ বড় একটী গর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কপাল ভাল—কেন না যেখান থেকে সেই আওয়াজ আসিত ঠিক সেই খানেই তার চৌকী ছিল। যখন সে কাজ করিত তখন সে চৌকীটা সরায়ে রাখিত—আর জেল বাবু আসিবার সময় হইলে আবার চৌকী ঠিক করিয়া রাখিত।

সকালবেলায় খাবার দিতে আসিয়া জেলবাবু জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে সস্‌প্যানে ক'রে কেমন খেলে, তোমার বোধ হয় বেশ ভালই লেগেছে? আর তোমার ভাল লাগা না লাগাতে কিছু আসে যায় না! যেমন জলের কুঁজো ভেঙ্গেছো—তার শাস্তির জন্যে তুমি আর ডিস্‌ পাবে না!"

এই কথা শুনিয়া সে মনে মনে খুব আনন্দিত হইল; কারণ তাহার কাছ থেকে সস্‌প্যানটা লইয়া যাইবে এই ভাবিয়া তাহার ভারী ভয় হইয়াছিল। সে কিন্তু খুব রাগের ভাণ করিয়া বলিল "এ, বড় খারাপ—এ রকম ব্যবহার ভারী নিন্দনীয়।" সে শুধু মনে মনে ভাবিতেছিল, জেলবাবু কখন চলিয়া যাইবে—কারণ সে গেলেই তার কাজ আরম্ভ হয়।

সে অনেকদিন ধরিয়া খুঁড়িল—কিন্তু তাহার মনে হইল দেওয়ালটা যেন দিন দিন শক্ত হইয়া যাইতেছে—সে খুব নিরাশ হইল। একদিন সে হতাশ হইয়া বলিল—"আমি একাজ ছেড়েদিই—এতে কোন লাভ নেই।"

"কি লাভ নেই?" সে দেওয়ালের অপর দিক হইতে শুনিতে পাইল—"সরে দাঁড়াও—তা না হ'লে পাথর পড়ে তোমার লাগতে পারে।" কিছুক্ষণ পরেই ঘরের মধ্যে কতকগুলি পাথর আর ধুলো ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িল! তারপর গর্ত্তের ভিতর দিয়া একটী মাথা-পরে একটা আস্ত মানুষ বাহির হইয়া আসিল। ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালী

আমাদের শরীর গঠনোপযোগী কতকগুলি খাদ্য ও পানীয় দরকার যাহার অভাবে আমরা নানা প্রকার আধিব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আজ আমি তাহারই কতকগুলি বিষয় সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব।

মানব শরীর কতকগুলি উপাদানে প্রস্তুত। এই উপাদানগুলি জগদীশ্বর ঠিক নিয়মিত রাখিবার উপায় করে দিয়েছেন। তাহার কোন একটীর অভাবে আমরা সুস্থদেহে চলিতে পারি না। আমরা যতই সেই নৈসর্গিক নিয়ম হ'তে বিচ্যুত হইব ততই ব্যাধির দিকে অগ্রসর হইব। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে এই নিয়মগুলি প্রত্যেকের মানিয়া চলিতে হইবে।

শরীর কতকগুলি অস্থি, উপাস্থি, মাংসপেশী, শিরা, উপশিরা, স্নায়ু দিয়া তৈরী। তাহাদের সম্পূর্ণ খাদ্য প্রদান করিলে তাহারা বেশ সহজভাবে বাড়িতে পারে। এই খাদ্য আমরা কোথা হতে পাই তাহা প্রথমে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আমাদের খাদ্য প্রধানতঃ শর্করাজাতীয়, চর্ব্বিজাতীয়, মাংসজাতীয় এবং শাকসব্জীজাতীয়। আমরা শর্করাজাতীয় খাবার প্রচুর ব্যবহার করে থাকি। ইহাতে আমাদের শরীরের শক্তি উৎপাদন করে। আমাদের ভাত, আলু, চিনি ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করাজাতীয় পদার্থ থাকে। শর্করাজাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক হইলে অভ্যন্তরে পুড়িয়া গিয়া শরীরকে সতেজ করে এবং আমাদের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু যদি ইহা আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি তাহা হইলে বেশীরভাগ দেহের মধ্যে পচিয়া নানা প্রকা। বিষাক্ত বাষ্প প্রস্তুত করে।

বাঙ্গালীরা শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রচুর অপব্যবহার করে থাকেন। তাহারা নানা প্রকার বাজারের মিষ্টান্ন, চিনি, প্রচুর ভাত খেয়ে থাকেন। অল্প পরিশ্রমে সম্পূর্ণ শর্করাজাতীয় খাদ্য পরিপাক না হওয়ায় পেটের মধ্যে নানা প্রকার বাষ্পে পেট ফুলিয়া উঠে ও বড় ক্লেশদায়ক হয়।

চর্ব্বিজাতীয় খাবার আমরা সাধারণতঃ ঘৃত, তৈল, মাখন ইত্যাদি হতে পাই। আমরা আজকাল বাজারে যে ঘি, তেল সাধারণতঃ দেখতে পাই ইহার মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ পবিত্র নয়। বেশীর ভাগ নানা প্রকার ভেজাল মিশ্রিত থাকে। ইহার ফলে আমাদের পরিপাকশক্তি শীঘ্র লঘু হয়ে যায় এবং এই চর্ব্বি যাহা সম্পূর্ণ পরিপাক হইলে আমাদের দেহের শক্তি বৃদ্ধি করিত ও উত্তাপ রক্ষা করিত তাহা না হওয়ায় ঠিক বিপরীত হয়ে পড়ে। আমাদের শরীর বাহির হইতে স্থূল মনে হয় কিন্তু তাহা কর্ম্মে অপটু আর শরীরের সমস্ত স্থানে এই চর্ব্বিগুলি সঞ্চিত হয়ে অন্যান্য কর্ম্মক্ষম যন্ত্রগুলিকে চাপিয়া রাখে।

মাংসজাতীয় খাদ্য মাছ, মাংসে আমরা পাই। ইহা ছাড়া ডাল, গম, ইহাতেও মাংসজাতীয় শক্তি পাওয়া যায়। ইহারা শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক হয়ে গেলে মাংসপেশী, স্নায়ু খুব সবল করে। আমরা বড় লোভী জীব; তাই আমরা যতটুকু শরীরের পক্ষে প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক খাইয়া থাকি ও অবশেষে হজমশক্তি না থাকায় সেগুলি

বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হয় ও সেইগুলি আমাদের রক্তকে দূষিত করে।

আমাদের সকলকেই প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে হবে। আমরা দেখতে পাই যখন কতকগুলি বীজ মাঠে ছড়িয়ে দিই তারা ভবিষ্যতে কেমন করে প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত হয়। বীজ থেকে অঙ্কুর বাহির হবার জন্য মাটী সরস হওয়া চাই ও তাহার জন্য জল দরকার। এই অঙ্কুর একটু একটু করে রৌদ্রের সাহায্যে শাখাপল্লবে পরিণত হয়। ইহারা রৌদ্র, আলোক, জল না থাকিলে মোটেই বাঁচিতে পারিত না। আমরা যতই বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করি না কেন, এই প্রকৃতির সাহায্য বিনা ইহারা মোটেই জীবনশক্তি লাভ করবে না। আমরা যতই প্রকৃতির দ্বার রুদ্ধ করব ততই যন্ত্রণা, ক্লেশ ও অশান্তি সৃষ্টি করব।

প্রকৃতির মধ্যে রৌদ্র একটা প্রবল শক্তি। এই সূর্য্যকিরণে এত শক্তি আছে যে আমরা কল্পনা করিলে বিস্মিত হই। এই সূর্য্যের তাপ না থাকিলে আমাদিগের খাদ্যোপযোগী সামগ্রী মোটেই জন্মাইতে পারিত না। আমাদের কৃষিকার্য্যাদি বেশীর ভাগ জলের উপর নির্ভর করে। সমুদ্র থেকে জল রৌদ্র দ্বারা বাষ্পে পরিণত হয়; তাঁরা মেঘরূপে উপরে অবস্থান করে। সেইগুলিই পুনরায় জলধারা হয়ে পৃথিবীর উপরে পড়ে, তাহাতেই তরুলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে। রৌদ্রের প্রভাবে আমাদের অস্থি খুব শক্ত হয়ে যায়। এই জন্যই শিশু সন্তানদের জন্মাবার পর তেল মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইলে তাহাদের অস্থি রাশি খুব সবল হয়ে থাকে। আমরা যাহাকে যক্ষ্মা বলি সেই রোগের বীজাণু সকল রৌদ্রের তেজে ক্ষীণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। রৌদ্রের সাহায্যে অনেক দুর্গন্ধ দুরীভূত হয় এবং মানবপ্রাণে প্রফুল্লতা আনিয়া দেয়। এই রৌদ্র আমাদের জীবনধারণের একটা প্রধান কারণ।

আলো আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আলো আমরা রৌদ্র থেকেই পাচ্ছি এবং এই আলোর তলায় থাকিয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের দেহের জ্ঞান বাড়াতে পারি। আমাদের চক্ষুর সার্থকতা খালি আলো আছে বলেই। আমরা যতই কৃত্রিম উপায়ে অন্ধকার নিবারণ করবার চেষ্টা করি না কেন একথা ঠিক যে এই সূর্য্যের আলো ছাড়া আমরা বেশী দিন বাঁচিতে পারিব না। আলোয় পৃথিবীতে যাবতীয় মানব সমাজের শত্রু মাছি, মশা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

বাতাস কোথা থেকে আসে তা আমরা কিছুই জানিনা; কিন্তু আমরা একথা জানি যে বাতাস বন্ধ হলে আমরা বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারি না! এই যে প্রকৃতির নিয়মে বায়ু আবহমান কাল হতে প্রবাহিত হয়ে যায় তার যে কত কার্য্যকরী শক্তি তা একটু ভাবলেই আমরা বুঝিতে পারি। এমন প্রায়ই দেখা যায় কতকগুলি লোক একসঙ্গে সব বায়ু যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে, জানালা বন্ধ করে রাত্রে শুইয়াছিল, তার পর দিন তাদের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা গেল, কিন্তু আবার কৃত্রিম উপায়ে তাদের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পরে তাদের প্রাণ বায়ু ফিরিয়ে আনা হয়। আমাদের ফুসফুস মিনিটে ১৮ বার বায়ু টানিয়া লয়। ইহার ক্রিয়া ৩ মিনিট বন্ধ থাকিলে মানুষ মরিয়া যায়। জলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে না, মানুষ ইহার নীচে শ্বাস রুদ্ধ করে ৩ মিনিটের বেশী থাকিতে পারে না কাজে কাজেই জলমগ্ন ব্যক্তির ফুসফুসের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া তার শ্বাসশক্তি রোধ করে দেয়। বায়ু দেহের মধ্যে যেতে না পারায় ঐ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যু

মুখে পতিত হয়। বায়ু আমাদের রক্ত প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত কনিকাকে সঞ্জীবিত করে। বায়ু আমাদের জীবনধারণের একটা অন্যতম কারণ।

জলের অপর নাম জীবন। এই জল আমাদের মাঠে বাগানে যে সব খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে! আমরা একদিন জল খাওয়া বন্ধ করলে নিস্তেজ হয়ে পড়ি। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে মানুষ একটু জল খেতে পেলে যেন তার জীবনে শক্তির উদ্রেক হয়। এইরূপ পল্লীগ্রামে কত লোক তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক গণ্ডুষ জলের জন্য ছুটাছুটি করছে। মরুভূমিতে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে মানুষ যখন জল পাইবার জন্য চারিদিকে খুঁজে নিরাশ হয়ে ফিরে তখন কত লোক মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে! এই জল আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায়।

রৌদ্র ও আলো আমাদের সমস্ত অপরিষ্কৃত জিনিষকে শুদ্ধ করিয়া দেয়। শীতপ্রধান দেশে যখন কিছুদিন রৌদ্র না পাওয়া যায় তখন শরীরের রক্ত যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করে যদি ঘরে রৌদ্র, আলো না আসতে দিই তবে সে ঘরে নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও একপ্রকার দূষিত বাষ্প ভরিয়া উঠে যাহা মানুষকে বিরক্ত করে দেয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র রক্ষিত

(ক্রমশঃ)

ভাই বোন

সে আজ অনেকদিনের কথা। কতদিনের কথা যদি বলি তবে মনে ধারণাই করিতে পারিবে না। যেমন বারো মাসে এক বৎসর, সেই রকম বারো বৎসরে এক যুগ, আবার একশত বৎসরে হয় এক শতাব্দী। এই রকম কত যুগ, কত শতাব্দী পূর্ব্বের কথা: এক ছিলেন রাজা। রাজার মত রাজা। এমনটি আর পৃথিবীতে কখন হয় নাই। সেই জন্য সকলে বলেন ইনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজ্যও ছিল খুব বড়। এত বড় যে ভারতবর্ষ—তাহার প্রায় সকল লোকই সেই রাজার প্রজা। প্রজাগণ ছিল যেন তাঁর আপন ছেলে-মেয়ে! এমনি ভালবাসিতেন। কি করিলে তাহাদের ভাল হয়, সকলে সুখে থাকিবে এই চিন্তাই ছিল তাঁহার মনে।—বড় বড় রাজপথ, মানুষ ও পশু পক্ষীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কেমন করিয়া প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী ধর্ম্ম লাভ করিবে তাহার উপায় ঠিক করিবার জন্য সময় আর অর্থ দুইই বিনা বাধায় ব্যয় করিতেন।

তিনি ছিলেন মহাত্মা বুদ্ধদেবের শিষ্য। তখনকার দিনে লোকে যাগ যজ্ঞ, পশু বলি, ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দান করিয়াই ভাবিত ধর্ম্ম হইয়া গেল। তাহারা অন্য লোককে ঘৃণা করিত; স্ত্রীলোক-দিগকে মায়ের মত ভক্তি করিত না। তাই বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন

নর নারী সাধারণের
সমান অধিকার,

যার আছে জ্ঞান পাবে ত্রাণ
নাহি জাতবিচার।

রাজা বুদ্ধদেবের উপদেশ মানিয়া দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। রাজ্য ছাড়িয়া তিনি বনে যান নাই। রাজপ্রাসাদের মধ্যে থাকিয়া, রাজকার্য্য করিতে করিতেই তাঁহার অন্তরের সাধনা চলিয়াছিল। রাজা হইয়াও তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিতেন; কিন্তু আজও কত শত নর নারী তাঁহাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে; তাঁহাকে প্রণাম করে। মানুষের হৃদয়ে তিনি এখনও রাজত্ব করিতেছেন এবং চিরকালই করিবেন। এতদিন ধরিয়া আর কে রাজত্ব করিয়াছে? এমন রাজার নামটি তোমরা ভুলিও না। তাঁহার নাম অশোক।

অশোকের দুই রাণী! এক জনের নাম দেবী। তাঁহার ছিল এক পুত্র আর এক কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, আর কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। মহেন্দ্র বড়, সঙ্ঘমিত্রা দাদার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। দুই ভাই বোনই বাবার গুণ আর মায়ের রূপ পাইয়াছিল। দুই জনেই ছিল অতি সুন্দর। বোনটি আরও সুন্দর। চাঁদ যেমন সুন্দর, ফুল যেমন সুন্দর, দুই ভাই বোনে ছিল তেমনি সুন্দর। চাঁদের জ্যোৎস্না আছে, ফুলের সুগন্ধ আছে; এই দুই ভাই বোনেরও তেমনি গুণ। তাই যে দেখে সেই ভালোবাসে, কোলে করে, চুমা খায়। রাজার ছেলে রাজার মেয়ে—কত সোহাগ, কত আদর! রাজ রাণীর আনন্দ আর ধরে না। মায়ের মন পড়িয়া থাকে মহেন্দ্র-সঙ্ঘমিত্রার কাছে। এই ভাবে সকলের ভালোবাসার মধ্যে, পিতামাতার স্নেহের ভিতরে, ভগবানের আশীর্ব্বাদের ছায়ায় দুই ভাইবোন বড় হইতে থাকে।

দিন যতই যায় ভাইবোনের ভাব ততই বাড়ে। এক দণ্ডও কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়া হয় না। এক সঙ্গে খেলে, এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে মায়ের বুকে ঘুমায়। দুই জনে মায়ের দুই পাশে মুখ লুকাইয়া কত কথা বলে, কত খেলা করে।

আরও দিন যায়। কেবল খেলা করিলেই ত আর চলে না। পিতামাতা ভাইবোনের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিলেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ সাধুগণ সকলেই পুরুষ আর স্ত্রীকে সমান ভাবে দেখিয়াছেন, আর বলিয়াছেন কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন করিবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ কি তবে করিবেন না। দুই ভাইবোন গৃহে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পড়া আরম্ভ করিল। তাহাদের শিক্ষায় উন্নতি দেখিয়া পিতামাতার মন সুখী হইল। যেমন রূপে যেমন গুণে তেমনি লেখা পড়ায়। এখন হইতে দুই ভাইবোনে আরও আদর পাইতে লাগিল, আরও ভালোবাসার অধিকারী হইল।

দিন যায়—দিন যায়। কত মাস গেল ও কত বৎসর গেল। এখন মহেন্দ্রের বয়স কুড়ি, সঙ্ঘমিত্রার বয়স আঠার। যে ফুলে গন্ধ থাকে না কেবল দেখিতেই সুন্দর—সে ফুল মানুষের তত প্রিয় হয় না, কিন্তু ফুলে সুগন্ধ থাকিলে লোকে কত ভালবাসে। ভাইবোন সুন্দর ত ছিলই, এখন লেখা পড়া শিখিয়া, নানা পুস্তক পড়িয়া, কত দেখিয়া শুনিয়া, অন্তর দুইটী জ্ঞানে ভরিয়া গিয়াছে, সুগন্ধে ভরপুর হইয়াছে। এখন আর তাহারা ধূলা খেলা খেলে না। দুইজনে গান গায়, ভালো ভালো বই পড়ে, আর ভগবানের উপাসনা করে—পূজা করে। ফুল যেমন একটী একটী করিয়া পাপড়ী মেলিতে মেলিতে ঠিক ফুটিবার পূর্ব্বে কেমন সুন্দর হয়, কত প্রিয় হয়; কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ যেমন এক এক কলা বাড়িতে বাড়িতে নবমী বা দশমী তিথিতে আরও সুন্দর আরও প্রিয় হয়, তেমনি মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা যৌবনে পা দিতেই

আরও সুন্দর হইল, সকলের আরও প্রিয় হইল। মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রার নাম সকলেরই মুখে,—সকলেই দুই ভাইবোনের গুণ গায়। পিতামাতা তাহাদিগকে মনের মত করিয়া সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন।

মহারাজ অশোকের বড় ইচ্ছা হইল মহেন্দ্রকে সিংহাসনে বসান্; তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুত্র রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে "যৌবরাজ্যে অভিষেক" বলে। কিন্তু সিংহাসন ত আর রাজার নয়। প্রজারা যাঁহাকে ইচ্ছা করিবে তাঁহাকেই রাজা করিবে ইহাই ছিল ভারতের নিয়ম। তাই মহারাজ সকলের মত জানিতে চাহিলেন। এমন ছেলে সিংহাসনে বসিবে তাহাতে আর কাহার আপত্তি থাকিতে পারে? সকলই ঠিক্। যে সব আয়োজন করিতে হয় সকলই হইল। মহেন্দ্র সিংহাসনে এই বসে। এমন সময় সব গোলমাল হইয়া গেল। মানুষ এক ভাবে আর ভগবান অন্য এক করেন। হইলও তাহাই। একদিন কথায় কথায় একজন বৌদ্ধসন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন ধর্ম্মের জন্য কত লোকই ত টাকা দেয়, নিজের বুদ্ধি দেয়, শক্তি দেয়। কিন্তু কে কবে নিজের ছেলে বা মেয়েকে দান করে? এইরকম দেওয়াই সবার চাইতে বড় দান। আর যিনি এইরকম দান করিতে পারেন তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের বড় বন্ধু।

যিনি ধর্ম্মের জন্য সমস্ত ধন সম্পদ অনায়াসে দান করিতেন,ধর্ম্মের জন্য যিনি ছাড়িতে পারেন এমন সুখ নাই, করিতে পারেন এমন কাজ নাই—তিনি যে ছেলে বা মেয়েকে ভগবানের প্রিয় কাজ করিতেই নিযুক্ত করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু এখন ছেলে মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি জন্মিয়াছে, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারে। এখন ত আর পিতা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে বলিতে পারেন না! তিনি সেই সন্ন্যাসীর কথা উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন, এবং তাহাদের কি মত তাহা জানিতে চাহিলেন।

ভাইবোনে যাহা খুঁজিতেছিল তাহাই পাইল। কতদিন তাহারা বসিয়া বসিয়া ঠিক করিয়াছে যে, দুই ভাই বোনে সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবে, রাজভোগের মধ্যে সুখে গৃহে থাকবে না। আজ তাহাদের সেই সুযোগ আসিয়াছে। দুইজনেরই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই জনে এক সঙ্গেই বলিল "হাঁ বাবা, আপনি বলিলেই আমরা সন্ন্যাসী হইব।" পিতাও তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে বলিলেন "আজ হইতে ধর্ম্মের জন্য আমায় পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ করিলাম।"

এখন হইতে এত বড় রাজার ছেলে রাজার মেয়ে সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাসীর কাজ সকলের সেবা করা, সকলকে ধর্ম্ম কাজে সাহায্য করা। দুই ভাই বোনে সন্ন্যাসীদিগের নিকট ঐ শিক্ষা লইতে আরম্ভ করিলেন।

মহেন্দ্রের বয়স যখন বত্রিশ বৎসর তখন তিনি সিংহল গমন করেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য। তখন রেল ছিল না, মোটর ছিল না, ষ্টীমার ছিল না; রাজার দুলাল কোন বাধাই গ্রাহ্য না করিয়া সেই সুদূর দেশে পিতা মাতা ছাড়িয়া সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কেবল এক বাধা স্নেহের বোন। এতদিন তাঁহারা এক সঙ্গেই কাটাইয়াছেন। যাহা কিছু করিবার একসঙ্গেই করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণও করিয়াছেন ভাই বোন একই সঙ্গে। এখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া দুই ভাইবোনে পৃথক হইতে হইল। দুই জনেরই মনে ব্যাথা লাগিল, কষ্ট হইল। হয়ত দুই জনেই লুকাইয়া লুকাইয়া চোখের জল ফেলিলেন। উভয়েই বুঝিয়াছেন

ভগবানের ইচ্ছাই মাথাপাতিয়া লইয়া মাত্র পৃথিবীর এই কয়েকটা দিনের জন্ত উভয়েক পৃথক হইতে হইবে।

কিন্তু ভগবান নারবে থাকিয়া ইহার বিপরীত ব্যবস্থাই করিলেন। মহেন্দ্র সিংহলে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজাত বহু সম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেনই; আরও, তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, সবার উপর তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া বহুলোক এত মুগ্ধ হইল যে অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বহু স্ত্রীলোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য মহেন্দ্রের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি দেখিলেন এমন এক জন নারী আবশ্যক যিনি সকল স্ত্রীলোব-দিগকে উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারেন। তৎ-ক্ষণাৎ মনে পড়িল বোনের কথা। এতদিন পরে আবার দুই ভাইবোনে একত্র থাকিতে পাইবেন এই আশায় তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পত্র লিখিলেন সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইবার জন্য।

সংবাদ পাইয়া সংঘমিত্রার মনও পুলকে ভরিয়া গেল। কতদিন পরে আবার দাদাকে দেখিবেন, আবার এক সঙ্গে তাঁহাদের প্রিয় ভগবা-নের প্রিয় কাজ করিতে পাইবেন। পিতা অনুমতি দিলেন; সংঘমিত্রা সমুদ্রে যাইবার জাহাজে চড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি, প্রিয় পিতামাতা, সকলই ছাড়িয়া চলিলেন। ভারতের আর কোনও নারী ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হইয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এরূপ হওয়াত সম্ভবই নয়। "যা নাই ভারতে তা' নাই জগতে।" ভারতবর্ষের সে এক বড় শুভদিন। ভারতের নারী চলিলেন ধর্ম্মপ্রচার করিতে। এমনি করিয়া ভগ-বান দুই ভাই বোনকে একত্র করিলেন।

উভয়েই পরম উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। সঙ্ঘমিত্রা স্ত্রীলোক দিগের জন্য এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। দুই ভাই বোনের আকর্ষণে কত পুরুষ, কত নারী যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন তাহা বলিবার নয়। সংঘমিত্রাই ভারতের এবং পৃথিবীর প্রথম মহিলা ধর্ম্মপ্রচারক। এই জন্য সকলেরই তাঁহার নাম মনে রাখা উচিত। যত দিন ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকিবে, জগতে ধর্ম্মের কথা লোকে শুনিবে ততদিন এই দুই ভাই বোনের কথা অমর হইয়া থাকিবে; মহেন্দ্র,—সংঘমিত্রার পবিত্র নাম সকলে ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিবে। সকল ভাই বোন যদি এই দুই ভাই বোনের মত হও তবে কি সুন্দর, কি আনন্দের বল দেখি!

জাপানের পথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই জুলাই মঙ্গলবার —

নিজের কাজকর্ম্ম সারতে সকালবেলা অনেক দেরী হয়ে গেল। ৯টার সময় অপর জাহাজের একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাণ্টন থেকে ferry ফেরী নিয়ে হংকংএ পৌঁছালাম। প্রথমে এক ঔষধের দোকনে যাই, সেখানে গিয়ে আমার যে সব ঔষধপত্রাদি দরকার,তার ব্যবস্থা করে এলাম। এখান থেকে আর একটা দোকানে গেলাম। সেখানে বড় ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করিলাম; তারপর পাহাড়ের রাস্তায় খানিকটা উপরে উঠে গেলাম। সেখান থেকে নেমে আমরা জাহাজে চলে আসি। বিকালবেলা Hongknog Peak Railwayতে উঠি এবং একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠে যাই। একটু নীচেই সৈন্যদের march ও Band এর আওয়াজ শোনা গেল।

উপর হতে হংকং সহর ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্তরে স্তরে সাজান বাড়ীগুলি বড় বিস্ময়কর লাগছিল। এই পাহাড়ের মাঝে মাঝে গাছগুলির ডাল এমন ভাবে মিশে গেছে যে এক একটা বিশ্রামের স্থান হয়ে রয়েছে। পাহাড়েরউপর অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে সমতল ভূমি করা হয়েছে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড জলাশয়। তন্মধ্যে বহু নরনারী স্নান ও সন্তরণ করছে। এইখানে Botanical garden রয়েছে। তার অনুপম সৌন্দর্য্যে বড় মুগ্ধ হতে হয়। ইহার ভিতর চক্রাকারে চলে গেছে। আশে পাশে অনেক বেঞ্চি এবং তাতে নানাদেশীয় বালক বালিকা ক্রীড়া করছে। এইখান থেকে সমুদ্র ঠিক সবুজ কাঁচের মত মনে হল, তার উপর জাহাজগুলি ঠিক যেন নৌকার মত ভাসছে এবং নৌকাগুলি সমুদ্রের বুকে এক একটা কাল দাগ বলে মনে হচ্ছিল। এই খানেই পাহাড়ের গা দিয়ে একটা ঝরণা তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে—চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলেছে। অস্তগামী সূর্য্যের আলো পড়ায় চারিদিক রাঙা হয়ে গেছে। শেষ স্বর্ণরশ্মি জলেতে পড়ায় জলের অপূর্ব্ব শ্রী দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে পাহাড়ের গা দিয়ে ভেসে যায়। কোথাও কোন সৌন্দর্য্যের ত্রুটী নাই।

১৩ই জুলাই

সকালবেলা জাহাজখানা wharf থেকে ঘুরে গেছে। হাঁসপাতালে গিয়া দুইজন অসহায় দুর্ব্বল যাত্রীদের দেখে এলাম। তারা বড় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এইখানে অনেকগুলি দুষ্টচরিত্র স্ত্রীলোক প্রায় সকল সময়েই জাহাজের উপর এসে যাত্রীদের বিরক্ত করে। উপরটা বেশ শীতল ছিল; সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়া বড় ভাল লাগল। অদূরেই আলোক-শোভাময়ী নগরী। ঐ পাহাড় যেন আলোকমালায় ঘিরে রয়েছে, সব যেন আলোর মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছে। ঐ প্রাসাদোপম বাড়ীর ভিতর ও বাহির হতে আলো এসে যেন হংকংয়ের জলকে উদ্ভাসিত করেছে। সৌন্দর্য্যভরা পর্ব্বতশ্রেণী তার বুক আলো করে আছে। এই অসংখ্য দীপমালা পথিকের নয়নে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

১৪ই জুলাই

এখন জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী খুব কম তবে ১ম শ্রেণীর যাত্রী অনেক এসেছেন। সকাল-বেলা সাড়ে দশটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিল। হংকং থেকে এইবার জাহাজ ছেড়ে গেল। এইবার যাত্রী কম থাকায় আমার কাজ কর্ম্ম অনেক কমে গেছে। প্রত্যহই আকাশে একটু না একটু মেঘ দেখা যায় কিন্তু আজ মেঘের লেশমাত্র নাই। নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশ, আজ পূর্ণ চন্দ্রোদয়। এমন সুন্দর রাত্রি দেখবার সুযোগ অনেকদিন ঘটে নাই। চাঁদের জ্যোৎস্না সাগরের জলে উথলে পড়েছে। সাগরের বুকে জাহাজে করে যাওয়া, মৃদুমন্দ সমীরণ ও পূর্ণ চন্দ্রের শোভা সব আমায় যেন আজ ভুলিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের বুকে যেন সোণার বাতি জ্বালা রয়েছে। ছোট বড় ঢেউ চাঁদের কিরণে ঝলকে ঝলকে উঠছে আর নামছে। একখানা ছোট নৌকা ভাসতে ভাসতে কোন সুদূরে ভেসে এসেছে। এখানে নিকটবর্ত্তী কোন তীর নাই। চাঁদের কোমলতা আজ প্রচণ্ড সমুদ্র-কেও বশীভূত করেছে।

১৫ই জুলাই

জাহাজ পরিষ্কার হাওয়ায় ছুটে চলেছে। সকাল বেলা Camforader No 1 কে একবার দেখে আসি তার জ্বর হয়েছিল। ২টার সময় জাহাজ আময় বন্দরে পৌঁছিল। আময় একটা ছোট দ্বীপ। এখানকার চীনারা অতি দুর্দ্দান্ত; তারা অসম সাহসী, অনেকে লুটপাট করে খায়। বন্দরে জাহাজ এলে তাদের নৌকার উপর থেকে একটা লম্বা লোহার শিক জাহাজের গায়ে আটকে দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসে। একসঙ্গে ৮।১০ জন টপাটপ উপরে চলে আসে। সমুদ্রের অপর ধারে কলাংসু। এখানে খুব বড় বড় পাহাড় কাল পাথরে ভর্ত্তি। আমাদের জাহাজের সব কুলী যাত্রী প্রায় এইখানে নেমে গেল। জাহাজ না থামাতেই আশে পাশে অনেক ছোট ছোট নৌকা এসে ঘিরে ফেলিল। সেই নৌকাগুলিতে ভারে ভারে যাত্রী বহন করে টলমল অবস্থায় তারা চলে গেল। যেতে যেতে একখানা নৌকা ডুবে গেল, তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাতে কোন যাত্রী ছিল না। সন্ধ্যার পর সাং-হাইয়ের পথে জাহাজ ছেড়ে দিল।

শ্রী অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত।

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) আপাততঃ মনে হয়, যে বানর ৫টি কলা আনিয়াছিল সে ৫ পয়সা পাইবে, ও যে ৩টি কলা আনিয়া-ছিল সে ৩ পয়সা পাইবে। কিন্তু তাহা নয়। কলা আনার দরুণ তো কেহ দাম পাইবে না, হনুমানকে কলার অংশ খাইতে দেওয়ার দরুণই দাম পাইবে।

মনে কর, প্রত্যেকটি কলাকে যেন তিন সমান ভাগ করা হইল। সবশুদ্ধ ৮টী কলায় ২৪ ভাগ হইল তিন জনের প্রত্যেকে তার ৮ ভাগ করিয়া খাইল। প্রথম বানরের ৫টি কলায় ১৫ ভাগ হইয়াছিল সুতরাং সে নিজে ৮ ভাগ খাইয়া হনুমানকে ৭ ভাগ দিয়াছিল। দ্বিতীয় বানরের ৩টি কলায় ৯ ভাগ হইয়াছিল, সুতরাং সে নিজে ৮ ভাগ খাইয়া হনুমানকে ১ ভাগ মাত্র দিয়াছিল। অতএব, প্রথম বানর ৭ পয়সা ও দ্বিতীয় ১ পয়সা পাইবে।

(২) মহাভারত

নূতন ধাঁধা

(৩) দুই-পা বসিয়াছিল তিনি পায়ের উপরে, তার কাছে রাখিয়াছিল এক পা। চুপি চুপি চার পা আসিয়া সেই এক পা লইয়া পলাইতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাইয়া দুই পা উঠিয়া তিন পা ছুড়িয়া মারিল চার পায়ের গায়। তাহাতে চার-পা এক পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। দুই পা আবার সেই এক পা লইয়া তিন পায়ের উপর গিয়া বসিল।

বল তো কি কি ঘটিয়াছিল?

নীতি কথা

৺লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। মূল্য ।৵০

ভবিষ্যত জীবনে যাঁহারা স্বীয় জীবনকে মহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদের চরিত্রের ভবিষ্যৎমহত্বের বীজ বাল্যের ক্রীড়ার মধ্যে প্রথিত হইয়াছিল। বাল্যকালে যাহা একবার শুনি বা শিখি, তাহা জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির হইয়া অচল ও অটল থাকে অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে। সেই জন্য নীতির আদর্শ বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকখানি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সরল ভাষা এবং লিপিকুশলতায় বইখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দৈনিক

৺লাবণপ্রভা সরকার প্রণীত

মূল্য ১৲

দৈনিক ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থে বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় মনকে উপাসনার অনুকুল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায্যের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা ভক্তির আলোচনা একটী প্রধান সহায়। সুতরাং আমার আশা হয় যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেই বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।”

“দৈনিক সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পাঠের যোগ্য, ইহাতে কোন সম্প্রদায়িক ভাব নাই। ইহা ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী রচনায় লালিত্য ও ভাষার মাধুর্য্যে প্রচারগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।”

ভাই বোন

শিশুদিগের পাঠোপযোগী গল্পের বই। ইহাতে ভাই বোনের যে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র স্নেহের ধারায় সংসার সিক্ত ও আমাদের প্রত্যেকের শৈশব মধুময় হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার এই অখ্যায়িকায় বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন। শিশুমহলে বইখানি অন্যন্ত আদরণীয়।

মাতা ও পুত্র

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত মূল্য ।৵০

বালকবালিকাদিগের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক গল্পের বই। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি এত করুণ যে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয় অশ্রুজলে সিক্ত করে। যাঁহারা এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে ইহা সুকুমার হৃদয় বালিকাদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে মাতার উচ্চ আদর্শ, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের অতুলনীয় চরিত্র, বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সকল নীতি গল্পচ্ছলে দেখান হইয়াছে।

সূচিপত্র

১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাধের নাচ।

আবু ওসমান।

আবু ওসমান ধনীর ছেলে ছিল। বাড়ী খোরাসান দেশে। তার বাবা-মা তাকে চোগা-চাপকান পরাইয়া ও দামী কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া পাঠশালায় পাঠাইতেন। সঙ্গে তিন চারিজন চাকর যাইত।

এমন ধনী লোকের ছেলে; কিন্তু আবু ওসমানের মনটী বড় চিন্তাশীল ও কোমল ছিল। যারা

বাহির দেখিয়া ভুলে ও পোষাক-পরিচ্ছদ পাইলেই খুসী হয়, তাদের প্রতি তার বড় শ্রদ্ধা ছিল না। সে সর্ব্বদা ভাবিত, 'সর্ব্বসাধারণ যে সব বিষয় লইয়া বিব্রত, তা ছাড়া ভিতরের জিনিস কিছু আছে। তাই পাওয়া দরকার; তাই আমাকে পাইতে হইবে।'

একদিন আবু ওসমান বহুমূল্য পোষাক পরিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, পথের পাশে একটি দোকানের সম্মুখে একটি রুগ্ন গাধা শুইয়া আছে। গাধাটির পিঠে ঘা হইয়াছে; আর, একটা কাক সেই ক্ষতস্থান হইতে মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গাধাটীর এমন শক্তি ছিল না, যে কাককে তাড়াইয়া দেয়; কারণ তার মুখ পিঠ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। ইহা দেখিয়া আবু ওসমানের দয়া হইল। সে তৎক্ষণাৎ নিজের চোগা ও পাগড়ী খুলিয়া চাকরদের হাতে দিয়া বলিল, "চোগা দ্বারা গাধাটীর পিঠ ঢাকিয়া, পাগড়ীর কাপড়ে বাঁধিয়া দাও।" এমন দামী কাপড়গুলি সামান্য গাধার জন্য নষ্ট হইবে ভাবিয়া চাকরেরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু বালকের ব্যগ্রতা দেখিয়া, তাহারা কথামত কাজ না করিয়া পারিল না। আবু ওসমান চোগা ও পাগড়ী ছাড়া বিদ্যালয়ে গেল।

বিদ্যালয়ে গেল বটে, কিন্তু সেদিন তার পড়া-শুনায় মন বসিল না। হয়ত ভাবিতে লাগিল, 'যে সব জীব কথা বলিতে পারে না, তাদের কি কষ্ট! মানুষেরা তাদের দুঃখে কি উদাসীন!' যে কারণেই হউক, সেদিন তার মন বড় আকুল হইয়া উঠিল। স্কুল ছুটী হইলে, তার আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে ইয়হা নামক একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তির আশ্রমে চলিয়া গেল। সেদিন সে ভিতরের দয়ার জন্য বাহিরের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, মনে এক আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিয়াছিল। মহর্ষি ইয়হার উপদেশে সে ভাব আরও ফুটিয়া উঠিল। তার হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হইল।

বিদ্যালয়ে পড়া আর তার ভাল লাগিল না। সে বাড়ী গিয়া পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া মহর্ষি ইয়হার আশ্রমে বাস করিতে লাগিল, ও তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করিতে লাগিল।

ক্রমে আবু ওসমান আরও দুইজন ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া খুব জ্ঞানী হইল। ছোট সময় হইতে তার প্রাণ যা চায়—'ভিতরের জিনিস'—তাই পাইয়া সে ধন্য হইল।

বড় হইয়া আবু ওসমান একজন বিখ্যাত ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে দুই একটা ঘটনা বলিলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁর ভিতরের জ্ঞান কতটা ফুটিয়াছিল।

ভিতরের জ্ঞানের একটা লক্ষণ এই যে, তাতে অহঙ্কার অভিমান একেবারে লোপ হইয়া যায়। আবু ওসমানের তাই হইয়াছিল। একবার একজন লোক তাঁকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ ব্যক্তির দরজায় উপস্থিত হইলে, তার মনে কেমন একটা খেয়াল জাগিল। সে তাঁহাকে সম্মান করিয়া ঘরে ডাকিয়া না লইয়া, বলিল, "পেটুক! এখানে খাইতে আসিয়াছ? আমার ঘরে খাদ্য নাই; চলিয়া যাও।" আবু ওসমান চলিয়া গেলেন। কিছু দূরে গেলে, নিমন্ত্রণ-কারী তাঁকে আবার ডাকিল; তিনি আবার আসি-লেন। সে পুনরায় বলিল, "আচ্ছা খাওয়ার সাধ! পাথর আছে, খাবে?" তিনি আবার চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ ব্যক্তি আবার ডাকিল, ও আবার তিরস্কার করিয়া বিদায় করিল। এইরূপে ত্রিশবার তাঁকে ডাকিল ও তাড়াইয়া দিল। কিন্তু আবু ওসমানের মনের ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অবশেষে নিমন্ত্রণকারী পরাস্ত হইয়া কাতর-

ভাবে তাঁর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল; বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য পুরুষ! ত্রিশবার আপনাকে অপমান করিয়া তাড়াইলাম; আপনার অণুমাত্র ক্রোধ হইল না!" তিনি বলিলেন, "এ আর আশ্চর্য্য কি? কুকুরের ব্যবহারও এইরূপ। তাকে ডাক, আসিবে; তাড়াইয়া দাও, চলিয়া যাইবে। আবার ডাক, আসিবে; অভিমান করিবে না। যে ব্যক্তির ব্যবহার কুকুরের ব্যবহারের তুল্য, তার আর গৌরব কি?

আর একটী ঘটনা বলি; দেখিবে, মন্দ লোককেও তিনি কেমন ভালবাসিতেন। মন্দ লোককে ভালবাসাও ভিতরের জ্ঞানের একটা লক্ষণ। এক দিন তিনি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন, একটী দুশ্চরিত্র যুবক মদের নেশায় টলিতে টলিতে চলিয়াছে। তার চুলগুলি লম্বা ও কোঁকড়ান; হাতে একটী বাদ্যযন্ত্র। মাতাল হইলেও তার তখন জ্ঞান ছিল। সে মহর্ষি আবু ওসমানকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইল; এবং চুলগুলি টুপি দ্বারা ঢাকিতে ও বাজনাটী কাপড়ের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিল। আবু ওসমান ইহা দেখিয়া, তাহার কাছে গেলেন ও স্নেহের বাক্যে বলিলেন, "ভাই, ভয় করিও না; আমরা সকলেই এক।" যুবক তাঁহার ভাব দেখিয়া ও মিষ্ট কথা শুনিয়া আপন চরিত্রের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। তিনি তাকে আদর করিয়া নিজের কুটীরে লইয়া আসিলেন ও স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরাইলেন। পরে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন, "প্রভু পরমেশ্বর! আমার যাহা করিবার, করিলাম; অবশিষ্ট তোমার করিতে হইবে।" অর্থাৎ, "আমি এই যুবককে আদর করিয়া আনিলাম, স্নান করাইলাম ও শুদ্ধ বস্ত্র পরাইলাম; কিন্তু ইহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে ভাল করা ত আমার সাধ্য নাই, তুমি তাহা কর।" পরমেশ্বর নিঃস্বার্থ ও কাতর প্রার্থনা শুনেন। তৎক্ষণাৎ সেই যুবকের মধ্যে আশ্চর্য্য ভাব দেখা গেল; সে সেই দিন হইতে নিজের স্বভাব বদ্‌লাইয়া শীঘ্রই ভাল হইয়া গেল।

যার ছোট সময় দুঃখী গাধার প্রতি দয়া ছিল, বড় হইয়া তার যে দুঃখী মানুষের প্রতি এমন দয়া হইবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রী অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দুই বন্ধু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিত সংক্ষিপ্তাকারে ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

বন্ধুতা ভঙ্গ

সেই দিন বৈকালে এটর্ণির আফিস হইতে নলিনের নামে পত্র আসিল, তাহার বসত-বাটীখানিও এখন ভবানীপুরের বিপিনবাবুর সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, অদ্য হইতে এক সপ্তাহের মধ্যেই যেন বাড়ী সে খালি করিয়া দেয়।

সে রাত্রি এই অভাগ্য দম্পতির যে কি ভাবে কাটিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

পরদিন প্রভাতে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বলিল—"দেখ, একবার ভবানীপুরে গিয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করলে হয় না?"

নলিন বলিল,—"কি ফল হবে?"

"দেখ, তিনি তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তাঁর কাছে পঁচিশ হাজার টাকা ধার করেছ বলেই যে তিনি এমন করে আমাদের সব বাড়ীগুলি নিয়ে নেবেন, এত সহজে বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, তোমায় ভয় দেখাবার জন্যে তিনি এমন করেছেন। তুমি গিয়ে একটু বল্লে কইলেই বোধ হয় আরও কিছু সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন।"

নলিনের মনে মনে বিপিনের উপর বড় রাগ হইয়াছে। সে ওষ্ঠযুগল বক্র করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"হুঁঃ,—ছেলেবেলাকার বন্ধু! তারা হ'ল টাকাওয়ালা লোক,—টাকাই তাদের ধ্যান, টাকাই তাদের দেবতা। ছেলেবেলাকার বন্ধু! যখন পাঁচ বছর আগে তার কাছে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিলাম, তখনই সে বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছি। টাকা দেবার নাম শুনেই যেন তার ঘূর্ণী রোগ ধরল,—ছটফট করতে লাগল। নিমন্ত্রণের নাম ক'রে বেরিয়ে যাবার যোগাড় করতে লাগল। শেষে যখন "কট্‌কবালার" কথা বল্লাম, যাতে পাঁচ বছর ফুরিয়ে গেলে বাড়ী তিনখানি আপনা-আপনিই তার হয়ে যাবে, তখন সে স্থির হল। তুমিও যেমন, বিষয়ী লোকের আবার বন্ধুত্ব!"

হেমাঙ্গিনী আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে বলিল,—"লোকে বলে, ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। তুমি হয়ত তাঁর প্রতি অবিচার করছ।"

"হ্যাঁঃ—ভালবাসা!—ছিল বটে এককালে ভালবাসা। সে ভালবাসা টাকার বস্তার চাপে প'ড়ে অনেক দিন মারা গেছে।"

হেমাঙ্গিনী নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া নলিন ব্যথিত হইল। বলিল—"আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, তখন যাই, গিয়ে একবার ব'লে ক'য়ে দেখি। সময় বাড়িয়ে নেওয়া মিছে। আমি টাকা কোথা পাব, যে এক বছর কি দুবছর পরে শোধ করব? দেখি যদি ভাড়াটে বাড়ী দুখানি নিয়েই সে সন্তুষ্ট হয়; বসত বাড়ীখানি আমায় ছেড়ে দেয়।"—বলিয়া নলিন যাইতে প্রস্তুত হইল।

হেমাঙ্গিনী বলিল—"একটু জল মুখে দিয়ে যাও,—কাল রাত্তির থেকে কিছু খাও নি।" বলিয়া দুইটী সন্দেশ আর এক গেলাস জল আনিয়া দিল। বাক্স খুলিয়া হেমাঙ্গিনী ট্রামের পয়সা বাহির করিতেছিল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল—"আর কত আছে?"

"সওয়া তিন টাকা।"

"থাক—ট্রামের পয়সায় কাজ নেই,—ঠাণ্ডায় হেঁটেই যাব এখন।" হেমাঙ্গিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাক্স বন্ধ করিল।

নলিন যখন পদব্রজে ভবানীপুরে বিপিনবাবুর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। দ্বারবানের নিকট শুনিল, বাবু বাড়ীতেই আছেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর দারোয়ানজি নলিনের আগমন সংবাদটা জানাইতে স্বীকৃত হইল। ক্রমে নলিনের ডাক পড়িল।

বিপিনবাবু তখন নীচের তালাতেই বারান্দার প্রান্তবর্ত্তী কক্ষখানিতে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। নলিনকে প্রবেশ করিতে শুনিয়াও প্রথমটা বিপিনবাবু সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইলেন না। একটু অপেক্ষা করিয়া নলিন বলিল—"বিপিনদা।"

বিপিনবাবু তখন চক্ষু তুলিলেন। দেখিলেন,

নলিনের বেশে আর সে পূর্ব্বেকার পারিপাট্য নাই। চুলগুলা উড়িতেছে। তিনদিন না কামাইয়া দাড়িগুলা খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে একটা বর্ণবিকৃত কোট, তাহার উপর একখানা পুরাতন পৈতৃক বালাপোষ। মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটা বসিয়া গিয়াছে, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই।

বিপিনবাবু বলিলেন—"নলিন যে—বস।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নলিন উপবেশন করিল। বিপিনবাবু আবার সংবাদপত্রে মগ্ন হইয়াছেন। নলিন নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। বিপিনবাবু তখন সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া, স্থির দৃষ্টিতে নলিনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তারপর—কি মনে করে?"

"তুমি আমার মনের কথা কি বুঝতে পারছ না? আগে ত পারতে?" বলিয়া নলিন বিপিন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিপিনবাবুর ওষ্ঠযুগলে যেন একটু বিদ্রূপের হাস্যরেখা দেখা দিল। উত্তরে বিপিনবাবু মাত্র বলিলেন—"ছেলেপিলে সব ভাল আছে ত?"

"ভাল আছে। আজ তাদেরই জন্যে তোমার কাছে এসেছি—নিজের জন্যে আসি নি।"

বিপিনবাবু বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

"তুমি জান না ব্যাপার কি?"

"তুমি না বল্লে আমি কি করে জানব?"

"বাড়ী তিনখানা কি যাবে?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—"কোন্ বাড়ী? কোথায় যাবে?"

নলিনের আর সহ্য হইল না। উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ন্যাকামি রেখে দাও না! কোন্ বাড়ী তুমি জান না? কোথায় যাবে তুমি জান না? মানি, তোমার লাখো লাখো টাকা, কিন্তু আমার বাড়ী তিনখানা তুমি যে গ্রাস করে ফেলেছ তা তোমার মনে নেই—এ কথা আমি বিশ্বাস করব না। আমি নির্ব্বোধ বটে, কিন্তু অত নির্ব্বোধ নই।"—বলিতে বলিতে নলিনের চক্ষু দুইটা জ্বলিতে লাগিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নাসিকা বার বার স্ফীত হইতে লাগিল।

নলিনের এই রাগ ও উদ্ধত কথায় বিপিনবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন মনে হইতেছিল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলেন। জানালা দিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর চা আনব কি?"

বিপিনবাবু বলিলেন "না।"

খানিকপরে বিপিনবাবু নলিনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বাড়ীর কথা কি জিজ্ঞাসা করছিলে?"

নলিন বলিল,' 'জিজ্ঞাসা করছিলাম যে পঁচিশ হাজার টাকা তোমার কাছে ধার নিয়েছিলাম বলে কি আমার তিনখানা বাড়ীই যাবে?"

"দলিলে সেই কথাই লেখা ছিল না কি?"

"দলিলে লেখা ছিল তা আমি জানি। শাইলক্ মশাই, দলিলে লেখা ছিল বলেই কি পাউণ্ড অব ফ্লেশ আদায় করে নিতে হবে?"

তোমরা সুদখোর শাইলকের গল্প পড়িয়া থাকিবে। নলিন রাগিয়া বিপিনবাবুকে শাইলক্ বলায় বিপিনবাবুর মুখ আবার অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"টাকা সুদে আসলে কত দাঁড়িয়েছে, হিসেব করেছ?"

"করেছি।"

"কত?"

"প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার।"

"তুমি আমাকে শাইলক বলে গাল দিয়েছ। আমি যে শাইলক নই তার প্রমাণ আমি তোমায়

দিচ্ছি। দলিলে যে পাঁচ বছরের মেয়াদ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। এখন তুমি লাখ টাকা দিলেও, বাড়ী তিনখানা তোমায় ফিরে দিতে আমি আইনতঃ বাধ্য নই ত ?”

“তা নও।”

“আচ্ছা। তুমি আমায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দাও—আমি বাড়ী তিনখানা ফিরিয়ে দিচ্ছি। কেমন, শাইলক্ হলে; সে রাজি হত ?”

নলিন অধোবদনে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, বিনীত কাতরস্বরে নলিন বলিল—“ভাই, পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার কথা কি বলছ, আজ যদি পঁয়তাল্লিশটে টাকা নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করতে, তাও আমার সাধ্য হত না। ঘরে যা আছে, আজ কাল পরশু—তিনদিনের খোরাক হবে। তার পরদিন থেকে উপবাস।”

বিপিনবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন “আমায় কি করতে বল ?”

নলিন তখন হাত দুটি জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন “ভাই, ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসার দোহাই, আমাকে নষ্ট করো না। আমার সুদ কিছু তুমি মাপ কর। আমার ভাড়াটে বাড়ী দুখানার দামও অন্ততঃ ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা হবে—আমার দেনার আসল পঁচিশ হাজার টাকার চেয়ে ত অনেক বেশী। সেই দু'খানা বাড়ীই নাও। আমার পৈতৃক বসত বাড়ীখানি আমায় ছেড়ে দাও। নইলে ছেলেপিলে নিয়ে আমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। আমার মাথা গোঁজবার স্থানটুকু থাকলে, আমি খেটে হোক্—যেমন করে হোক্—ছেলেপিলে-গুলিকে ডাল ভাত খেতে দিতে পারব। আমি তোমার কাছে নগদ কিছু চাচ্ছিনে—যদিও আজ তিনটীমাত্র টাকা আমার সম্বল। তিনদিন আমার খাবার আছে, এর মধ্যে আমি একটা কিছু জোগাড় করে নেব। তুমি সুদের টাকা কিছু মাপ করে বসতবাড়ীর কবলাখানা আমায় ফিরে দাও।”

বিপিনবাবু মস্তক অবনত করিয়া শুনিতে ছিলেন। নলিনের বাক্য শেষ হইলে একবার জানালার বাহিরে বাগানের পানে, একবার নলিনের পানে চাহিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—“দেখ, তুমি তোমার ছেলে-পিলের কথা বল্লে, সেই রকম আমারও ছেলেপিলে আছে। আমরা যে খাটি খুটি, রোজগার করি, সে আমাদের ছেলেপিলের জন্যেই ত ? আমার বাপ পিতামহ যা বিষয় আশয় আমায় দিয়ে গেছেন, সেই সব বাড়িয়ে গুছিয়ে আমি আবার আমার ছেলে-পিলেদের দিয়ে যাব এই আমার কর্ত্তব্য। বন্ধুত্বের খাতিরে, যদি সে বিষয় সম্পত্তির কিছু ক্ষতি করি, তাহ'লে সেটা কি আমার অধর্ম্ম হবে না ?”

বাল্যবন্ধুর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্য বোধের কথা শুনিয়া বড় দুঃখেও নলিনের হাসি পাইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ঘৃণায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিল “সংসারের কি বিচিত্র গতি! যে একদিন, আমার পায়ে একটী কাঁটা ফুটিলে সমবেদনায় ম্রিয়মাণ হইত, সে আজ আমার এ দুর্দ্দশা দেখিয়াও কেমন অবিচলিত! যে হৃদয় ফুলের মত সুকুমার ছিল, নিশ্চয় অর্থ-লিপ্সা তাহাকে পাষাণের মত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে।”

নলিনকে নীরব দেখিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—“তোমার বসতবাড়ীখানির একজন ভাড়াটে জুটেছে। সে আমাকে এ বাড়ীর জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে চায়। আমার এটর্ণিরা কাল এ কথা চিঠিতে লিখেছে।”

নলিন বলিল—“হাঁ—কাল বৈকালে আমাকেও

তারা সাতদিনের পর বাড়ী ছেড়ে দিতে নোটিস দিয়েছে।”

বিপিনবাবু বলিলেন—“আমার বিবেচনায় এক খানা ছোট খাট ভাড়াটে বাড়ী খুঁজে নেওয়াই তোমার উচিত। উপরে একখানি কি দুখানি শোবার ঘর, নীচে একখানি রান্নাঘর, একখানি ভাঁড়ার ঘর, আর, কল পাইখানা থাকবে—এই হলেই ত তোমার সঙ্কুলান হয়ে যাবে। এ রকম একখানি বাড়ী, সহরের ভিতর ভাড়া বেশী লাগবে, এ ভবানীপুর অঞ্চলে দশ পনের টাকাতেও পেতে পার। ইচ্ছে কর ত আমার সরকারকে বলি, খুঁজে দেবে এখন। বড় বাড়ী তোমার দরকারই বা কি? তোমরা স্ত্রী পুরুষে, আর একটি ছেলে একটি মেয়ে বই ত নয়; ঐ রকম একখানি ছোট বাড়ীতে বেশ সঙ্কুলান হয়ে যাবে এখন। কি বল?

নলিন কথা কহিল না—মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন “বলব সরকারকে খুঁজে দেখতে?”

নলিন উচ্চকণ্ঠে কহিল “থাক্—তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমিই খুঁজে নিতে পারব। অনেক দয়াই ত করলে, আর একটু যদি দয়া কর, তা হলে আর নতুন বাড়ী খোঁজার দরকার হবে না। না খেতে পেয়ে, আমরা স্ত্রী পুরুষ ত বেশী দিন বাঁচব না। আমরা মরে গেলে, আমাদের ছেলে মেয়েই বা বেঁচে থাকবে কেমন করে? তুমি দয়ার সাগর, দয়া করে সময়টা একটু বাড়িয়ে দাও। সাত দিনের জায়গায় এক মাস করে দাও। যে বাড়ীতে জন্মেছি—সেই বাড়ীতেই মরি: তোমার ঐ বাড়ীতে একমাস থাকতে থাকতেই ম’রে ম’রে সাফ্ হয়ে যাব এখন।”

নলিনের কথাগুলা যেন প্রেতের মত অট্টহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপিন বাবু আবার বাগানের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিলেন।

নলিন উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্বরে বলিল—“তবে বিদায় হই। মিছে তোমার সময় নষ্ট করছি।”

বিপিন বাবু কোমল ভাবে বলিলেন,—“বস।”

নলিন বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

বিপিন বাবু বলিলেন “একটু চা আনব? খাবে?”

“না থাক্।”

বিপিন বাবু বলিতে লাগিলেন—“একটু আগে তোমায় যা বলেছি, বন্ধুত্বের খাতিরে আমার ছেলে পিলের প্রতি আমি অবিচার করতে পারব না—তা আমি ঠিকই বলেছি। তবে, আমি তোমার সমস্যা যে বুঝতে পারছিনে, তাও নয়। কিন্তু পৈতৃক ভিটেতে অনশনে প্রাণত্যাগ, ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য জীবিকার সন্ধানে বেরুতে হবে। মনে নেই? ছেলেবেলা ইস্কুলে আমরা পড়তাম—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়। না খেতে পেয়ে মরে যাব, ছেলে পিলে মরে যাবে, এ সব কি কথা? তুমি পুরুষ মানুষ—একি পুরুষের কথা? মনকে দৃঢ় কর—কোমর বেঁধে দাঁড়াও। এই কলকাতা সহরে দশ লক্ষ লোকের আহার জুটছে—তোমার জুটবে না? উদ্যোগী হও—কখনই তোমার স্ত্রী পুত্রকে অনাহারে মরতে হবে না।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিপিন বাবু অর্দ্ধ মিনিটকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর স্বর নামাইয়া বলিলেন—“এ অবস্থায় নূতন বাড়ী খুঁজে সেখানে গিয়ে বসা—মাসে মাসে তার ভাড়া যোগানো—

তোমার পক্ষে ভারি অসুবিধাজনক হবে। তাই আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করছি। তোমার বসতবাড়ীখানি আমি এক বছরের জন্য তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যদি চেষ্টা কর, আমার বিশ্বাস এই এক বছরের মধ্যে তুমি নিজের অবস্থার অন্ততঃ এইটুকু উন্নতি করে নিতে পারবে, যাতে বাড়ী ভাড়া ক'রে এই কলকাতা সহরে সপরিবারে গৃহস্থের মত বাস করিতে পার। আজকের তারিখ থেকে এক বৎসর পর্য্যন্ত তুমি ও বাড়ীতে বাস কর।"

কথা শেষ হইবামাত্র নলিন উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"বাল্যবন্ধু—ধন্যবাদ—এই অসাধারণ দয়ার জন্য ধন্যবাদ। পাদ্রী সাহেব এই অযাচিত উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।"—বলিয়া নলিন দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেব।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা তোমরা বড় হইলে আরও জানিতে পারিবে। এই শক্তি দ্বারা সূর্য্য, পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহ দিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে ঘুরাইতেছে। আবার এই শক্তি বৃষ্টিকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিতেছে। কল্পিত সব রাক্ষসদের গল্প শুনিতে ভালবাস, না? আচ্ছা বলত, এই মধ্যাকর্ষণ কি একটা রাক্ষসের চেয়ে অধিক শক্তি সম্পন্ন নয়? সে শক্তি কত বড় একবার ধারণা করিতে পার কি, যে শক্তি পৃথিবী ও আকাশের ঐ নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহ দিগকে টানিয়া রাখে এবং আকাশ হইতে বৃষ্টিকে পৃথিবীতে ফেলিয়া দেয়? আমরা ঘুমাইয়া থাকি কি জাগিয়া থাকি ঈশ্বরের এই মহাশক্তি নীরবে অদৃশ্য ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান এই মহাশক্তির কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে।

আবার এ দিকে দেখ। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গিয়া সূর্য্য আবার দেখা দিয়াছে। কিছুক্ষণ রৌদ্র পাইয়াই সব ভূমি কেমন শুকাইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে যে বৃষ্টি যেন হয়ই নাই। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কোথায় গেল বলত? তোমরা বলিবে যে বৃষ্টির কিয়দংশ ভূমির মধ্যে চলিয়া গিয়াছে এবং বাকি বৃষ্টি রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে। হাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু কেমন করিয়া শুকাইল বলিতে পার? সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। অতদূর হইতে সূর্য্যের তাপ কি করিয়া বৃষ্টিকণাগুলিকে স্পর্শ করিল? তোমরা কি এ কথা জান যে সূর্য্য হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে অদৃশ্য ঢেউ সকল আসিয়া আমাদের পৃথিবীতে লাগিতেছে? তোমরা পরের অধ্যায়ে এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিয়া বিস্মিত হইবে যে কেমন করিয়া এই ঢেউ সব সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, কেমন করিয়া তাহারা বৃষ্টির কণাগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া মেঘের মধ্যে লইয়া যায়। দেখ, শুধু এই বৃষ্টির জল শুকাইবার ব্যাপারটার মধ্যে কত শক্তির খেলা রহিয়াছে। কত অদৃশ্য পরী এখানে খেলা করি-

তেছে। তোমাদের সব মিথ্যা পরীদের অপেক্ষা এই সব বিজ্ঞান পরীদের কাজ কি তোমাদের নিকট কম কৌতুহল-উদ্দীপক, কম আমোদজনক মনে হইতেছে ? বল ত ?

শীতপ্রধান দেশে যেমন ইংলণ্ডে, শীতের দিনে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বৃষ্টি নীরবে তুষারের আকারে পড়িতে থাকে।

এইরূপ তুষারপাতের পর বাহিরে গিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে এক একটি তুষার খণ্ড অতি সুন্দর ছয় কোণবিশিষ্ট এক একটি নক্ষত্রের মত। কি করিয়া তুষার খণ্ডগুলির এইরূপ সুন্দর আকার হইল ? কোন শক্তি তাহাদিগকে এমন সুন্দর করিয়া গড়িয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিল ?

ঐ কাজল-ঘন মেঘের মধ্যে যে জলকণাগুলি আছে তাহারা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িবার পূর্ব্বে সংযোজন (cohision) শক্তি দ্বারা একত্রে ধৃত হইয়া এক একটি ফোঁটার আকার ধারণ করে—ইহা পূর্ব্বেই তোমরা জানিয়াছ। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে শীতে মেঘের ঐ জলকণাগুলি সংযোজন শক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া ফোঁটারূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে (crystallization—দানা বাঁধিবার শক্তি) নামক আর একটি শক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া অতি দ্রুত-ভাবে এইরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট তুষার খণ্ডের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পড়ে।

এখন তোমাদের আগুনের কথা বলি। কয়লা ও কাঠে দিয়াশলাই দিয়া আগুণ ধরাইয়া দিলেই আগুণ জ্বলিতে থাকে, না ? এই তাপ কোথা হইতে আসে : কয়লা এমন করিয়া জ্বলে কেন ? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই সব কয়লা গাছরূপে পৃথিবীতে ছিল। তখন সেই সব গাছ সূর্য্যকিরণ ধরিয়া রাখিয়াছিল। তারপর গাছগুলি মরিয়া ক্রমে পৃথিবীর নীচে প্রথিত হইয়া যায়, এবং সূর্য্য-কিরণও ঐ গাছের সহিত প্রথিত হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ বৎসর মাটীর নীচে থাকিতে থাকিতে ঐ সকল গাছ কয়লায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। তারপর কয়লার খনি হইতে খননকারীরা কয়লা তুলিয়া তোমাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে বলিয়া তোমরা তাহা পাইয়াছ। এখন এই কয়লা জ্বলে কেন তাহা বলিতেছি। তোমরা যেই একটি দিয়াশলাই জ্বাল, অমনি কি হয় জান ? অমনি এই দিয়াশলাইয়ের অণুগুলি (Atoms) বাতাসের অক্সিজেনের অণুগুলির সহিত সংঘর্ষিত হইয়া অদৃশ্য শক্তি তাপ (Heat) এবং রাসায়নিক আকর্ষণ (Chemical attraction) শক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেয়। তাহারা ঐ কয়লা ও কাঠের মধ্যস্থিত অণুগুলিকে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত করে ; তখন তাহাদের মধ্যে যে সূর্য্যকিরণ বহুকাল ধরিয়া বন্দী হইয়াছিল তাহা অগ্নির আকারে জ্বলিতে আরম্ভ করে।

এটা পরীর গল্প নয় ; কিন্তু এটা সত্য কথা যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের গাছগুলি যদি সূর্য্যকিরণ ধরিয়া না রাখিত তবে আজ আমরা কয়লা হইতে এই আগুণ পাইতাম না।

আমার এই পরীরাজ্যের কথা কি তোমাদের ভাল লাগিতেছে ? তাহা হইলে কল্পনা চক্ষে দেখ, ঐ সংযোজন (Cohision) পরী সমস্ত জিনিষের অণু (Atom) গুলির নিকটস্থ হইবামাত্র একত্রে বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, ঐ মধ্যাকর্ষণ (Gravitation) পরী বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে পৃথিবীতে টানিয়া আনিতেছে, ঐ ক্রিসটালিজেসন্ (Crystallization দানা বাঁধিবার শক্তি) পরী মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাগুলিকে লইয়া সুদৃশ্য তুষা-রখণ্ডে পরিণত করিতেছে।

তুমি কি মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখিতে পাইতেছ কেমন করিয়া ছোট ছোট সূর্য্যকিরণের ঢেউ সকল সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে? তুমি কি জানিতে চাও আর একটি অদৃশ্য পরী তাড়িত (Electricity) কেমন করিয়া ঐ আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের খেলা দেখায় এবং বজ্রের ভীষণ শব্দ উৎপন্ন করে? তোমার কি রাসায়নিক আকর্ষণের (Chemical action) বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়—যাহা জলে, স্থলে, শূন্যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সকল ঘটায়?

এই সব বিষয় জানিতে হইলে তোমাকে তোমার চক্ষু খুলিতে হইবে। তোমার চারিদিকে এত সব জানিবার জিনিষ রহিয়াছে যে তুমি কল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক জিনিষেরই ভিতর তাহার একটি ইতিহাস দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই সব জানিবার ইচ্ছা থাকা চাই। তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর জিনিষ যদি শুধু পানাহার ও নিজের আরামের জন্য ব্যবহার করিয়াই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাও; তাহা হইলে বিজ্ঞান পরীদের কথা কখনো জানিতে পারিবে না। কিন্তু যদি তুমি জানিতে চাও যে কেমন করিয়া এ পৃথিবীর ঘটনা সকল ঘটে; কেমন করিয়া মহান্ পরমেশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে পালন করিতেছেন; বাতাস কেমন করিয়া বহে; ছোট ফুলটি সূর্য্যকিরণে ফুটিয়া উঠে এবং তাহার দলগুলি ঝড়ে বন্ধ হইয়া যায় কেন এবং আরো অসংখ্য প্রশ্ন যাহা তোমার মনে উঠে অথচ নিজে তুমি তাহাদের উত্তর খুঁজিয়া পাও না, তাহা হইলে সেই সব বিষয় যে যে পুস্তকে আছে তাহা পড়িয়া অথবা নিজে পরীক্ষা (Experiment) করিয়া দেখিয়া জানিতে চেষ্টা করিবে, তবে ক্রমে ক্রমে সব বিষয় জানিতে পারিবে এবং জানিবার আকাঙ্ক্ষাও বাড়িবে।

ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া করিয়া কাহাকেও বিরক্ত করিওনা, কেননা যে প্রশ্নের উত্তর যত শীঘ্র ও বিনা আয়াসে জানিবে সে উত্তর তত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বরং অপরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কঠিন প্রশ্নের উত্তর যদি নিজে পরিশ্রম করিয়া জানিতে পার তবে চিরকালের জন্য তাহা তোমার মনে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি ভূমি হইতে শুকাইয়া যায় কেন, তাহা হইলে হয়ত তখনি উত্তর পাইবে যে, সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া যায়। তুমি এই উত্তর শুনিয়াই যদি সন্তুষ্ট থাক তবে এ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। কিন্তু তুমি অপরের কথায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি আগুনের উপরে একটী ভিজা রুমাল ধর তবে দেখিতে পাইবে যে ইহা হইতে জল ধোঁয়ার মত উঠিয়া যাইতেছে। তখন তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে যে কেমন করিয়া পৃথিবী হইতে জল তাপ দ্বারা বাষ্পরূপে আকাশে উঠিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী কুমুদিনী বসু

জীবজন্তুর কথা

জন্তু—মুটিয়া

আমরা যখন দূরস্থানে যাইবার জন্য ষ্টেশনে আসি তখন মুটিয়ারা আসিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার মোট বহিয়া লইয়া যাইব কি?" তাহারা এই কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে ও সংসার চালায়। কয়েকটী জন্তুও মুটিয়ার কাজ করিয়া থাকে—তাহাদের কথা বলিতেছি।

হলাণ্ড ও ডোভার প্রণালী হইতে বেলজিয়ামের বন্দর অষ্টেণ্ড (Ostend) অবধি দেখা যায় যে অনেক জন্তু-মুটিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ডাক্ ও বেলজিয়ামবাসিগণ কুকুর দ্বারা ছোট ও হাল্কা গাড়ী টানায়। কুকুরদের ঘোড়ার মত গাড়ীর সঙ্গে জুতিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা বেশ তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে। কুকুরদের কিন্তু গাড়ী টানিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইংরাজরা এরূপ করিলে আইনানুসারে দণ্ড পায়। তাহারা সমুদ্রের পরপারের লোকদের এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বেচারা কুকুরদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে অত ভারী বস্তু বহন করিবার সামর্থ্য নাই। যদিও বা তাহাদের সেরূপ শক্তি থাকিত তথাপি তাহাদের পায়ের গঠন সে কার্য্যের উপযুক্ত নয়। যদি ভারী বস্তু বহন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের সৃষ্টি হইত তবে তাহাদের পা, ঘোড়া কিম্বা গাধার মত দৃঢ় হইত।

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে যেখানে সমস্ত বৎসরে শীত ঋতুরই একমাত্র আধিপত্য সেখানে এস্কিমোরা কুকুরের দ্বারা ঘোড়ার কাজ করাইয়া লয়। সে দেশের চাকাহীন গাড়ীকে শ্লেজ (sledge) বলে তাহা কুকুরে টানিয়া লইয়া যায়। বরফের উপর দিয়া গাড়ী টানিয়া লইতে কুকুরদের তেমন কষ্ট হয় না কিন্তু ধূলিপূর্ণ রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। অনেক আবিষ্কারকরা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ভ্রমণ করিবার সময় অনেক কুকুর সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এ সব স্থানে কুকুর দ্বারা অনেক উপকার হয়। দুঃখের বিষয় যে যখন খাদ্যের অভাব হয় তখন তাহারা কুকুরকে মারিয়া তাহার মাংস আহার করিতে বাধ্য হয়।

ঐ সব শীতপ্রধান দেশে প্রায়ই হরিণে গাড়ী টানিয়া থাকে। তোমরা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছ যে হরিণের শিং গাছের ডালপালার মত। তাহার কপালের উপর যে শিংটী বাহির হয় সেটী খুব শক্ত। এই জাতের হরিণকে ইংরাজিতে Reindeer বলে। ইহা ৪।৫ ফিট লম্বা হয়। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ইহারা ঘণ্টায় ৯।১০ মাইল ছুটিয়া যাইতে পারে এবং অনেকক্ষণ এরূপভাবে চলিতে পারে। ইহার গায়ে এমন জোর যে অনায়াসে ছয় মণ ভারী জিনিষ টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের নানা প্রয়োজনে লাগে। ইহার মাংস পুষ্টিকর। ইহার চামড়া দ্বারা বস্ত্র তৈয়ারী করা হয় এবং ইহা ভারী জিনিষ বহন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের উত্তরে তিব্বতে চমরী গরু দ্বারা নানা কাজ পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে অনেকটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মত কিন্তু ইহার দুই পাশে বড় বড় রেশমের ন্যায় কোমল চুল ঝুলিতে দেখা যায়। ইহা

এক রকম অদ্ভুত শব্দ করে, অনেকটা শূকরের মত। তিব্বতবাসীগণ ইহা দ্বারা গাড়ী চালায়, লাঙ্গল টানায় এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়। ভ্রমণকারিগণ প্রায়ই ইহার সুন্দর লেজ ঘরে সাজাইয়া রাখিবার জন্য লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে হাতীকে পোষ মানাইয়া তাহা দ্বারা ভারী বস্তু বহন করান হয়। ঘোড়ার পরিবর্ত্তে কামান ও সৈন্যদের ভারী জিনিষ সকল টানিয়া লইয়া যায় এবং জাহাজে ভারী কাঠ বোঝাই করে। শুঁড় দিয়া ভারী কাঠ তুলিয়া লয়। একটী হাতী প্রায় সাড়ে তের মণ জিনিষ পিঠের উপর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

উটও মুটিয়ার কাজ করিয়া থাকে। উটকে "মরুভূমির জাহাজ" বলা যায়। ইহারা কি অদ্ভুত জন্তু। সাধারণতঃ ইহাদের পিঠে দুইটা কুঁজ থাকে কিন্তু আরব দেশের উটদের একটী কুঁজ। কুঁজগুলি কেবল চর্ব্বি ব্যতীত কিছু নয়। খাদ্য অভাবে ইহারা এই চর্ব্বি আহার করিয়াই বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। যখন ইহাদের মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে তখন উটচালক দেখিয়া লয় যে ইহাদের কুঁজটি হৃষ্টপুষ্ট আছে কিনা।

ইহারা ইহাদের পাকস্থলীর ছোট ছোট থলিতে অনেক জল ভরিয়া রাখে এবং ইহা থাকাতে পান না করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে। কোন বোঝা না লইয়া দিনে ৭০।৮০ মাইল দৌড়াইতে পারে। ৪০০ শত মণ ভারী বোঝা লইলে দিনে ২০ মাইল যাইতে পারে। তোমরা ছবিতে দেখিয়াছ যে উট বালির উপর বসিয়া আছে আর তাহার পিঠের উপর বোঝা বাঁধা হইতেছে।

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ।

অতীতের প্রতিধ্বনি

রেশমের চাষ।

বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের যে সব শিল্পকার্য্য লোপ পাইতেছে তাহার মধ্যে রেশমের চাষ একটী প্রধান। ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল হইতে রেশমের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে রেশমের চাষের আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, বিদেশীয় রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ফ্রান্স, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশ অপেক্ষা সুলভে রেশম প্রস্তুত হইতেছে; বাজারে লোকে এখন অল্প মূল্যে বিদেশী রেশম কিনিতে পাইতেছে, তাই দেশীয় রেশমের কাটতি কমিয়া যাইতেছে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, অন্যান্য দেশে যে উপায়ে সুলভে ভাল রেশম প্রস্তুত করা হয়, আমাদের দেশে সেই সকল উপায়ের প্রচলন। আমাদের দেশে রেশমের চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক সুবিধা আছে। বিগত কয়েক শত বৎসর মধ্যে অন্যান্য দেশে রেশমের চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা এখনও সেই প্রাচীন কালের প্রথা সকলই ধরিয়া আছে, তাই তাহারা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না। আমাদের দেশের চাষীরা ত জানে না কোন দেশে কি উপায়ে রেশম প্রস্তুত করে।

যদি কোনও দেশহিতৈষী লোক অন্যান্য দেশে প্রচলিত উৎকৃষ্ট প্রথা আমাদের দেশের চাষীগণকে শিখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের রেশমের চাষ রক্ষা পায়। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ জে, এন, তাতা, যাঁহার জীবনচরিত কিছুদিন পূর্ব্বে মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল, এই কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। তিনি ব্যাঙ্গালোরের নিকটে একটী আদর্শ রেশমের কুঠী খুলিয়াছিলেন। জাপান হইতে এক-জন অভিজ্ঞ রেশম ব্যবসায়ী আনাইয়া তাঁহার হাতে এই আদর্শ কুঠীর ভার দিয়াছিলেন। আমি সেই রেশমের কারখানায় যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা-রই বিবরণ আজ তোমাদিগকে বলিব।

বার বার রেশমের "চাষ" এই কথা ব্যবহার করিতেছি। তাহা হইতে তোমরা হয়ত মনে করিবে, রেশম ক্ষেতে জন্মে। সাধারণতঃ তিনটী পদার্থে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ তূলা, দ্বিতীয়তঃ ছাগল বা ভেড়ার লোম, তৃতীয়তঃ রেশম! ইহাদের মধ্যে রেশমের ব্যবহারই সকলের শেষে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ তূলা বা ভেড়ার লোম যেমন সহজে পাওয়া যায়, রেশম তেমন সহজে পাওয়া যায় না। রেশম প্রস্তুত করিতে অনেক বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন। এইজন্য মানবজাতি সভ্যতার সোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে চীনদেশে রেশমের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেই জন্য সংস্কৃতে রেশমের নাম চীনাংশুক। চীন হইতে ভারতবর্ষে রেশমের চাষ প্রচলিত হয়, এবং ক্রমে তথা হইতে পারস্য, আরব এবং ইউরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

রেশমের চাষ এই কথা ব্যবহার করিতেছি বটে, কিন্তু রেশম জমিতে জন্মে না, ইহা এক প্রকার পোকা হইতে পাওয়া যায়। এই পোকার খাবারের জন্য এক প্রকার পাতা লাগে, তাহা জমিতে হয়; রেশম প্রস্তুত করিতে এই পাতার খুব প্রয়োজন; ইহাকে পাতা বা তুত বলে। তুতের গুণের তারতম্য অনুসারে রেশমের গুণের তারতম্য হয়। রেশমের কাজ করিতে হইলে তুতের চাষের প্রয়োজন। সেইজন্য রেশমের চাষ এই কথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। রেশমের পোকাগুলি ডিম হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে খাবার দিতে হয়। তুতের পাতা-গুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ডালাতে রাখিয়া তাহাতে পোকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। পোকা-গুলির কি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। খাইবার জন্যই ইহাদের জন্ম। আর কোনও কাজ নাই, দিন রাত্রি খাইতেছে। প্রতিদিন নূতন নূতন পাতা দেওয়ার এক সুন্দর কৌশল আছে। একদিন যে ডালিতে খাইল, সে দিনের মধ্যেই তাহা অপরিষ্কার করিয়া ফেলে, শুখনা পাতার অবশিষ্টাংশও কিছু পড়িয়া থাকে, সুতরাং সেই ডালির উপর আর নূতন পাতা ঢালিলে চলে না। রেশমের পোকা-গুলিকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগকে খুব যত্ন করিয়া রাখিতে হয়; পোকার অনেক রকম পীড়া আছে, পাতা যদি খারাপ হয়, তবে পোকা ভাল হয় না; বিশেষ রকমের সার দিয়া তবে পাতার গাছ তৈয়ার করিতে হয়। যাহারা রেশমের কাজ করে, তাহারা পোকার এই সকল রোগ ও তাহার প্রতীকারের উপায় জানে। যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম—এক-খানি ডালায় পাতা ফুরাইয়া গেলে আবার নূতন পাতা দিবার সময় সেই ডালির উপরে একখানি জাল বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর নূতন পাতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নূতন পাতা ছড়াইয়া দিবা-মাত্র সব পোকাগুলি জালের ভিতর দিয়া উপরের নূতন পাতাগুলির উপর আসিয়া পড়ে। পাঁচ

মিনিটের মধ্যে সমুদয় পোকা জালের উপরে আসিয়া থাকে; তখন জালশুদ্ধ সেগুলিকে অন্য একটী ডালিতে রাখা হয়। পোকাগুলির খাবার আগ্রহ দেখিলে হাসি পায়। তাহারা এত খাইতে পারে; খাওয়ার যেন বিরাম নাই। খাইয়া খাইয়া দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠে। যখন ডিম হইতে বাহির হয়, তখন পোকাগুলি সূতার মত সূক্ষ্ম থাকে, কয়েক দিনের মধ্যেই খাইয়া খাইয়া তাহারা বড় হইয়া উঠে। যাহারা রেশমের কাজ করে, তাহারা দেখিয়াই বলিতে পারে, কোন পোকাটী কত দিনের। সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়ত্রিশ দিন ইহারা পোকার অবস্থায় থাকে। এই পঁয়ত্রিশ দিনই ইহাদের খাওয়ার সময়। পঁয়ত্রিশ দিন পরে আর খায় না, তখন তাহারা বিশ্রাম করে। এই সময়ে তাহারা লালা দ্বারা আপনাদের জন্য এক প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করে। মাকড়সা যেমন শরীর হইতে নিঃসৃত রস দিয়া জাল নির্ম্মাণ করে, রেশমের পোকাও তেমনি শরীরের রস দিয়া আপনাদের বাসা করে। তবে তাহাদের বাসা তাহারা আপনাদের শরীরের চারিদিকেই করে। লালা দিয়া আপনাদের শরীরের চারিদিক ঘিরিতে থাকে, ক্রমে পোকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তার পরিবর্ত্তে ছোট একটী ঠোঙ্গা দেখা যায়। তোমরা হয়ত অনেক সময় গাছে এই প্রকার ঠোঙ্গা দেখিয়াছ। পোকাগুলি সাধারণতঃ এই ঠোঙ্গার মধ্যে দশ বা বারো দিন থাকে। তৎপরে ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হয়। কিন্তু যখন বাহির হয়, তখন সে আর পোকা থাকে না, সুন্দর প্রজাপতির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসে। লম্বা পোকাটী কি করিয়া প্রজাপতি হইয়া গেল, তাহা জানি না; সবুজ রঙ্গের পোকা শুভ্র প্রজাপতির রূপ ধারণ করে, তাহার দুইখানি পাখা, পা, মাথায় শিখা। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কোনটী পুরুষ প্রজাপতি, কোনটী স্ত্রী প্রজাপতি। রেশম ব্যবসায়ীরা দেখিলেই বলিতে পারে, কোন্‌টী পুরুষ, কোন্‌টী স্ত্রী। অভিজ্ঞ কৃষকেরা পোকা অবস্থাতেও কোন্‌টী পুরুষ কোন্‌টী স্ত্রী বলিতে পারে। প্রজাপতি অবস্থায় কিন্তু তাহাদের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের মৃত্যু হয়। স্ত্রী প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়, পুরুষগুলি তাহারও পূর্ব্বে মরে।

রেশম লইতে হইলে প্রজাপতিকে ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হইবার অবসর দেওয়া হয় না। ঠোঙ্গা কাটিলে রেশমের সূতা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। সমস্ত ঠোঙ্গাটা এক গাছি সূতাতে নির্ম্মিত। যদি তাহার কোথাও একটু ছিদ্র হয়, তবে সূতা গাছি কাটিয়া যায়। সেই জন্য ঠোঙ্গা কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইবার দুই একদিন পূর্ব্বে ঠোঙ্গাগুলিকে গরম জলে বা বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তার পরে ঠোঙ্গাগুলিকে গরম জলে ভিজাইয়া সূতার মুখ ধরিয়া টানিলে সূতা উঠিয়া আসে; এক রকম কল আছে, তাহাতে চরকা থাকে, চরকাতে সূতার অগ্রভাগ বাঁধিয়া দেওয়া হয়, চরকা যেমন ঘুরিতে থাকে, গুটী হইতে সূতা বাহির হইয়া চরকায় জড়াইয়া যায়। এক একটী গুটী হইতে সাধারণতঃ এক হাজার হাত রেশম বাহির হয়। এখন বুঝিতে পারিতেছ, যে রেশম ঐ গুটী পোকাগুলির শরীরের রস ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাকড়সার শরীরের রস হইতে যেমন তাহাদের জালের সূতা হয়, তেমনি গুটি পোকার শরীরের রস হইতে রেশম হয়; কিন্তু মাকড়সার সূতা সহজে ছিঁড়িয়া যায়, গুটিপোকার সূতা সূক্ষ্ম অথচ খুব শক্ত, এবং দেখিতে উজ্জ্বল ও মসৃণ। সেই জন্যই উহার এত আদর এবং মূল্য।

সব ঠোঙ্গাগুলি সিদ্ধ করিয়া রেশম লইলে

পোকার বংশ লোপ পাইয়া যাইত। এই জন্য সব ঠোঙ্গা সিদ্ধ করা হয় না। প্রয়োজনমত কতকগুলি ঠোঙ্গা রাখিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি কাটিয়া পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাপতি বাহির হয়। বাহির হইবার আট দশ ঘণ্টা পরেই স্ত্রী প্রজাপতি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এক একটী প্রজাপতি প্রায় দুই শত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, তোমরা পিঁপড়ের ডিম দেখিয়া থাকিবে। রেশমের পোকার ডিম তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি মরিয়া যায়, আর কিছু করিতে হয় না। দশ বার দিন পরে আপনা হইতেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

গৃহপালিত প্রজাপতিগুলি উড়িতে পারে না। বোধ হয়, অনেক খাইয়া তাহাদের শরীর এত মোটা হয়, যে তাহাদের ছোট পাখা সে দেহের ভার বহন করিতে পারে না; স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে হয়ত তাহারা উড়িতে পারিত! তখন হয়ত তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। পোষা প্রজাপতিগুলি কিন্তু আট দশ ঘণ্টা বই বাঁচে না। বিলাসী লোকের সাজ সজ্জার উপকরণ দিবার জন্যই কি তাহাদের জন্ম না তাহাদের জীবনে আর কোনও কাজ আছে ?

সোণার খনির সন্ধানে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ রাণ্ডার লোকের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া; নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, এজন্য দানাপুরের সাহেব ডাক্তার স্বয়ং তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। পাটনার স্কুলের ছেলেরা সুরেশের সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা দানাপুরে আসিয়া সুরেশের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার গায়ের ঘা শুকাইল না, সে রক্তহীন ও শীর্ণ হইয়া পড়িল। অবশেষে ডাক্তার কহিলেন "বল্‌তে কষ্ট হয়, আর তোমার ভাল হবার কোন আশা নেই। তোমার আত্মীয়স্বজন কেহ থাকে ত বল, তাঁদের কাছে টেলিগ্রাম করা যা'ক। তাঁরা খুব শীঘ্র এলে তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন।"

সুরেশ কহিল, "আমার আত্মীয়-স্বজন ? কই ? এই বৃহৎ জগতে আত্মীয়-স্বজন ত কেউ নেই। তবে, আমার মতন অভাগাকেও একটি পবিত্রহৃদয়া বালিকা ভাই ব'লে মনে করেছিল বটে; সেই করুণাময়ী বালিকার পিতার কাছেই একবার টেলিগ্রাম করা যা'ক। মৃত্যুকালে সেই বালিকার অনুপম মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

দার্জ্জিলিঙ্গে সরলার পিতা নগেন্দ্রনাথের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। নগেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। হায়, তবে কি মৃত্যুর পথেই ভায়ের সঙ্গে বোনের পরিচয় হইবে ? নগেন্দ্রনাথ সরলার কাছে কোন কথাই খুলিয়া বলিলেন না। তিনি কহিলেন, "সরলা খবর পেয়েছি, সুরেশ দানাপুরে আছে। আজকের

গাড়ীতেই তোমাকে নিয়ে দানাপুর যাত্রা করব।”

স্বাভাবিক রক্তের সম্পর্কের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ! যে কমলাদেবী সরলাকে এত দিন মায়ের মতন মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, আজ সরলাকে চোখের আড়াল করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সরলা যে দানাপুরে গিয়া ভাইকে দেখিতে পাইবে, সেই কল্পনায় তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। তার পরে সরলা যখন দানাপুরে যাত্রা করিল, তখন কমলাদেবী চোখের জলে ভাসিয়া কহিলেন, “লক্ষ্মী মা আমার, আমার কথা ভুলো না, আমায় ছেড়ে অনেক দিন থেক না, ভাইকে নিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এস।”

সরলা কহিল “তোমায় কি আমি ভুলতে পারি? আজ যদি আমার নিজের মা এসে উপস্থিত হন, আর আমায় নিয়ে যেতে চান, তা হলেও আমি বল্‌ব, আপনি আমার নিজের মা সত্য, কিন্তু আমি ত আপনার কাছে থাকি নি, যে মা আমাকে ছেলে-বেলা হতে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?”

নগেন্দ্রনাথ রেলগাড়ীতে উঠিলেন। রাত্রে তাঁহারও চোখে ঘুম নাই, সরলারও চোখে ঘুম নাই। নগেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, সরলা দানাপুরে গিয়ে যদি ভাইকে দেখতে না পায়, অথবা ভায়ের যদি মৃত্যু হয়, তা হলে হয় ত কেঁদে কেঁদেই সারা হবে। সরলা শুধুই মনে মনে নানা রকম সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, আমি দানাপুরে গিয়ে যখন দাদাকে প্রণাম করব, তখন ত তিনি অবাক হয়েযাবেন। তার পরে আমি হেসে বল্‌ব, বলুন ত আমি কে? তখন দাদা বল্‌বেন—‘তুমি সরলা।’ আমি বল্‌ব, কই আমাকে চিনতে পারলেন? আমি ত সরলা নই, আমি যে আপনার বোন সুহাসিনী। দেখুন ত কি আশ্চর্য্য! আমি যমের পুরী হতে ফিরে এসেছি। দাদা আমার কথা শুনে হয় ত মনে করবেন, তিনি জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। আমি তাঁর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরে বল্‌ব, বাঃ, আপনি বুঝি মনে করছেন, জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন? স্বপ্ন কেন? এ যে সবই সত্য।

তার পরে দাদার কাছে যখন সকল কথা খুলে বল্‌ব, তখন স্নেহে ও পুলকে তাঁর সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে, আমার পানে চেয়ে তাঁর সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরের কাছে লুটায়ে পড়্‌বে; তিনি সুখের আবেশে শুধুই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করবেন। কিছুক্ষণ ত এই ভাবে কেটে যাবে, অবশেষে দাদা বল্‌বেন, “সুহাসিনী, আমার স্নেহের বোন, এস, আমার আরো কাছে এস; আজ আমি আর কি করব? শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে স্বর্গের বালিকা করুন, তিনি তোমাকে সুখে রাখুন।”

সরলা এই রকম কত কি কল্পনা করিয়া দানাপুরে পৌঁছিল এবং সুরেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সরলাকে দেখিয়া সুরেশের মৃত্যুশয্যা যেন সুখের কুসুমশয্যায় পরিণত হইল। সুরেশ দুখানি হাত যোড় করিয়া কহিল, “করুণাময় ঈশ্বর, তোমারই করুণায় মৃত্যুকালে সরলাকে দেখ্‌তে পেলেম। আমার মন যে আজ সুখে ভেসে যাচ্ছে।”

কিন্তু হায়, সরলার মনের সকল কল্পনা মিথ্যা হইয়া গেল, সে সুরেশকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সরলা চোখের জলে ভাসিয়া কহিল, “দাদা, প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে তোমাকে বল্‌তে এসেছিলুম, আমিই তোমার স্নেহের বোন সুহাসিনী। বড় আশা করেছিলুম বহুদিনের পরে,

অতি আশ্চর্য্যভাবে ভায়ের সঙ্গে বোনের মিলন হবে। হায় এ যে চির জীবনের মতন বিচ্ছেদ! বল দাদা, তুমি কি যথার্থই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? আমি ত আমার প্রতিপালক পিতামাতার যত্নে দুঃখ কাকে বলে জানিনে, আজ কি আমাকেই চির দুঃখে ভেসে যেতে হবে?"

নগেন্দ্রনাথ সুরেশকে সকল রহস্যকথা বুঝাইয়া বলিলেন। সুরেশ কহিল—"সরলা, তুমি আমারই বোন সুহাসিনী? তবে এস ত, ভাল করে তোমার মুখখানি একবার দেখি। যে দিন প্রথমে তোমাকে দার্জ্জিলিঙ্গে দেখেছিলুম, সেই দিনই আমার মনের ভিতর হতে কে যেন বল্‌ছিল—এ যে তোমারই বোন—এ যে তোমারই বোন। আজ বিশ্বাস হচ্ছে, মনের ভিতরের সেই ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরই বলেছিলেন, তুমি আমার বোন, আবার ঈশ্বরই করুণা করে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। সরলা, তুমি যদি আমার আর দুটি বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে পার্‌তে, তবে তাদের দেখে আমার মনে আরো কত আনন্দ হত।"

সুরেশ কথা বলিতে বলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সে কহিল—"সরলা, তুমি শুন্‌লে অবাক হবে, আমি মরব এই কথা ভেবে বড়ই খুসী হচ্ছিলুম। কেন খুসী হচ্ছিলুম তা জান? আমি ভেবেছিলুম, মরণের পরে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আমার বাবাকে ও মাকে দেখতে পাব; আমার দুটি বোনের সঙ্গেও আবার একটি মধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু এখন যে আমার বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। করুণাময় ঈশ্বর, তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পার না? আমি অনেক দিন ধরে, সুখ কাকে বলে তা ত জানিনে; আজ মনে হচ্ছে আমার তিনটি বোনের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের ভালবাসা পেয়ে, তাদের স্নেহ দিয়ে এবং তাদের জন্য কিছু করে এ জীবনকে সার্থক কর্‌তে পারব।"

সুরেশ প্রায় পনর মিনিট নীরবে সরলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে বলিল—"সরলা, আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যাচ্ছে। একটু পরে তোমার মুখখানি আর দেখতে পাব না। আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে, আর কথা বল্‌তেও পার্‌ব না। আমার প্রাণ যখন বের হয়ে চলে যাবে, তখন তোমার মধুর কণ্ঠে ঈশ্বরের নামের একটি গান করো। গানটি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি বিশ্বজননীর কাছে চলে যাব।"

সরলার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহার ধৈর্য্যশক্তি আশ্চর্য্য। সে তাহার কান্না বুকের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়া, শুধুই চোখের জলে ভাসিয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিল—"দয়াময় ঈশ্বর, তুমি দয়া করে আমার দাদাকে বাঁচাও।"

নগেন্দ্রনাথের মহৎ হৃদয়। তাই তিনি বিস্তর টাকা খরচ করিয়া কলিকাতা হইতে খুব বড় ডাক্তার আনাইলেন। সরলা দিনরাত মুখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আর হাতে সুরেশের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার এই প্রার্থনা ও শুশ্রূষার জন্যই যেন সুরেশের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইল। এক মাসের মধ্যে সুরেশ আরোগ্যলাভ করিল।

নগেন্দ্রনাথ সুরেশ ও সরলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করিলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করায় সুরেশের শরীর সুস্থ ও সবল হইল। নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—"সরলাকে কন্যারূপে পেয়ে আমরা বড়ই খুসী হয়েছিলুম। কিন্তু তবুও মনে হত, আমাদের একটি ছেলে থাক্‌লে আর কোনই অভাব থাক্‌ত না। কিন্তু ঈশ্বর দয়া করে আজ সুরেশকেই

আমাদের পুত্ররূপে কাছে নিয়ে এলেন। আমার সমস্ত টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তি তোমাদেরই লিখে দিয়ে যাব। তোমরা লেখাপড়া শিখে চির-দিন সুখেই থাকতে পারবে।”

সুরেশ ও সরলা দুজনেরই নির্ম্মলা ও সরযূকে কাছে পাইবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সুরেশ বিডন ষ্ট্রীটের সেই রাক্ষুসী গিন্নির হাত হইতে দুইটি বোনকে উদ্ধার করিবার জন্য কলি-কাতায় গেল। কিন্তু কোথায় নির্ম্মলা ও সরযূ? তাহারা ত আর কলিকাতায় নাই, গিন্নি তাহাদের লইয়া স্বামীর কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থান আসামের শেষ সীমায় একটি চা বাগানে। সুরেশ সেই চা বাগানে যাইবার জন্য আসামে যাত্রা করিল। আসামের রেলের দুই পাশে ছোট বড় পাহাড়, ঝরণা এবং ভীষণাকৃতি এক একটি বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে লেডুতে উপস্থিত হইল। বিডন ষ্ট্রীটের গিন্নির স্বামী বলাইবাবু সেখানকার একটি চা বাগানের বড় এক-জন কর্ম্মচারী। তিনি বাগানের কুলীদের উপরে কি রকম ব্যবহার করেন, তা আমরা জানি না, জানিবার কোন দরকারও নাই। কিন্তু সুরেশ বলাইবাবুর বাসার কাছে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর অর্থাৎ বিডন ষ্ট্রীটের সেই গিন্নিঠাকুরাণীটির নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল। সুরেশ দেখিল, মলিন কাপড়-পরা সুন্দরী একটি বালিকাকে, গিন্নি এক-খানা কাঠের চেলা দিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে মারিতে-ছেন, আর বলিতেছেন—“আমায় না বলে তারিণী-বাবুর বাসায় গিয়েছিস্, এখন তার মজাটা দেখ দেখি। মেরে যে আজ তোর হাড় ভেঙ্গে দেব, তারিণীবাবুর স্ত্রী এসে ঠেকায়ে রাখুক দেখি।”

তারিণীবাবু চা বাগানের একটি ছোট কেরাণী। তাঁর স্ত্রী দুঃখিনী সরযূকে বড় ভালবাসেন, ডেকে খাবার দেন, আদর যত্ন করেন। বিডন ষ্ট্রীটের গিন্নির তা সহ্য হয় না। আজ সরযূ তারিণীবাবুর বাসায় গিয়াছে এবং তাঁর স্ত্রী সরযূকে পিঠে খাওয়াইয়াছেন,—ইহাই সরযূর মস্ত বড় অপরাধ, আর এই অপরাধের জন্যই এই নিষ্ঠুরভাবে প্রহার। সরযূকে মারিতে দেখিয়া নির্ম্মলা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—“গিন্নি মা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আর অমন করে ওকে মারবেন না, ও যে মরে যাবে।”

গিন্নি কহিলেন, “মরুক না, এখনি মরুক, ওকে যম ভুলে আছে কেন? রাজ্যে এত মানুষের মরণ হয়, আর এই মেয়েটা মরে না কেন?”

নির্ম্মলা কহিল, “ওর ত কোন দোষ নেই, আমারই দোষ; আমি ত সরযূকে তারিণীবাবুদের বাড়ী পাঠিয়েছিলুম। ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই ঐ কাঠের চেলা দিয়ে মারুন না।”

সরযূ কহিল, “না গিন্নি মা, আমাকেই মারুন, দিদিকে মারবেন না।”

সুরেশ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই দুটি মেয়ে তাহারই দুঃখিনী দুটি বোন। সুরেশ ভাবিতে লাগিল, “হায়, হায়, কিছুতেই কি দুঃখ বিপদ আমাদের ত্যাগ করে যাবে না; আমরা কি চির-অপরাধী হয়েই জন্মেছি? কেবল দুঃখ সয়ে, কেবল চোখের জল ফেলেই আমাদের এই সংসারে বাস করতে হবে?”

সুরেশ বলাইবাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে বাবুটির সঙ্গে সুরেশের দেখা হইল। সুরেশ তাঁহার নিকট আপনার জীবনের কাহিনী ভাঙ্গিয়া বলিল এবং কহিল—“আমি দার্জ্জিলিং হতে অনেক কষ্ট করে এই সুদূর আসামের চা বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আপনি দয়া করে আমার দুটি বোনকে আমার হস্তে

অর্পণ করলে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ অন্তরে আপনার উপকারের কথা স্মরণ করব।"

বলাইবাবু কহিলেন—"বাপু হে, তুমি জাল-জুয়াচুরি করবার আর যায়গা খুঁজে পেলে না? এসেছ আমার কাছে? আমি এই চা বাগানে কুড়ি বৎসর হাজার কুলির চালক হয়ে মাথার চুল পাকাতে বসেছি। তুমি কি মনে করেছ, আমার চোখে ধূলা দিয়ে এই দুটি সুন্দরী মেয়েকে হাত করতে পারবে? তা ত কিছুতেই পারবে না।"

সুরেশ কহিল, "আপনি যখন অনেক দিন এই আসামেই চাকুরী করছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পিতার মহৎ গুণের কথা শুনে থাকবেন। আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান হলেও জাল জুয়াচুরির কোন ধার ধারিনে। আপনি নির্ম্মলার কাছেও তার সব কথা শুনুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি তারই আপনার ভাই। আমিও অনেক কষ্ট পেয়েছি, আমার দুটি বোনও অনেক দুঃখ সহ্য করেছে। আপনি নির্দ্দয় হয়ে আর আমাদের দুঃখ দেবেন না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

ইংলণ্ডের নূতন পার্লিয়ামেণ্ট

জ্যৈষ্ঠ মাসের সকলের চেয়ে বড় ঘটনা ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের নূতন নির্ব্বাচন। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের হাতে অনেক শক্তি। সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালনা তাঁহাদের হাতে। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর সকল দেশের রাজকার্য্যের সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যোগ। এ সমুদয় ভার পার্লিয়ামেণ্টের হাতে। অনধিক পাঁচ বৎসর অন্তর ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়। দেশের সমুদয় বয়স্ক পুরুষ ও নারী মিলিয়া এখন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে হাত ছিল না। ইংলণ্ডের মহিলারা রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বহু চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত সে দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। পরে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইংলণ্ডের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের শক্তি অধিক বলিতে পারা যায়, কারণ পুরুষ নির্ব্বাচন কারী (Voter) অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অধিক। নূতন পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচনে অনেক মহিলা ভোট(Vote)দিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভোটেই পার্লিয়ামেণ্টে মহাপরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরাতন পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই রক্ষণশীল ছিলেন। ইংলণ্ডে প্রধানতঃ তিনটী রাজনৈতিক দল আছে। তাহাদের নাম রক্ষণ-শীল (conservative), উদারনৈতিক (Laboural) ও শ্রমজীবী (Labour)। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রমজীবীদলের অস্তিত্বই ছিল না। তখন ইংলণ্ডের গরীব প্রজাদের স্ত্রীলোকদের মত রাজনৈতিক অধিকার সামান্যই ছিল; কিন্তু গত পঁচিশ বৎসরে তাহারা রাজকার্য্যে অনেক ক্ষমতা পাইয়াছেন। শ্রমজীবীদল অধিকাংশ গরীব প্রজাদের দ্বারা গঠিত। পূর্ব্বে গরীব লোকদিগকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইত না; কিন্তু এখন সে অধিকার দেওয়াতে

ইংলণ্ডের জন সাধারণ রাজকার্য্যে অনেক শক্তি লাভ করিয়াছে। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে শ্রমজীবী দল খুব শক্তি শালী হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টে কোন শ্রমজীবী সভ্য ছিলেন না। কিন্তু এখন অনেক শ্রমজীবী পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য হইতেছেন। নূতন পার্লিয়ামেণ্টে তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ৬১৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৮৮ শ্রমজীবী ২৫৮ রক্ষণ শীল ৫৯ উদারনৈতিক। এবং বিবিধ ১০ ইহাদের মধ্যে ১৩ জন সভ্য স্ত্রীলোক। পুরুষদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা নিতান্ত কম; অন্ততঃ স্ত্রীলোক ও পুরুষদের সংখ্যা সমান হইলেও স্ত্রীলোকেরা ন্যায্য অধিকার পাইয়াছেন বলা যাইতে পারে। তবে তাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্যে প্রথম অগ্রসর হইয়াছেন; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন মহিলাও পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন না। এই বারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক সভ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় ক্রমে পার্লিয়ামেণ্টে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার

চিত্রা

(নাটক)

চরিত্র

রাজা
রাণী
রাণীর সখী
অজয় সিংহ (রাজ-পুত্র)
মোহনলাল (ঐ বন্ধু)
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী
চিত্রা (আর এক দেশের রাজকন্যা)
সুনন্দা (চিত্রার সখী)
জলের রাণী
ফুলের রাণী
প্রতিহারী
প্রহরী

প্রথম দৃশ্য
রাজার বাগান
সন্ধ্যাবেলা

অজয় সিংহ। মোহনলাল এখনও এল না কেন। একলা একলা ভাল লাগছে না। এখানে বসি। (মোহনলাল পিছন থেকে এসে অজয় সিংহের চোখ টিপে ধরল) নিশ্চয় মোহনলাল। (মোহনলাল চোখ ছেড়ে দিল) এত দেরি হল কেন ভাই ?

মোহনলাল। বাবার সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেজন্য রাগ করেছ অজয় সিংহ ?

অ। না ভাই, এখন আর রাগ নাই।

মো। এতক্ষণ একা কি করছিলে ?

অ। আকাশের তারা দেখ্‌ছিলাম।

মো। তুমি রোজ সন্ধ্যাবেলা কেবল তারাই দেখ।

অ। সত্যি ভাই, আমার তারা দেখতে বড় ভাল লাগে। ঐ সব চেয়ে বড় তারাটা কি সুন্দর! নিশ্চয়ই ওখানে তারার মত সব সুন্দর মানুষ আছে। আমার ওখানে যেতে এত ইচ্ছা করে।

মো। দূর, তারায় কি মানুষ থাকে ? আর অত উঁচুতে বুঝি যাওয়া যায়।

(রাণীর সখীর প্রবেশ)

রা—স। রাজকুমার, রাত হয়ে এল, রাণীমা ঘরে যেতে বলছেন।

মো। আমি তবে যাই ভাই।

অ—আচ্ছা কাল খুব ভোরে এস কিন্তু। আমরা পাহাড়ে সূর্য্যোদয় দেখতে যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সকাল বেলা

অজয়ের ঘর

(অজয় নিদ্রিত। রাণীর সখীর প্রবেশ।)

রা—স। রাজকুমার কত বেলা হয়ে গেল, উঠুন। মোহনলাল আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

অ। তাকে এখানে ডেকে দাও।

(রাণীর সখীর প্রস্থান)

তাই ত বড় বেলা হয়ে গেছে।

(মোহনলালের প্রবেশ)

মো। এই বুঝি তোমার সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে যাওয়া ? আমি কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

অ। কি করব ভাই, বড় বেলা হয়ে গেল। আমি কি চমৎকার স্বপ্ন দেখছিলাম !

মো। কি স্বপ্ন, বলনা ভাই।

অ। দেখলাম, আমি যেন বাগানে বেড়াচ্ছি। এমন সময় সেই সব চেয়ে বড় আর উজ্জ্বল তারা থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি খুব সুন্দর মেয়ে আমাকে ডেকে বল্‌ল—অজয় আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমার এখানে বড় কষ্ট হয়। বলে সে কাঁদতে লাগ্‌ল। আর তার কালো কালো বড় বড় চোখ থেকে মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা জল ফুলের উপর শিশির হয়ে পড়তে লাগল। দেখে আমার এত কষ্ট হল, কিন্তু তখনি ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মো। ভাই, তোমার স্বপ্নের হয় ত কোন মানে থাক্‌তে পারে। আমরা যে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম, সেখানে একজন সন্ন্যাসী থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সব বলে দিতে পারেন। যাবে ?

অ। চল। আমার মনে হয় স্বপ্নটা সত্যি। এই দেখ না তার চোখের জল ফুলপাতার উপর টল্ টল করছে।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

সকাল বেলা

(বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বনে ধ্যান করছেন। অজয় ও মোহন তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াল।)

স। বস বাছারা। তোমাদের মঙ্গল হোক।

মো। ঠাকুর, আমাদের রাজপুত্র স্বপ্ন দেখেছেন যে তারার দেশ থেকে একটি মেয়ে তাঁকে ডাক্‌ছে। এই স্বপ্নের মানে কি তাই জান্‌তে এসেছি।

অ। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের সব বলে দিন।

স। বল্‌ছি শোন। তারা থেকে একজন দৈত্য এসে রাজকুমারী চিত্রাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে।

অ। তাকে আমি কেমন করে উদ্ধার করব ?

স। উত্তর দিকের পুকুরে যে বড় রাজহাঁস আছে, সেটা আমি তোমায় দেব। তুমি যেখানে যেতে চাও সে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। প্রথমে তুমি ফুলের রাণীর কাছ থেকে সব চেয়ে সুগন্ধি ফুল নিও, তারপর জলের রাণীর কাছ থেকে

সব চেয়ে বড় মুক্তোর মালা নিয়ে তারার দেশে যাবে। ঢুকবার সময় প্রহরীর কাছে ফুলটা ধরা মাত্র সে তার গন্ধে অজ্ঞান হয়ে পড়লে চিত্রার সোনার বাড়ীর দিকে সোজা চলে যাবে। সে-খানে প্রতিহারীকে মুক্তোর মালা ছড়া দিলেই সে ভিতরে যেতে দেবে। তারপর হাঁসের পিঠে চিত্রা ও তার সখীকে নিয়ে চলে এসো।

অ। আপনি আমার অনেক উপকার করলেন।

স। কাজ হয়ে গেলে হাঁসটীকে ছেড়ে দিও। সে নিজের জায়গায় চলে আসবে। এখন আমার সঙ্গে হাঁস আনতে চল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীতি দেবী

মণ্টিক্রীষ্টো

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

এডমণ্ডের ইতিহাস।

নবাগত লোকটী মেঝে থেকে ধীরে ধীরে উঠিয়া গা ঝাড়া দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। সে খুব বুড়ো হইয়াছে, মাথার চুল সব শাদা, মুখের চামড়া জড়ো হইয়া গিয়াছে। দুজনে কিছুক্ষণ চোখা চোখী হইয়া তাকাইয়া থাকিল, তারপরে বৃদ্ধ বলিল, "তুমি কে? তোমার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিল—"আমার নাম এডমণ্ড ড্যাণ্টি, মার্সেলিসের একজন নাবিক।"

—"তুমি এখানে বন্দী হয়েছ কেন?"

—"তা আমি জানি না।"

"তুমি এখানে কেন বন্দী হয়েছ তা জাননা? এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! আমার সব ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা করছে, এস আমরা তোমার বিছানার উপরে বসি আর তুমি তোমার ইতিহাসটা বল। আমার ইতিহাস পরে শুনবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ বিছানার উপরে বসিল। এডমণ্ড ও বিছানায় বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি আপনাকে এই মাত্র বলেছি আমার নাম এডমণ্ড ড্যাণ্টি। আমার জন্ম মার্সেলিস সহরে। সেখানে আমি বাবার সঙ্গে অনেকদিন সুখে বাস করেছি,—আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা মারা যান। আমি ছেলে বেলায় সমুদ্রকে খুব ভাল বাসতাম.—তাই বড় হয়ে ঠিক করলাম আমি নাবিক হব। প্রথমে কিন্তু বাবা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। শেষে আমার খুব ইচ্ছা দেখে মত দিলেন ও মিঃ মরেল নামে মার্সেলিসের এক জন বড় সদাগরের জাহাজে আমার চাকরী করে দিলেন। আমি তাঁর 'ফ্যারাওন' জাহাজে অনেক বার সমুদ্র ঘুরে আসলাম—ও অল্প দিনের মধ্যেই স্রোত, বাতাস প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আমার খুব জ্ঞান হোল। মিঃ মরেল আমাকে খুব ভাল বাসতেন, আমি তাঁকে একজন খাঁটী বন্ধু মনে করতাম।

যা হোক—আমার শেষ সমুদ্র যাত্রায় ক্যাপ্টেনের খুব জ্বর হল, তিনি কয়দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। আমার সঙ্গীদের ইচ্ছায় আমি তার বদলে জাহাজের কাজ চালাবার ভার নিলাম

মরবার সময়ে ক্যাপ্টেন আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন—আমি যেন এলবা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়নকে সেই চিঠিটা দিই। সিসিলি থেকে মার্সেলিস যেতে এলবা দ্বীপ হয়ে গেলে মোটে একদিন দেরী হয়, আমি তাই তাঁর কথায় রাজী হলাম। তাঁর মৃত্যুর পরে এলবা দ্বীপে গিয়ে নেপোলিয়নকে সেই চিঠি দিয়ে তার উত্তরে প্যারিসের এক ভদ্রলোকের নামে আর একখানি চিঠি নিয়ে আমি ফিরে এলাম।

মার্সিলিস পৌঁছিয়া আমি মিঃ মরেলকে সব বললাম। তিনি নেপোলিয়নের খুব ভক্ত ছিলেন। আমার কাজের খুব তারিফ করে তিনি আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। কারণ যাদের বন্দী সম্রাটকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করার দোষে সন্দেহ করা হতো—তাদের আইনে খুব শাস্তি দেবার নিয়ম ছিল। মিঃ মরেল আরও আমাকে জানালেন যে আমিই নতুন ক্যাপ্টেন হব। এই খবরে আমি খুসী হলাম—কারণ এই কাজটা হলে আমি মার্সিডিস নামে একটী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে পারতাম, তার সঙ্গে আমার বিয়ের সবই ঠিক ছিল। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গেও দেখা করলাম ও বিয়ের দিন ঠিক করলাম। কিন্তু হায়। আমাদের কপালে যে কি দুঃখ ছিল তা আমরা জানতাম না! আমাদের বিয়ের দিন সকালে—যখন সব নিমন্ত্রিতেরা এসেছেন এমন সময় একদল সৈন্য এসে আমাকে বন্দী করল। আমাকে বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে উপস্থিত করা হোল। আমাকে বন্দীকরার কোন কারণই পাওয়া গেল না। বিচারপতি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে বল্লেন যে আমাকে শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে সেই সময়ের জন্য আমাকে জেলে বন্দী করে রাখবেন। তার কিছুদিন পরেই আমি এখানে এসেছি—ও তখন থেকে আমি এখানেই আছি।"

বৃদ্ধ তার কথা খুব মন দিয়া শুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছিলেন। এখন চোখ তুলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার কি কোন শত্রু ছিল না যে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তোমার এখানে চলে আসাতে কারও বোধ হয় কিছু সুবিধা হয় নি?"

এডমণ্ড কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"জাহাজে মিঃ মরেলের এজেণ্ট ড্যাংলার ছাড়া আর কেউ নয়। সে আমাকে দেখতে পারত না—আর আমার মনে হয় আমার বদলে তারই জাহাজের ক্যাপ্টেন হবার কথা ছিল।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দোষে তোমাকে বন্দী করা হয়েছে?"

'ম্যাজিষ্ট্রেট একখানি বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন যে আমি নেপোলিয়নের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছি। আমি চিঠিখানা দেখেছিলাম—কিন্তু হাতের লেখা চিনতে পারি নি।"

—"তোমার এলবা যাবার কথা ড্যাংলার বোধ হয় জানত?"

—"হাঁ, নিশ্চয়ই; তাহা গোপন রাখার কোন উপায় ছিল না।" তখন বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বললেন, "ওহে যুবক বন্ধু—আমি সব বুঝতে পেরেছি। ড্যাংলারই তোমার শত্রু। সেই তোমার এই দুঃখের কারণ। কিন্তু এই ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবহারও আমাকে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে—তিনি কি তোমার এলবা যাবার কথা জানতেন?"

"হাঁ নিশ্চয়ই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—আমি তাঁকে সব উত্তর দিলাম ও প্যারিসের ভদ্রলোকটীর নামের চিঠি তাঁকে দেখালাম। তিনি চিঠিটা দেখে একটু ব্যস্ত হলেন—তার পরে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলে আমাকে বল্লেন আমার বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ থাকল না। তিনি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে যাঁর নামে চিঠি তাঁর নাম যেন আমি কাউকে না বলি।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"ঠিক হয়েছে—তোমার সেই নামটী মনে আছে?"

"মিঃ নয়েটার নামে এক ভদ্রলোকের নামে চিঠি ছিল।"

—"আচ্ছা ম্যাজিষ্ট্রেটের কি নাম ছিল?"

"তাঁর নাম ডিভিলফোর্ট—একজন যুবাপুরুষ এবং—", এডমণ্ড আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি

বুঝেছি—বুঝেছি—নয়েটার ডিভিলফোর্ট একজন প্রসিদ্ধ প্রজাতন্ত্রী। এক সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি তাঁর নামের শেষ দিকটা বিদ্রোহের সময় উঠিয়ে দেন; কিন্তু তাঁর ছেলে তখন ছেলেমানুষ ছিল—সে নিজকে ডিভিলফোর্ট নামেই পরিচয় দিত। তুমি এখন ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারছ? যদি লোকে জানতে পারত যে ডিভিলফোর্টের বাবা নেপোলিয়ান চিঠি লেখেন তবে তাঁর চাকরী যেত। যাহাতে লোকে তাহা জানতে না পারে সেজন্য তিনি চিঠিখানি পুড়িয়ে ফেলেন, আর তোমাকে বন্দী করিয়াছেন। এডমণ্ড চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঠিক—আমি এতদিন বুঝিনি—আজ সব বুঝতে পেরেছি। আমি যদি কখন মুক্তি পাই তবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেব। যাক্—এখন আপনার কাহিনীটা বলুন শুনি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

অঙ্ক-কৌতুক

বৈশাখ মাসের অঙ্ক-কৌতুকের সমাধান।

বৈশাখ মাসের মুকুলের ২৩ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছিল যে ৬৪ ঘরের একটি স্কোয়ারকে কাটিয়া নূতন করিয়া সাজাইলে দেখায় যেন ৬৫ ঘর হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক তো তাহা হইতে পারে না। কিন্তু সাজাইবার কৌশলে ঐরূপ দেখায়। এই কৌশলটুকু বজায় রাখিবার জন্যই বলা হইয়াছিল যে সিকি ইঞ্চির ঘর আঁকিবে। একটু বড় করিয়া ঘর আঁকিলেই ধরা পড়িয়া যায় যে নূতন ভাবে সাজাইলে মাঝে একটু ফাঁক থাকে। সে ফাঁকটি একটি অতি সরু অথচ অতি দীর্ঘ ফালির মত। তাহা এত সরু যে সাধারণতঃ চোখেই পড়ে না। কাটিবার ও সাজাইবার যে নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যেই এই কৌশল লুকানো আছে যে মাঝের ফাঁকটি প্রায় চোখের অগোচর একটি সরু ফালির মতন হইবে। আর একটু বড় করিয়া ২নং (নূতন ভাবে চিত্র সাজাইবার) চিত্রটি আঁকিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে [illegible] তোমরা পষ্ট দেখিতে পাইবে।

যাহারা জিওমেট্রি পড়িয়াছ তাহারা হয়তো বুঝিতে পারিবে যে কখগ ত্রিভুজটির কখ ও খগ বাহু দুটির অনুপাত $\frac{3}{8}$; কিন্তু গচছ ত্রিভুজটির গচ ও চছ বাহু দুটির অনুপাত $\frac{2}{5}$। $\frac{3}{8}$ ও $\frac{2}{5}$ সমান নয়। উভয়ের মধ্যে $\frac{3}{8}$ একটু বড় কিন্তু তফাৎ সামান্য। এই জন্য ঘজছ ত্রিভুজের ঘজ বাহুটি ঠিক ২ ঘর দীর্ঘ নয়; ২ অপেক্ষা $\frac{1}{5}$ কম। অর্থাৎ ঘ বিন্দু ও ঝ বিন্দুর মধ্যে $\frac{1}{5}$ ঘর পরিমাণ একটু ফাঁক আছে। সাধারণতঃ চিত্র

আঁকিবার সময় কিংবা কাটা কাগজ জুড়িবার সময় এই ফাঁকটুকু দেখা যায় না। মনে হয় যেন গছ রেখাটি ঝ বিন্দু দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তা যায় না। মাঝের ফাঁকটি, অর্থাৎ কগছঝ ক্ষেত্রটি একটি সমান্তরাল চতুর্ভুজ (parallelogram), এবং তাহার আয়তন সমান। তাই এক ঘর বাড়িয়া ৬৫ ঘরের মতন দেখায়।

শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নীতি কথা

৺লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। মূল্য ।৴০

ভবিষ্যত জীবনে যাঁহারা স্বীয় জীবনকে মহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদের চরিত্রের ভবিষ্যৎমহত্বের বীজ বাল্যের ক্রীড়ার মধ্যে প্রথিত হইয়াছিল। বাল্যকালে যাহা একবার শুনি বা শিখি, তাহা জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির হইয়া অচল ও অটল থাকে অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে। সেই জন্য নীতির আদর্শ বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকখানি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সরল ভাষা এবং লিপিকুশলতায় বইখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দৈনিক

৺লাবণপ্রভা সরকার প্রণীত

মূল্য ১৲

দৈনিক ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থে বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

"দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায্যের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা ভক্তির আলোচনা একটী প্রধান হয়। সুতরাং আমার আশা হয় যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেই বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।"

"দৈনিক সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পাঠের যোগ্য, ইহাতে কোন সম্প্রদায়িক ভাব নাই। ইহা ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী রচনায় লালিত্য ও ভাষার মাধুর্য্যে প্রচারগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

ভাই বোন

শিশুদিগের পাঠোপযোগী গল্পের বই। ইহাতে ভাই বোনের যে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র স্নেহের ধারায় সংসার শিক্ত ও আমাদের প্রত্যেকের শৈশব মধুময় হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার এই অখ্যায়িকায় বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন। শিশুমহলে বইখানি অন্যন্ত আদরণীয়।

মাতা ও পুত্র

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত মূল্য ।৴০

বালকবালিকাদিগের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাকর্ষক গল্পের বই। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি এত করুণ যে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয় অশ্রুজলে সিক্ত করে। যাঁহারা এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে ইহা সুকুমার হৃদয় বালিকাদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে মাতার উচ্চ আদর্শ, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের অতুলনীয় চরিত্র, বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সকল নীতি গল্পচ্ছলে দেখান হইয়াছে।

মুকুল কার্য্যালয়ের ঠিকানা

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

পত্রাদি সম্পাদিকার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন :—

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲

প্রতি সংখ্যা ৵০

দ্বিতীয় বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ

সম্পাদিত।

সূচিপত্র

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাক টিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার :—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫।০, ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিশুর চুমা।

২য় বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩৩৬   ৪র্থ সংখ্যা

মুকুল

আমাদের কাজ।

ছোট যে আমরা   কি কাজ মোদের
পারি না বুঝিতে ভাই,
বড় যবে হব   কত কি করিব
তাহার ঠিকানা নাই।
তবু প্রাণে মোর   কে যেন কহিছে
কোমল মধুর স্বরে
যদিও তোমরা   ছোট অতিশয়
তথাপি অমন করে,
অলসের মত   সময় কাটাতে
এসনি অবনী পরে।
করে যাও কাজ   যেটুকু শকতি
সারাটী জীবন ধরে।

ব্যথিতের আঁখি দাও মুছাইয়ে
ক্ষুধিতে আহার দাও,
অনাথ যাহারা তাদের আদরে
গৃহেতে ডাকিয়া লও।
জনক জননী ভাই কি ভগিনী
সবারে বাসিও ভাল
অসত্য বচন বলিয়ে কখন,
জীবন করোনা কাল!
সুকুমার মতি ছোট ছোট অতি
তোমরা যেমন সবে,
তেমতি সবার ছোট ছোট কাজ
পালন করিতে হবে।
যে জন তোমায় এনেছেন হেথা
তাঁরি পদে সদা আর
মাগিও শকতি করিবারে কাজ
মনের মতন তাঁর।
ঘুচে গেল ভুল বুঝিলাম এবে
আমাদের কাজ কিবা,
এস করি পণ সাধিতে করম
পুলকে নিশীথ দিবা!

৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

যে কোনও ইংরাজী বৎসরের পঞ্জিকা তৈয়ারী করিবার সঙ্কেত

মুকুলের পাঠক পাঠিকা, যে-কোনও ইংরাজী বৎসরের সম্পূর্ণ পঞ্জিকা তৈয়ারী করিবার একটি সঙ্কেত তোমাদিগকে আজ বলিয়া দিতেছি। ইহা জানা থাকিলে তোমাদের অনেক কাজে আসিবে, এবং তোমরা অনেক সময়ে আমোদ পাইতে পারিবে। মনে কর, তোমার নিজের বা তোমার কোন চেনা লোকের জন্মের তারিখটা তোমার মনে আছে, কিন্তু সেদিনে কি বার ছিল, তা কারও মনে নাই। এই সঙ্কেত জানা থাকিলে তুমি বারটা বলিয়া দিতে পারিবে। অথবা, তোমার মনে পড়িতেছে যে অমুক বৎসরের অমুক মাসের শেষ রবিবারে তোমার এক বন্ধুর বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের তারিখটা ভুলিয়া গিয়াছ। এই সঙ্কেতের সাহায্যে তুমি তারিখটা বাহির করিয়া দিতে পারিবে।

লীপ ইয়ার।

এখন ইংরাজী ১৯২৯ সাল চলিতেছে। এই ১৯২৯ সংখ্যাটির মধ্যে "১৯" হইল শতাব্দীর অঙ্ক, এবং "২৯" হইল বৎসরের অঙ্ক। তোমর বোধ হয় জান যে, বৎসরের অঙ্কটিকে যদি ৪ দিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাগ করা যায়, তবে সে বৎসরকে "লীপ ইয়ার" ব'লে। সে বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ দিন না হইয়া ২৯ দিন হয়, এবং সমস্ত বৎসরে ৩৬৫ দিন না হইয়া ৩৬৬ দিন হয়। যেমন, গত বৎসরটি (১৯২৮) লীপ ইয়ার ছিল। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ দিন হইয়াছিল।

আবার বৎসরের অঙ্ক যদি "০০" হয়, তাহা হইলে শতাব্দীর অঙ্ক ৪ দিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাগ করা গেলে তবে সে বৎসর লীপ ইয়ার হয়, নতুবা হয় না। যেমন, ১৯০০ সাল লীপ ইয়ার ছিল না। কারণ ঐ সালে, বৎসরের অঙ্ক "০০", এবং শতাব্দীর অঙ্ক ১৯কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ৩ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু ২০০০ সাল লীপ ইয়ার হইবে, কারণ, ২০কে ৪ দিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাগ করা যায়।

মাসের তারিখ ও বারের মধ্যে কি সম্বন্ধ ?

যে কোনও মাসের ১লা তারিখে যে বার পড়িবে, সাত দিন পরে পরে, অর্থাৎ ৮ই, ১৫ই, ২২শে ও ২৯শে তারিখে নিশ্চয়ই সেই বারই পড়িবে। সেইরূপ, ২রা যে বার পড়িবে, ৯ই, ১৬ই ২৩শে ও ৩০শে তারিখে সেই বারই পড়িবে, ইত্যাদি। অতএব, কোনও মাসের যে কোনও এক তারিখে কোন্ বার ছিল বা হইবে, তাহা জানা থাকিলে, সমস্ত মাসের সব তারিখের বারগুলি বলিয়া দেওয়া যায়। মনে কর, তুমি জানিলে যে কোনও এক মাসের ২৭শে তারিখে ছিল শুক্রবার। তুমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পার যে সে মাসের ২০শে, ১৩ই ও ৬ই তারিখেও শুক্রবার ছিল। তার পর গণনা করিয়া বলিতে পার যে ৫ই ছিল বৃহস্পতিবার; ৪ঠা বুধবার; ৩রা মঙ্গলবার; ২রা সোমবার; ১লা রবিবার ইত্যাদি। পরের মাসের বারগুলিও বাহির করিতে পারিবে। মনে কর, জুলাই মাসের পাঁজি তোমার কাছে আছে। আগষ্ট মাসের ৩রা তারিখে কি বার পড়িবে, তাহা যেন তোমার জানা দরকার। তুমি এই ভাবে হিসাব করিয়া লও :—জুলাই মাস ৩১ দিনে শেষ হয়। অতএব, ১লা আগষ্টকে বলা যায় ৩২শে জুলাই; ২রা আগষ্টকে ৩৩শে জুলাই; ৩রা আগষ্টকে ৩৪শে জুলাই। ৩৪শে জুলাই হইতে ৭ বাদ দিয়া দেখিতে পাই যে, ২৭শে জুলাই যে বার, ৩রা আগষ্টও সেই বারই পড়িবে। "৩২শে, ৩৩শে ৩৪শে জুলাই" শুনিয়া হাসিও না। কাজের লোকেরা এই রকম হিসাব করিয়াই চট্‌পট্ বার-তারিখ ঠিক করিয়া ফেলেন।

আবার, যে কোনও সাধারণ বৎসরের (অর্থাৎ যাহা লীপ ইয়ার নয়, যাহার দিন-সংখ্যা ৩৬৫ মাত্র, এমন কোনও বৎসরের) পঞ্জিকা হাতে লইয়া দেখ। দেখিবে ১লা জানুয়ারী যে বার পড়িয়াছে, অন্যান্য মাসের নিম্নলিখিত তারিখগুলিতেও সেই বার পড়িয়াছে :—

ফেব্রুয়ারীর ৫ই, মার্চ্চের ৫ই, এপ্রিলের ২রা, মের ৭ই, জুনের ৪ঠা, জুলাইয়ের ২রা, আগষ্টের ৬ই, সেপ্টেম্বরের ৩রা, অক্টোবরের ১লা, নভেম্বরের ৫ই, ডিসেম্বরের ৩রা।

এই তালিকার অন্যথা কখনও হয় না। প্রত্যেক সাধারণ বৎসরেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, ৭ দিন পরে পরে একই বার ফিরিয়া আসে। হিসাব করিয়া দেখ, ১লা জানুয়ারী যে বার ২৯শে জানুয়ারীও সেই বার, কারণ মাঝে ঠিক ২৮ দিন। আবার ২৯শে জানুয়ারী যে বার, ৫ই ফেব্রুয়ারীও সেই বার, কারণ মাঝে ঠিক ৭টি দিন। অতএব, একবার ঐ তালিকাটি মুখস্থ হইয়া গেলে, তারপর বৎসরের যে কোনও একটি তারিখের একটি বার জানা থাকিলেই সমস্ত বৎসরের পঞ্জিকা তৈয়ারী করা সম্ভব হয়।

আগের দৃষ্টান্তটিই আবার গ্রহণ করা যাক। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা রাম-মোহন রায় ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। ঐ দিন শুক্রবার ছিল। এই একটি তারিখের "বার" জানা থাকিলেই তুমি সেই বৎসরের যে কোন তারিখের "বার" বলিয়া দিতে পারিবে। উপরের যে তালিকা মুখস্থ করিতে বলিলাম, তাহাতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩রা তারিখের উল্লেখ আছে। তুমি হিসাব করিয়া দেখিলে, ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইলে ৩রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পড়ে। অতএব, (ঐ তালিকা অনুসারে) সে বৎসরের ১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার ছিল; এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই মার্চ্চ, ২রা এপ্রিল, ৭ই মে প্রভৃতি (ঐ তালিকায় উল্লিখিত সব তারিখেই) মঙ্গলবার ছিল। সেই ১৮৩৩ সালের

১১ জুলাই তারিখে পার্লামেণ্ট মহাসভায় সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় এই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন নিষ্পত্তি হইয়া গেল, এবং সতীদাহ প্রথা আর অনুমোদন করা হইবে না এরূপ স্থির হইল, তখন তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তাঁর জীবনের এই আনন্দের দিনটিতে কি বার পড়িয়াছিল, একবার হিসাব করিয়া দেখি। আমাদের ঐ তালিকা অনুসারে ২রা জুলাই মঙ্গলবার ছিল। অতএব, ৭ দিন পরে, ৯ই জুলাই তারিখেও মঙ্গলবার ছিল। অতএব, ১০ই জুলাই বুধবার ছিল, এবং ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার ছিল।

বৎসরের "সূচি"।

কিন্তু যে বৎসরের বিষয়ে কিছুই জানা নাই, কোনও তারিখেরই "বার" জানা নাই, সেই বৎসরের পঞ্জিকা কিরূপে তৈয়ারী করিব? সেই বৎসরের কোনও তারিখের "বার" বাহির করিতে হইলে কিরূপে তাহা বাহির করিব?

প্রত্যেক বৎসরেরই এমন একটি বিশেষ সংখ্যা থাকে, যাহা জানিলে সেই বৎসরের সমস্ত পঞ্জিকাটি লিখিয়া দেওয়া যায়। সেই সংখ্যাটিকে সেই বৎসরের "সূচি"-সংখ্যা বলা যাইতে পারে।

সূচির সংখ্যা ০ (শূন্য), ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,—এই সাত প্রকার হইতে পারে। শূন্য হইলে তাহার অর্থ রবিবার, ১ হইলে সোমবার, ২য়ে মঙ্গলবার, তিনে বুধবার, চারে বৃহস্পতিবার, ৫এ শুক্রবার, ও ৬য়ে শনিবার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই ১৯২৯ সালের "সূচির" সংখ্যা ২। ২য়ের অর্থ মঙ্গলবার। তোমরা পঞ্জিকায় দেখিতে পাইবে, ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার, ইত্যাদি। (ঐ তালিকায় উল্লিখিত সব তারিখগুলি মঙ্গলবারে পড়িয়াছে।)

এই "সূচির" সংখ্যা বাহির করিবার নিয়মটাই আজ তোমাদের বলিব। তাহা কিছু পরে বলিতেছি। তার আগে লীপ ইয়ারের সূচির কথা একটু বলিতে হইবে।

সাধারণ বৎসরের ১লা জানুয়ারী, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই মার্চ্চ, ২রা এপ্রিল, ৭ই মে প্রভৃতি উপরের তালিকা নির্দ্দিষ্ট তারিখগুলি সবই "সূচির" বারেতে পড়ে।

লীপ ইয়ারে একটু বিশেষ নিয়ম আছে লীপ ইয়ারেও মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর এই দশ মাসে উক্ত তালিকা নির্দ্দিষ্ট তারিখগুলি (অর্থাৎ ৫ই মার্চ্চ, ২রা এপ্রিল, ৭ই মে, ৪ঠা জুন, ২রা জুলাই, ৬ই আগষ্ট, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১লা অক্টোবর, ৫ই নভেম্বর, ও ৩রা ডিসেম্বর, এই কয়টি তারিখ) "সূচির" বারেতেই পড়ে। কিন্তু জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ তালিকায় নির্দ্দিষ্ট তারিখগুলি (অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী ও ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ) সূচির বারে না পড়িয়া তাহার আগের বারে পড়ে।

যথা,—১৯২৮ সালটি লীপ ইয়ার ছিল। সে বৎসরের "সূচি" ছিল ১। ১ অর্থ সোমবার। দেখা যায়, ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ্চ, ২রা এপ্রিল, ৭ই মে, ৪ঠা জুন, ২রা জুলাই, ৬ই আগষ্ট, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১লা অক্টোবর, ৫ই নভেম্বর, ও ৩রা ডিসেম্বর সোমবারে পড়িয়াছিল। কিন্তু ১লা জানুয়ারী ও ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে পড়িয়াছিল।

আশা করি, তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, কোনও বৎসরের সূচির সংখ্যা জানিতে পারিলে, এবং তারিখের ঐ তালিকাটি মনে থাকিলে, সেই বৎসরের সম্পূর্ণ পঞ্জিকা তৈয়ারী করিবার আর কোন বাধা থাকে না। ঐ তালিকাটি মনে

রাখিবার জন্য এই কয় লাইন মুখস্থ করিয়া লইলে বেশ হয় :—

সাধারণ বৎসরের শুনহ নিয়ম,—
জানুয়ারী অক্টোবরে দিবসে প্রথম,
এপ্রিল জুলাই মাসে দিনেতে দ্বিতীয়,
সেপ্টেম্বর ডিসেম্বরে তারিখে তৃতীয়,
জুনের চতুর্থ দিনে, জানিও অন্তরে,
পঞ্চমেতে ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ নভেম্বরে,
প্রতি বর্ষে আগষ্টের ষষ্ঠ দিনে, আর
মে মাসের সপ্তমেতে পড়ে "সূচি"-বার।
লীপ ইয়ারে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে
সূচির আগের বার ঐ দিনে আসে।

বৎসরের "সূচি" বাহির করিবার নিয়ম।

নিয়মটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অঙ্ক কষিয়া যাইব, তাহা হইলে নিয়মটি সহজে বুঝিতে পারিবে। নিয়মটিকে ক, খ, গ, ঘ এই চারি ভাগে লেখা হইতেছে।

[১ম প্রশ্ন। ১৮৩৮ সালের ১৯ শে নভেম্বর তারিখে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। ঐ বৎসরের সূচি বাহির কর ; এবং কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম কি বারে হইয়াছিল, তাহা বলিয়া দাও।]

নিয়ম।—(ক) শতাব্দীর অঙ্ককে ৪ দিয়া ভাগ করিলে কি অবশিষ্ট থাকে তাহা দেখ, এবং তাহা লিখিয়া রাখ।

[এই প্রশ্নে শতাব্দীর অঙ্ক ১৮কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ২। এই অবশিষ্ট "২" লিখিয়া রাখিলাম।]

(খ) বৎসরের অঙ্কে তার চারি ভাগের এক ভাগ যোগ কর ; (ভগ্নাংশ হইলে তাহা বাদ দিয়া যাইও)। যোগফল লিখিয়া রাখ।

[৩৮এর চারি ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে নয়। ভগ্নাংশ বাদ দিয়া ৯ লইলাম, ও তাহা ৩৮ এর সহিত যোগ করিলাম। যোগফল হইল "৪৭"। তাহা লিখিয়া রাখিলাম।]

(গ) এই যোগফল হইতে পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্টের দ্বিগুণ বিয়োগ কর। বিয়োগফল লিখিয়া রাখ।

[৪৭ হইতে ২এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ বিয়োগ করিলাম। রহিল "৪৩"। ইহা লিখিয়া রাখিলাম।]

(ঘ) এই বিয়োগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহা দেখ। তাহাই সে বৎসরের "সূচি।"

[৪৩কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে "১"। অতএব, ১৮৩৮ সালের সূচি ১, যার অর্থ সোমবার। অর্থাৎ (ঐ তালিকা অনুসারে) ১৮৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই মার্চ্চ, ২রা এপ্রিল, ৭ই মে, ৪ঠা জুন, ২রা জুলাই প্রভৃতি তারিখ সোমবারে পড়িয়াছিল।

ঐ তালিকা অনুসারে নভেম্বরের ৫ই ছিল সোমবার ; অতএব ১২ই নভেম্বর এবং ১৯শে নভেম্বর তারিখেও সোমবার ছিল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম সোমবারে হইয়াছিল।]

দ্বিতীয় প্রশ্ন। ১৯০৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পোর্টুগালের রাজা আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ঐ বৎসরই ২৮শে নভেম্বর তারিখে সিসিলি দ্বীপে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া লক্ষাধিক লোক মারা যায়। ঐ দুই তারিখে কি কি বার ছিল ?

৪) ১৯ (৪	৮	১০	৭) ৪ (০
১৬	২	৬	০
অবশিষ্ট ৩	১০	৪	৪ সূচি
৩×২=৫			

৪ = বৃহস্পতিবার। ১৯০৮ সালে লীপইয়ার ছিল! অতএব, নভেম্বরের ৫ তারিখে বৃহস্পতিবার

পড়িয়াছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখে বুধবার পড়িয়াছিল। ইহা হইতে হিসাব করিয়া জানা যায়, (৫+২১ অর্থাৎ) ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছিল। অতএব, ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার ছিল, এবং ২৮শে নভেম্বর শনিবার ছিল। এবং (৫+৭ অর্থাৎ) ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন। বড় লাট লর্ড হার্ডিং একবার দিল্লীতে বোমার দ্বারা আহত হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে আমার শুধু এই কথা মনে আছে যে পাটনার কংগ্রেস দেখিবার জন্য মঙ্গলবার আমরা তথায় পৌছিয়া ষ্টেশনেই এই দুঃসংবাদটি শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি নাকি তার আগের দিন হইয়াছিল। এখন, সেই ঘটনার তারিখটি বলিয়া দাও।

পাটনার কংগ্রেস ১৯১২ সালে হইয়াছিল। আগে ১৯১২ সালের সূচি বাহির করা যাক্।

৪)১৯(৭	১২	১১	।)৯(১
১৬	৩	৬	৭
—	—	—	—
৩	১৫	৯	২ সূচি

৩×২=৬

২ অর্থ মঙ্গলবার। সুতরাং, ১৯১২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মঙ্গলবার ছিল। কাজে কাজেই, ডিসেম্বরের ১০ই, ৭ই, ২৪শে, ও ৩১শে তারিখেও মঙ্গলবার পড়িয়াছিল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস বসে ; তার কিছু আগেই দর্শকেরা সেই দিকে যাত্রা করেন। সুতরাং যে মঙ্গলবার ইঁহারা পাটনা পহুঁছিয়াছিলেন, তাহা ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। অতএব, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে দিল্লীতে বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল।

কয়েকটি প্রশ্ন।

এখন, তোমরা যদি নিয়মটি ঠিক বুঝিয়া থাক, তবে এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বাহির কর।

(১) মহাত্মা গান্ধীর জন্মের তারিখ ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মের তারিখ ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর। এই দুই তারিখে কি কি বার ছিল ?

(২) ১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। ১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধের পর দুই শত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই দুই তারিখে কি কি বার পড়িবে ?

(৩) কয়েক দিন পূর্ব্বে এক ভদ্র লোক নিজের ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইতে গিয়া বলিলেন, "ইহার বয়স বারো কি তেরো হইবে। ঠিক বয়স মনে নাই, কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে ইহার জন্ম হয়, আর সে দিন মঙ্গলবার ছিল। ছেলেটির জন্মের সাল তারিখ বার সব বাহির করিয়া দাও।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

———

আফগান রাজের কথা

"মানুষ এক ভাবে, আর ভগবান্ অন্য এক করেন"—এ কথাটি যে কত সত্য তাহা আমরা প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাই। "মুকুলের" "বিচিত্র সংবাদে" আভাষে একটু জানিতে পারিয়াছিলে যে আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লাহ্ খাঁ নিজের দেশে কত দিকে কত উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল এক দিন এই স্বদেশকে পৃথিবীর সভ্য এবং উন্নত দেশ সকলের মত গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু হায়, কোথায় তাঁহার এই আশা! আজ তিনি কেবল সিংহাসন হারাইয়াছেন তাহা নহে, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অতি দূরে ইটালী দেশের এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

এই ত সেদিন—প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমীর আমানুল্লা ও তাঁহার পত্নী রাণী সৌরীয়া একরকম পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের কারণ সকল দেখিয়া, শুনিয়া, শিখিয়া এবং জানিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন। তিনি আমাদের ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। যখন যেখানে গিয়াছেন তখনই সেখানে বিপুল অভ্যর্থনা, অতুল সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, আফগানরা স্বাধীন—নিজেরাই নিজের দেশের রাজা, বিচারকর্ত্তা, বিদেশীর অধীন নয়—এমন কি নিজের দেশের রাজাও অধীন নয়, রাজা নিয়মের অধীন। আমীর আমানুল্লা নিজেই এই মত প্রচার করিয়াছিলেন; নিজেই নিজের ইচ্ছায় নিয়মের অধীন হইয়াছিলেন। "রাজা পূর্ণ মাত্রায় স্বদেশ হিতৈষী, দেশের সম্মান ও কল্যাণকেই তিনি নিজের সম্মান ও কল্যাণ জ্ঞান করেন; দেশ ও তিনি এক; এবং তিনি আপনাকে জাতির সামান্য সেবক মনে করেন।" এমন রাজাকে কে না ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে? যে দেশের রাজা প্রজাদিগকে ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন, আপনার জন মনে করেন, প্রজারাও রাজাকে মান্য করিয়া চলে, সেই দেশের রাজার শক্তিত বৃদ্ধি পাইবেই। এবং যাহার শক্তি আছে সেই সকলের সম্মান লাভ করিবে। সেই জন্যই আমীর আমানুল্লা সকল স্থানে এত আদৃত হইয়াছিলেন।

আফগানিস্থানে প্রায় আশী লক্ষ লোকের বাস। তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সামান্য শিক্ষা পাইয়াছে। শিক্ষা না থাকিলেই কু-সংস্কার থাকিবে। সকল প্রকার কুসংস্কার সে দেশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মেয়েদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতে হয়, লেখাপড়া শেখা ত দূরে থাক্।

আমীর দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াই প্রথমে শিক্ষার উপর হাত দিলেন। বালক বালিকা সকলকেই পাঠশালে যাইতে হইবে নিয়ম হইল। ঘোমটা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। কত বালক বালিকাকে নানা প্রকার শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মের উপরেও তিনি হাত দিলেন। আমাদের দেশে যেমন পুরোহিতদের প্রবল প্রতাপ অথচ তাহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না, অনেকেই একেবারে মূর্খ সেইরূপ আফগানিস্থানেও মোল্লাগণ ধার্ম্মিক না হইয়া শিক্ষিত না হইয়া সকলের উপরে রাজত্ব

করে। আমীর ইহাও বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। এক কথায় সকল দিক কদিয়া নিজের দেশের উন্নতি করিতে আমীর আমানুল্লা তাঁহার শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সকল সময় সকল স্থানেই এমন এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা সকল প্রকার উন্নতিতেই বাধা দেয়। তাহারা ভাবে যাহা আছে তাহাই ভাল—; যাহা কিছু নূতন তাহাতেই ঘোর অনিষ্ট হইবে। আফগানিস্থানের মত অশিক্ষিত দেশে এরূপ লোকের কিছু অভাব ছিল না। এই উন্নতিতে মোল্লাগণই প্রবলরূপে বাধা দিতে লাগিল; জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিলে ত এই পুরোহিতগণের অন্যায় অত্যাচার চলিবে না! আবার সাধারণ লোকের উপর ইহাদের প্রভাবও অনেক। এখন কয়েক জন মোল্লা প্রচার করিতে লাগিল—আমীর মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী—কাফের, আমীর দেশের অবনতি চায় ইত্যাদি। ইহার ফলে এক স্থানের লোক রাগিয়া উঠিল। তাহারা আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম আমীর এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু তাহাদের দল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাচ্চাই সাকো নামে একজন লোক তাহাদের নেতা হইল।—আমীর দেখিলেন যুদ্ধ করিলে নিজের দেশের লোকরাই মরিবে। তাহাতে লাভ কি! তিনি ত আর সিংহাসন চান না, চান আফগানিস্থানের উন্নতি। তিনি বলিলেন—"আমি রাজা থাকিলে যদি দেশের ক্ষতি হয় তবে আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক ভাই আমীর হইলেন।

এদিকে বাচ্চার দল আমানুল্লা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া—রাজধানীর দিকে আসিতে লাগিল; ক্রমে নূতন আমীরকে বন্দী করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার কবিয়া বসিল।

আমানুল্লাহ্ খাঁকে কিন্তু সহজে কেহ ছাড়িল না। বহু প্রজা, বহু সৈনিক, সেনাপতি প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীগণ তাঁহার দিকে; সকলে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বাচ্চার মত লোককে আফগানিস্থানের সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। আমানুল্লা প্রথম প্রথম তাঁহাদের কথা মত বাচ্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার দেশেরই ক্ষতি এই ভাবিয়া তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া, রাজভোগ, ঐশ্বর্য্য সকল বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার বড় প্রিয় জন্মভূমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করা স্থির করিলেন। ইটালীতে থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া আফগানিস্থান ত্যাগ করিলেন। পথে বোম্বাই সহরে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করায় কিছুদিন তথায় থাকিতে হয়। গত ২২শে জুন তিনি বোম্বাই হইতে ইটালী যাত্রা করিয়াছেন।

তাঁহার এই স্বদেশ ত্যাগে ভারতবর্ষেও বহু হিন্দু মুসলমান কষ্ট বোধ করিতেছেন। তিনি যখন বোম্বাই আসেন—তখন ভারতবর্ষের জন সাধারণের পক্ষ হইতে "নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস)" বর্ত্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু মহাশয় নিজে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি ফুলের তোড়া উপহার দেন। তিনি যেদিন বোম্বাই ছাড়িয়া যান সেদিন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, কর্ম্মচারী, কত সাধারণ লোক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বিদায় দেন। আমীর আমানুল্লাও না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজা ও রাণী ছাড়া আরও ১৪ জন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

এখন আফগানিস্থানের যে কি শোচনীয় অবস্থা তাহা বলিবার নয়। সহরের সব কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়। ধন, জীবন কাহারও নিরাপদে নাই। চারিধারে অত্যাচার প্রবল বেগে চলিতেছে। আমানুল্লার অনুরক্তে লোকদের ত লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে। তাহাদের জীবনও বাচ্চার হাতে।

আমির আমানুল্লাহ খাঁ আফগানিস্থানের সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক বড় বড় লোক এখনও তাঁহাকে আফগানিস্থানের আমির রূপে চান। তাঁহারা বাচ্চার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। শোনা যায় অনেক স্ত্রীলোকও বাচ্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। অনেক স্থলেই তাঁহারা জয়লাভ করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের ইহাই একান্ত কামনা এবং প্রার্থনা যে, আফগানিস্থানে যেন শীঘ্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; আমির আমানুল্লাহ খাঁ আবার ফিরিয়া আসিয়া দেশের সকল প্রকার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন।

কাজের লোক

প্রথম চিত্র।

ধনীর ছেলে—চাষা ভাই চাষা ভাই
করছ তুমি কি?
কৃষক—চষি আমি যত জমি
ছড়িয়ে বীজ দিই।
জল বর্ষে তবুও হর্ষে
করে যাই কাজ,
যখন সূর্য্য তাপে ধরা ফাটে
রই মাঠের মাঝ।
তার পরে গাছ বাড়ে,
সবুজ মজার
কচি শিষে রৌদ্র মেশে
দেয় কি বাহার।
ধান পাকে তাই দেখে
সবার মুখে হাসি,
সার্থক হয় যত সব
কষ্ট রাশি রাশি।
যোগাই অন্ন জীবন্ ধন্য;
এর চেয়ে সেরা
কোন কাজ ধরা মাঝ
জানি নাক মোরা।
ধনীর ছেলে—তোমাদের কাছে
যাণ মোদের আছে;
তোমরা মহৎ;
কৃষি বিনা ভবে
বাঁচিবে কে কবে?
ক'দিন জগৎ।

দ্বিতীয় চিত্র।

ধনীর ছেলে—ঐ যে কলে লোকে বলে
শ্রম করে যারা
বড় ছোট, বয় মোট
খেটে হয় সারা।

শ্রমিক—যার তরে প্রাণ ভরে
করে যেই কাজ,
হয় সভ্য তৈরি দ্রব্যে
গৃহ করে সা ।
সেই কয় ছোট হয়
শ্রমিক যত ভাই !
তার মত অকৃতজ্ঞ
সমাজে আর নাই।
ঐ সহরে কত মরে
ঝাড়ু নাহি দিলে
ময়লা রাশি জুটে আসি
বাটে মাঠে বিলে।
যবে ধনীর ছেলে মটর নিয়ে
উঁচু মাথে ধায়
মনে কি পড়ে কে কর্ম্ম করে
পথটি বানায় ?
ধনীর ছেলে—লজ্জা পাই আর না ভাই
বহু কথা শুনি।
সমাজ সেবা ক'রে কেবা
তোমা হতে গুণি ?

তৃতীয় চিত্র।

ধনীর ছেলে—গ্রামে গ্রামে পাঠ শালে
একজন লোক
এসে বকে, তাই দেখে
পাই বড় শোক।
শিক্ষক—অর্থ নাই, দুঃখ নাই,
নাই মোর ক্লান্তি,
দিই শিক্ষা, করি না ভিক্ষা,
এই বড় শান্তি।
কিবা ধনী, কিবা নির্ধনী,
সবই সমান,
লোক গড়ি, তাই পাই
সমাজে সম্মান।
মোদর কাজ সমাজ মাঝ
ছোট মোটে নহে,
দুঃখ পাই, কত ভাই,
যদি ছোট কহে।
ধনীর ছেলে—জ্ঞান বিনা শ্রী হীনা
মোদের এ দেশ,
মূর্খ বলি' হয় আজি
অপমানে শেষ।
এ দীনতা মলিনতা
দূর করে যারা,
মহাদান করে' যান
সকলের সেরা।

শ্রীনলিনী দীন্দা বি, এ।

সোণার খনির সন্ধানে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বলাইবাবু ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, "আর আমার কথা বলার সময় নেই, এখনি বড় সাহেবের কুঠীতে যেতে হবে ; তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও। জান ত, এ চা বাগান, এখানে যাকে তাকে আমরা ঢোক্‌বার অনুমতি দিই নে।"

সুরেশ কহিল, "আমি আমার বোন দুটিকে না দেখে কিছুতেই এই ঘর ছেড়ে যাব না।"

বলাইবাবু। বটে! তুমি এই ঘর ছেড়ে যাবে না ? দরোয়ান এখনি এই ছোকরাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে চা বাগানের বাইরে রেখে এস।"

দরোয়ান যথার্থই অপমান করিয়া সুরেশকে চা বাগানের বাহিরে রাখিয়া আসিল। সুরেশ নিরুপায় হইয়া ডিব্রুগড় সহরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পিতা যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সে এক ধনবান মাড়োয়ারির বাড়ী। সেই বাড়ীতে এখন উমাচরণ বাবু উকিল বাস করেন। তিনি খুব ভদ্র এবং সহৃদয় ব্যক্তি। সুরেশ সেই উমাচরণবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া, আপনার পরিচয় প্রদান করিল। উমাচরণবাবু তরুণ বয়সে বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুরেশের পিতার সুচিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন নৌকা ডুবির সঙ্গে সঙ্গে সুরেশদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। আজ তিনি সুরেশের মুখে তাহাদের সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

সুরেশকে যত্ন আদর করিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া গেলেন। সুরেশদের বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী ঐ বাড়ীরই একটি ঘরে সাজানো ছিল। সুরেশ সেই সকল জিনিস দেখিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সে যে চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িত, সে চেয়ারখানা, তাহার পড়ার বই কয়েকখানি এখনো সাজানো রহিয়াছে। এখনো তাহার পিতামাতার এবং তাহার নিজের ও দুইবোনের ফটো সেই ঘর খানির মধ্যেই আছে। ঐ সকল দেখিয়া সুরেশের মন একেবারে উদাস হইয়া গেল।

সুরেশ রাত্রে তাহাদের সেই প্রিয় ঘরখানিতে তাহারই পিতার চৌকির উপরে শয়ন করিল। রাত দুপুরের সময় সে স্বপ্নে দেখিল, তাহার স্নেহময় পিতা তাহার অতি নিকটে। তিনি বলিলেন, "আমার প্রিয়পুত্র,

আজ আমি শুধু তোমাকে দেখার জন্যই পর-কাল হতে এখানে এসেছি। তোমার নির্ম্মল চরিত্র দেখে আমি বড়ই সুখী। কিন্তু তোমার একটি কাজে আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। তুমি ত জান, আমি জীবনে কখনো মানুষের অন্যায় অনুগ্রহ গ্রহণ কর্‌তে সম্মত হই নি। নগেন্দ্রনাথ নিজে উপার্জ্জন করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন, সেই অর্থে তিনি দেশের কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন কর্‌বেন। তুমি কেন তাঁর সেই অর্থ গ্রহণ করে ধনী হতে চাও ? তুমি আমারই কথা শোন, আমারই অনুরোধ রক্ষা কর, তা হলেই তোমার কল্যাণ হবে এবং প্রকৃত সুপুত্রের কার্য্যও করা হবে। তুমি আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ কর। তুমি আমারই মতন সোণার খণির সন্ধানে হিমালয়ের দিকে যাত্রা কর। আমি সোণার খণির সন্ধান পাই নি, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই

সন্ধান পাবে। সোণার খণি আবিষ্কার করতে পারলে দেশজোড়া তোমার নাম হবে, তখন বলাই বাবু নির্ম্মলা ও সরযূকে আপনি নিয়ে এসে তোমার পায়ের কাছে রেখে যাবে। তুমি কাল সকালেই সোণার খণির সন্ধানে যাত্রা কর।"

সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে মনে কহিল, "মানুষ স্বপ্নকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, আমার ত আজ স্বপ্নকে সত্য বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই আমার পিতা পরলোক হতে এসে, আমার যা করা দরকার, সেই কথাই বলে গেলেন। আমি কাল সকালেই সোণার খণির সন্ধানে যাত্রা করব।"

সুরেশ নগেন্দ্রনাথকে ও সরলাকে দুখানি চিঠি লিখিয়া, সোণার খণির সন্ধানে হিমালয় পাহাড়ের দিকে চলিল। সরলা সেই চিঠি পড়িয়া শিহরিয়া উঠিল। সে চোখের জলে ভাসিয়া কহিল, "নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে, তার কঠিন হস্ত হতে দাদাকে রক্ষে করেছিলুম; এখন আবার তিনি একটা মিথ্যা স্বপ্নকেই সত্য মনে করে, সোণার খণির সন্ধানে চললেন? বাবাও সোণার খনির সন্ধান করতে গিয়েই আর ফিরতে পারলেন না, দাদাও আর ফিরে আসতে পারবেন কি না তা কে বলবে? হায়, অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখের পরে সবে কয়টি দিন মাত্র দুই ভাইবোনে স্নেহসূত্রে বাঁধা পড়তে ছিলাম, আজ সেই সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল? বলে দাও ঈশ্বর, এমন কেন হল?"

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রীসভা

আষাঢ় মাসের "মুকুলে" ইংলণ্ডের নূতন পার্লামেণ্টের কথা বলিয়াছিলাম। নূতন পার্লিয়ামেণ্ট হইলে সাধারণতঃ নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়োজন হয়। পার্লিয়ামেণ্টে যে দলের সভ্যসংখ্যা অধিক তাঁহারাই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে শ্রমজীবীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তদনুসারে শ্রমজীবীরা নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পার্লিয়ামেণ্টে রক্ষণশীলের সংখ্যা অধিক ছিল; সুতরাং তাঁহাদের দলের লোক লইয়াই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গত নির্ব্বাচনে তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াই তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রমজীবীরাও আপনাদের দলের প্রধান প্রধান লোক লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। এই মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন মন্ত্রী এবং তাঁহার সহকারী থাকেন। প্রায় সাতাশ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা (Cabinet) গঠিত হয়। দলের নেতা তাঁহদিগকে মনোনীত করেন। পুরাতন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলে রাজা যে দলের সভ্যসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহার নেতাকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই প্রথানুসারে শ্রমজীবীদলের নেতা মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের উপর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ভার অর্পিত হয়। তিনি স্বীয় দলের উপযুক্ত লোকদিগকে বাছিয়া নূতন মন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের নেতা হইয়াছেন। মন্ত্রীদলের নেতার নাম Prime Minister বা Primier অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী।

প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীসভার অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী এতদ্ব্যতীত কোন একটী বিভাগের কাজ নিজের হাতে রাখিতেন কিন্তু কার্য্য-ভার গুরুতর হওয়ায় এখন সাধারণতঃ তিনি কোন একটী বিশেষ বিভাগের কার্য্যভার নিজের হস্তে রাখেন না। সাধারণভাবে প্রত্যেকের এবং সকল মন্ত্রীর সমবেত কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করেন। প্রধান মন্ত্রীর শক্তি এবং দায়িত্ব উভয়ই গুরুতর। সমগ্র বিটিশ সাম্রাজ্যের কার্য্য পরিচালনার ভার তাঁহার স্কন্ধে। ২০।২৫ জন সহযোগী মন্ত্রীর কার্য্যের পরিচালনা সহজ ব্যাপার নয়। সহযোগী মন্ত্রীগণও বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক। দেশের কার্য্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এমন লোক লইয়াই মন্ত্রী-দল গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর নীচেই বোধ হয় রাজস্ব সচিবের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অধিক। মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ফিলিপ স্নোডেন নামক একব্যক্তিকে এইবার নূতন মন্ত্রীসভায় রাজস্ব সচিব মনোনীত করিয়াছেন। শ্রমজীবীদলের মধ্যে অর্থনীতি বিষয়ে তিনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ। মিঃ স্নোডেন অর্থনীতি বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। রাজস্ব সচিব দেশের আয়ব্যয়ের কার্য্য পরিচালনা করেন। কোন কোন কার্য্যে কত অর্থ ব্যয় হইবে ; কোন কোন কর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এই সকল নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহার হাতে ; সুতরাং সর্ব্বদাই কোন বিচক্ষণ এবং শক্তিশালী লোককে রাজস্ব সচিব নির্ব্বাচিত করা হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভায় আর একটী প্রধান পদ বৈদেশিক মন্ত্রী। অন্যান্য রাজ্যের সহিত যে সব কার্য্য হয় তাহার পরিচালনার ভার বৈদেশিক মন্ত্রীর হাতে। এই পদ অতি দায়িত্বপূর্ণ ; বিদেশীয় রাজ্য সকলের সহিত সন্ধি, বিগ্রহ, সদ্ভাব রক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার উপরে নির্ভর করে। নূতন মন্ত্রীসভায় আর্থার হেণ্ডারসন্ নামক একব্যক্তিকে এই পদ দেওয়া হইয়াছে। সমর সচীব ও নৌবিভাগের মন্ত্রীর কার্য্যও খুব দায়িত্বপূর্ণ। ইঁহাদের হাতে দেশ-রক্ষার ভার থাকে। দেশের সৈন্য সংখ্যা কত হইবে, রণপোত কত থাকিবে ইহা বিচারের ভার তাঁহাদের হাতে। টমাস্ স ও এ, ভিঃ আলেক-জাণ্ডার নামক দুই ব্যক্তি এই দুই প্রধান পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ ভিন্ন এখন আকাশ যুদ্ধের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম লর্ড টম্‌সন্। ইংলণ্ডের শাসনকার্য্যে আর একজন প্রধান পুরুষ ঔপনিবেশিক মন্ত্রী। তাঁহার কার্য্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি ক্রমে শক্তিশালী হওয়ায় এই পদের দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন মন্ত্রীসভায় মিঃ সিড্‌নি ওয়েব এই পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী থাকেন। আমাদের দেশের সকল কাজের শেষ মীমাংসা তাঁর হাতে। মিঃ ওয়েজ্‌উড্ বেন্ নামক এক ব্যক্তি নূতন মন্ত্রীসভায় ভারত সচীব নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রমজীবিগণ জাগরিত হওয়ায় দেশে শ্রমবিভাগে বহু নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সকলের মীমাংসার জন্য একটী নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। মিস্ মর্‌গেট্ বণ্ডিফিল্ড নাম্নী একজন মাহলার উপরে ইহার ভার অর্পিত হইয়াছে। মিস্ বণ্ডিফিল্ড ইংলণ্ডের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা মন্ত্রী। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের একটী প্রধান সমস্যা সকল লোকের চাকরী ব্যবস্থা করা। বহুসংখ্যক লোক কাজ পাইতেছেন না। কিরূপে সকলের কাজ যোগাড় হয় এই বিষয় লইয়া বিগত কয়েক

বৎসরে ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন হইতেছে। শ্রমজীবীদল এই সমস্যার সমাধান করিবেন বলিয়াছেন। নূতন নির্ব্বাচনে তাঁহাদের জয়ের ইহাই একটী প্রধান কারণ। কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং মিঃ টমাস্ নামক একজন তাঁহাদের দলের প্রধান ব্যক্তির হস্তে এই কার্য্য অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রকার সাতাশ জন লোক লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনী অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকাবহ। অনেকেই এখনও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নাই। রাজকার্য্য পরিচালনায় ইঁহাদের অভিজ্ঞতা অল্প। শ্রমজীবীদল ইতিপূর্ব্বে একবার কয়েক মাস ভিন্ন শাসন কার্য্যে সুযোগ পান নাই। সেবারও মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহাদের সভ্যসংখ্যা এবার অপেক্ষা অল্প ছিল। অন্যদলের প্রতিকূলতায় কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আশা করা যায় এবার তাঁহারা অধিক দিন কাজ করিবার সুবিধা পাইবেন এবং তাঁহাদের শাসন সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ হইবে।

শ্রী হেমচন্দ্র সরকার

চাষার কথা

আরে, চাষা আবার কথা কইবে কি? এই হইল আধুনিক তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলের মন্তব্য। আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি যে ভদ্রলোককে আবার চাষ করবে কি? কিন্তু, ঐ চাষার ছেলেই যে আমাদের ভদ্রলোক বানিয়েছে সে কথাটা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাই সেই চাষের সম্বন্ধে দুই এক কথা আজ বলিব।

কোন বড় নগরে বা সহরতলীতে চাষ করিয়া আমরা দিনগুজ্‌রান করিতে পারিব না,একথা সত্য; কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় আধঘণ্টা করিয়া মাটি কোপাইয়া যে আমরা খানিকটা কব্জির জোর করিতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই, আর, উপরি পাওনা—কলা, শাক, সিম, বেগুন, পেঁপে খাইয়া যে পরিতৃপ্ত হইতে পারি, তাহার যথেষ্টই প্রমাণ আছে। ফুলের চাষ করিয়া যে পয়সা উপায় করা যায় তাহা দেখান শক্ত নয়, কিন্তু সকালবেলা একবার ফুলবাগানে ঘুরে এলে যে মনটা যথেষ্টই প্রফুল্ল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ; তা ছাড়া গৃহদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় মনটা যে আনন্দে ভরিয়া উঠে, তাহা ভক্ত ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিবে? এই ফুলের চাষও খুব সহজ। কিন্তু জগতে সহজ বলিয়াও কোন কায নাই, আর শক্ত বলিয়াও কোন কথা নাই। প্রাণপাত করা খুবই শক্ত কায, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ দেশের জন্য অকাতরে সেই প্রাণ বলি দিতেছে; আবার ভাল খাওয়াপরা, গাড়ীঘোড়া চড়িয়া বেড়ান কত সহজ, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা বিষ্ঠার মত সেই বিষয়-ভোগটাকে ত্যাগ করিতেছে। সুতরাং চাষ আবাদ খুব সহজ কায হইলেও তত সহজ নয়। তবে আমাদের দেশে এটা যে মাথা বাঁচাবার একমাত্র উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখাপড়াই বল,

আর দেশউদ্ধারই বল, আগে পেট না ভরাতে পারিলে, কিছুই চলে না।

চাষ করি মনে করিলেই, শুদ্ধ খানিকটা পতিত জমিতেই যে সোনা ফলান যায় তাহা নহে, এমন কি জমি না থাকিলেও যে চাষ চলিতে পারে, তাহার প্রমাণ কলিকাতার ছাদগুলি। সেখানে লোক টবের উপরেও ফলফুলের গাছ করিতেছে। সুতরাং চাই তোমাদের সেই গাছ করিবার সখটুকু।

কিছু না, কেবল যেমন করিয়া পার খানিকটা জমি যোগাড় কর—আমাদের এ বাঙ্গালাদেশে জমির অভাব নাই, অভাব সন্ধানের—তারপর সকাল বিকাল খানিকক্ষণ সময় সেই জমির একটু পাট করে কাযে লাগিয়া যাও, দেখিবে ছ'মাসে সে জমির হাল ফিরিয়া গিয়াছে। আজকাল কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও চাষ আবাদের কায আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

তারপর আমাদের এই "মুকুল" ত আছেই, এর ভিতর দিয়া সকলে চাষের ফলাফল পরস্পরকে জানাইয়া দাও, সকলেরই উপকার হইবে, উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়,
বি, এ কাব্যতীর্থ।

জীবজন্তুর কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আহত ব্যক্তিদিগের পরিচর্য্যাকারী জন্তু।

তোমরা যাহারা সহরে বাস করিয়া থাক তাহারা দেখিয়া থাকিবে যখন রাস্তায় কেহ গাড়ী, ট্রাম কিম্বা মোটর চাপা পড়িয়াছে, কি অন্য কোনরূপে আহত হইয়াছে তাহাকে Ambulance মোটরগাড়ী করিয়া নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে। টেলিফোন করিয়া দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই দুর্ঘটনার স্থানে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিস কিম্বা অন্য লোকেরা কেমন যত্নের সঙ্গে আহত ব্যক্তিকে খাটের উপর শোয়াইয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠায়। এমন সাবধানে তাহারা গাড়ী চালায় যাহাতে তাহার দেহে বৃথা ঝাঁকুনি না লাগে।

ইংলণ্ডে "সেণ্ট জন্‌স এম্বুলান্স কোর" নামে একটি সমিতি আছে। এই সমিতির সভ্য হইতে হইলে ডাক্তারদের নিকট হইতে "আহতদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সাহায্যের উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে হয়। এ সম্বন্ধে দশটী কি বারটী বক্তৃতা শুনিবার পর একটী পরীক্ষা দিতে হয় যদি তোমরা পাস করিতে পার তবে তোমাদের একটী প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয় তাহাতে লেখা থাকে যে তোমরা আহতদিগকে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম সাহায্য করিতে সক্ষম। প্রত্যেক বালকের এই সমিতির সভ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক বালক বালিকার First aid শিক্ষা করা উচিত।

কয়েকটী লোককে যেমন আহত ব্যক্তিদিগের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করা হয় তেমনি জন্তুদের দ্বারা এ কার্য্য করা যাইতে পারে।

আমরা শুনেছি যে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষিত কুকুর থাকে। সৈন্যদের

প্রধান আবাসস্থানে গেলে শিক্ষিত কুকুরদের দেখা যায়।

বেশীদিনের কথা নয় অল্পকাল হইল তুরস্কের সুলতান এইরূপ চারিটী শিক্ষিত কুকুর কিনিয়াছিলেন এবং তাহারা কনষ্টান্‌টিনোপলে অদ্ভুত কাজ করিয়াছিল। তুর্কী সৈন্যেরা যখন দেখিল যে তাহারা আহত সৈন্যদের খুঁজিয়া বাহির করিতে খুব দক্ষ তখন তাহাদের জন্য ঘর তৈয়ারী করিয়া দিল। প্রতিদিন তাহারা হারান ও আহত কাল্পনিক সৈন্যদের খুঁজিতে বাহির হয়। এইরূপে তাহাদের শিক্ষিত করা হয়।

যখন রুষ-জাপান যুদ্ধ হয় তখন ইহারা অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সে সব বিবরণ তোমরা কেহ পড়িয়া থাকিবে। সে সময়ে শস্যক্ষেত্রে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। লম্বা লম্বা শস্যগাছের মধ্যে অনেক আহত সৈন্য লুকাইয়া থাকিত। যুদ্ধ শেষ হইলে পরে তাহাদের খুঁজিবার জন্য পরিচর্য্যাকারিগণ বাহির হইত, তাহারা তখন কুকুরদের সঙ্গে লইয়া যাইত। শস্যগাছগুলি খুব লম্বা ও ঘন হওয়াতে সে সকলের মধ্য হইতে আহত সৈন্যদের খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন। কিন্তু কুকুররা এ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে করিত। কুকুরদের প্রবল ঘ্রাণশক্তি থাকাতে তাহারা সহজেই লোকদের খুঁজিয়া বাহির করিত ও ডাক্তারদেরও সেই স্থানে লইয়া যাইয়া অনেক মুমুর্ষু সৈন্যের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ অনেক জাপানী সৈন্যের প্রাণ ইহাদের দ্বারাই রক্ষা পাইয়াছে।

সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ। তোমরা এই কুকুরের ছবি দেখিয়া থাকিবে ও তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর কুকুরগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। ইহাদের গায়ের রং বড় সুন্দর ও ইহাদের গায়ে খুব লোম।

আল্পস পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন পথিক পথ হারাইয়া যায় এই কুকুররা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালীতে আল্পস পর্ব্বত, ইহার চূড়া বরফে আবৃত। অনেক ধনী লোক ছুটির সময়ে এই পর্ব্বতে বেড়াইতে যান। একবার বরফের আরম্ভ হইবার সীমা পার হইলেই অনেক বিপদে পড়িতে হয়। নীহার প্রবাহের ফাটল, শৈলস্খলিত তুষারস্তূপ, অসহ্য শীত ও সরু পিচ্ছল পথ ইত্যাদি অতি বিপদসঙ্কুল স্থানে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে। কোন দক্ষ পথপ্রদর্শককে সঙ্গে না লইয়া এক নির্ব্বোধ ও অভিজ্ঞ পর্ব্বতবাসী লোক ব্যতীত কেহই ঐ পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করিতে সাহস করে না।

যদি কোন পথিক পর্ব্বতে একলাই আরোহণ করিয়া থাকে তবে সে খুব সম্ভব পথ হারাইয়া ফেলিবে। তাহার চারিদিকেই সাদা বরফ। তাহার পায়ের চিহ্ন বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়। সে আর কোন্ চিহ্ন দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে! পর্ব্বতে উঠিবার রাস্তা অতি সরু, সে পথ হারাইয়া দিশাহারা হইয়া যায়। তাহার মনের ভাব যে তখন কি হয় একবার বুঝিতে চেষ্টা কর। তাহার কাছে মাত্র অল্প কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে সে ভাবিয়াছিল রাত্রির পূর্ব্বেই হোটেলে পৌঁছাইবে। চারিদিকে সাদা বরফ দেখিতে দেখিতে যেন চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। ক্রমে রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, তাহার ভয় দ্বিগুণ বাড়িল। দেহ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার মন নিরাশায় পূর্ণ হইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল বরফের উপরেই শুইয়া পড়ে আর ঘুমায়। তবে হয়ত সেই নিদ্রাই চিরনিদ্রা হইতে পারে এই এক আশঙ্কা। তথাপি সে সাহসের সহিত নিজকে সজাগ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে শীতে অত্যন্ত কাতর হইল, কাণের মধ্যে ভন্ ভন্

শব্দ শুনিতে লাগিল। আর সে ঘুম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—তাহার শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় সে স্থান আলোকিত করিয়া হঠাৎ একটা চীৎকার ধ্বনি শুনা গেল। ঠিক যেন মানুষের স্বর শুনা গেল। সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর তখন খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে অবশেষে পথশ্রান্ত পথিককে খুঁজিয়া পাইল। সে খুব জোরে তাহার মুখে ও হাতে চাটিতে লাগিল। এইরূপ করাতে রক্ত চলাচল করিতে লাগিল ও তাহার অসাড় হাতে সাড়া আসিল। কুকুরের গলায় ঝুলান একটী পাত্রে মদ ছিল। কুকুরটী নিজে ত গলা হইতে পাত্রটি খুলিতে পারে না সেজন্য সে পথিকের হাতে যাহাতে জোর হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পথিক বোতলের ছিপিটি খুলিয়া মদ খায়। তখন কুকুরটী লাফ দিয়া চলিয়া যায়। তবে কি সে লোকটিকে ঐরূপ অবস্থায় একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে! না, তা নয়, সে তাহার প্রভুর সন্ধানে গিয়াছে—খুব সম্ভব নিকটবর্ত্তী সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম হইতে কোন সন্ন্যাসীকে ডাকিতে গিয়াছে। সন্ন্যাসী এরূপ ঘটনায় অভ্যস্ত। সে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি লইয়া কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। সেই বিপদাপন্ন পথিকের নিকটে পৌঁছিয়া তাহাকে অতি যত্নের সহিত শীঘ্র সুস্থ করিয়া তুলে। এই উপায়ে আল্পস্ পর্ব্বতে অনেক মুমূর্ষু পথভ্রান্ত পথিকের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে। এই কুকুররা কেমন মহৎ কাজ করে, না?

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী।

চিত্রা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজার অন্তঃপুর

দুপুরবেলা

(রাজা, রাণী ও তাঁর সখী বসে আছেন! অজয় আর মোহন প্রবেশ করে প্রণাম করলেন।)

রাজা। অজয়সিংহ, মোহনলাল, তোমরা আজ সকালে কোথায় কোথায় বেড়ালে?

অ। আমরা বনে গিয়াছিলাম।

রাণী। আমার কাছে এসে বস। বনে কি কি করলে বল;

অ। মা, আমি তারার দেশে যাব। কি করে যাওয়া যায় তাই জান্‌বার জন্য বনে এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়াছিলাম!

রাণী। সে কি অজয়?

রাজা। তারার দেশে কি করে যাবে?

মো। সন্ন্যাসী অজয়কে সব উপায় বলে দিয়েছেন।

অ। মা, আমাকে যেতে দাও। সেখানকার একটি রাজকুমারীকে দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করে আন্‌ব।

রাণী। সে কি হয়? তোমাকে আমি অত বিপদের মধ্যে যেতে দেব না।

রাজা। রাণী, অজয়সিংহ সাহসী ছেলে। দেবতার আশীর্ব্বাদে তার কোন অমঙ্গল হবে না। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী তখন সব উপায় বলে দিয়েছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি; রাজকন্যাকে উদ্ধার কর্‌লে দেশ বিদেশে অজয়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

অ। মা, যেতে অনুমতি দাও।

মো। রাণী মা, কোন ভয় নাই। অজয়কে যেতে দিন।

রাণী। অজয়, তুমি রাজকন্যাকে আন্‌তে যাও। আমি আর বাধা দেব না।

রাজা। এস অজয়সিংহ, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে আসি-গে। রাণী তুমিও চল।

পঞ্চম দৃশ্য

রাত্রি—ফুলের দেশ

(ফুলের রাণী বসে আছেন। অজয়ের প্রবেশ)

ফুলের রাণী—তুমি কে ?

অ—আমি অজয়সিংহ; রাজকুমারী চিত্রাকে উদ্ধার কর্‌তে তারার দেশে যাচ্ছি। আপনার বাগানের সব চেয়ে সুগন্ধি ফুল চাইতে এসেছি।

ফুলের রাণী—তুমি অজয়সিংহ; শুনেছি তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আর বীর রাজপুত্র। এই নাও ফুল।

অ—চিরকাল আপনার দয়ার কথা মনে থাক্‌বে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সকাল বেলা—সমুদ্রতল।

(জলের রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। অজয়ের প্রবেশ)

জ—রা—তুমি কে? কি করে এলে এখানে?

অ—আমি রাজহাঁসের পিঠে উঠে এসেছি। আপনার দেশের সব চেয়ে সুন্দর মুক্তোর মালা নিয়ে রাজকুমারী চিত্রাকে আন্‌তে যাব।

জ—রা—হঁ্যা, সে খবর আগেই পেয়েছি বটে। তুমি নাকি বড় ভাল ছেলে। আচ্ছা এই নাও মুক্তোর মালা।

অ—আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

সপ্তম দৃশ্য

সন্ধ্যাবেলা—তারার দেশ

(প্রহরী ঘুর্‌ছে—দূরে অজয়)

অ—ও কে? প্রহরী বুঝি? এদেশে প্রহরীও বুঝি মেয়েমানুষ। আস্তে আস্তে যাই। দেখে না ফেলে। (প্রহরীকে ফুল শুঁকিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেল্‌ল) প্রাসাদ বোধ হয় অনেক দূর। দেখ্‌তে পাচ্ছি না ত।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ধ্যাবেলা—চিত্রার প্রাসাদ

চিত্রা সুনন্দা, তোমার পৃথিবীতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না?

সুনন্দা—খুব ইচ্ছা করে। জান রাজকুমারী, আমি দৈত্যের মেয়ের কাছে একটা নূতন গান শিখেছি।

চি—গাও দেখি

সু— (গান)

তারার দেশে থাকি মোরা, তারার মালা গাঁথি,
ঝরে পড়া সকল তারা ধরি আঁচল পাতি!
মোদের দেশে সাঁঝ সকালে,
হাজার তারা কিরণ ঢালে।
খেলার বেলায় এরাই আবার হয় যে খেলার সাথী।

চি—বেশ গান ত। সুনন্দা, জানিস্ ভাই, আমি কাল বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি।

সু—কি ভাই?

চি—আমি দেখ্‌লাম এক রাজপুত্র সাদা হাঁসের পিঠে চড়ে আমাকে নিতে আস্‌ছে।

সু—সত্যি বোধ হয় আস্‌বে।

চি—স্বপ্ন কি ভাই সত্যি হয়?—বড় গরম লাগ্‌ছে আর ঘুম পাচ্ছে।

সু—চল, আমি বাতাস করব, তুমি ঘুমিয়ে আবার সেই রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখ্‌বে।

নবম দৃশ্য

সন্ধ্যাবেলা—চিত্রার প্রাসাদ

(চিত্রা ও সুনন্দা ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রতিহারী বসে আছে। অজয় এল।)

অ—প্রতিহারী, আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দাও।

প্র—যাবার হুকুম নাই।

অ—এই দেখ্‌ছ কেমন মুক্তোর মালা? যদি যেতে দাও ত এইটা তোমায় দেব।

প্র—আচ্ছা তাহ'লে যেতে পার।

অ—এই নাও।

(মালা দিয়ে অজয় ঘরে ঢুকে দাঁড়াল)

চিত্রা ঘুমোচ্ছে। কি সুন্দর! স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর!—(কাছে গিয়ে ডাক্‌ল) চিত্রা!

চি—কে? রাজপুত্র তুমি সত্যি এসেছ? না আমি স্বপ্ন দেখছি? সুনন্দা, দেখ কে এসেছে!

সু—ইনি বুঝি তোমার স্বপ্নের রাজপুত্র?

চি—হাঁ। সুনন্দা, আমি স্বপ্ন দেখছি নাত? রাজপুত্র কথা বলছ না কেন!

অ—চিত্রা, তুমি আমায় ডেকেছিলে তাই আমি এসেছি। তোমায় পৃথিবীতে আমার দেশে নিয়ে যাব।

চি—সত্যি! সুনন্দাকেও নিতে হবে কিন্তু তারপর আমাকে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দেবে ত?

অ—তোমার ইচ্ছা হলে যেতে পার। আমি কিন্তু বেশীদিনের জন্য তোমাকে ছেড়ে দেব না। আমি রাজা হলে তোমাকে আমার রাণী করব।

সু—তা'হলে কি চমৎকার হবে।

অ—তোমরা আর দেরী করো না। আমার সঙ্গে এস।

দশম দৃশ্য

রাত্রি।—পৃথিবী—রাজার বাড়ী।

(রাজা, রাণী ও রাণীর সখী গল্প করছেন। মোহনের প্রবেশ)

মো—মহারাজ! আমি আকাশে সেই সাদা রাজহাঁস দেখতে পেলাম। এখনই বোধ হয় অজয় আসবে।

রাণীর সখী—ঐ যে তাঁরা এসে পড়েছেন।

(অজয়, চিত্রা ও সুনন্দার প্রবেশ)

রা—অজয়, এস। মা, তোমরা আমার কাছে এস।

রাজা—ইনি বুঝি রাজকুমারী চিত্রা;—ইনি কে?

অ—ইনি রাজকুমারীর সখী সুনন্দা।

রাণী—অজয়, পথে তোমার কোন বিপদ হয় নি?

অ—না মা, তোমাদের ও দেবতার আশীর্ব্বাদে কোন অমঙ্গল হয় নি।

রাজা—অজয়সিংহ, তুমি আজ আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করলে।

মো—ভাই অজয়, রাজকুমারী চিত্রা কবে আমাদের আপনার হবেন?

রাজা—মোহনলাল রাজ্যের লোকদের আজই জানিয়ে দাও যে সাতদিন পরে অজয়সিংহ ও চিত্রার বিবাহোৎসব হবে।

(মোহনলাল প্রস্থানোদ্যত)

রাণী—আরও বলো যে মোহনলাল ও সুনন্দার বিবাহোৎসবও সেইদিন হবে। এই ফুটফুটে মেয়েটিকে আমরা নিজের করে নিতে চাই।

অ—তাহলে খুব ভাল হয়। মোহনলাল দাঁড়াও। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

চি—মা, আমরা নিজের দেশে একবার যাব।

রাণী—নিশ্চয়ই যাবে। তোমাদের বিবাহের খবর আমি তোমার দেশে এখনই পাঠাচ্ছি। রাজা রাণী সকলেই আস্‌বেন। বিবাহ হয়ে গেলে অজয় আর মোহনলাল তোমাদের নিয়ে যাবে।

রাজা—এস, আমরা আগে দেব-মন্দিরে পূজা দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। মা চিত্রা, সুনন্দা, তোমরাও সঙ্গে এস, দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করবে।

শ্রী সুনীতি দেবী।

বিচিত্র সংবাদ

বিজ্ঞানের বলে কত অদ্ভুত রকমের জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে! কিন্তু প্রকৃতির দান আরও অদ্ভুত! গোয়াটেমলা দেশে এক প্রকার গাছ আছে; সেই গাছ হইতে দুধ পাওয়া যায়। দুধের সকল গুণই তাহাতে আছে! দুধ যেমন বাসি হইলে খারাপ হয় বা টক লাগিলে কাটিয়া যায় তাহাও অবিকল সেইরূপ। সেই দেশের লোক চা, কাফি প্রভৃতিতে এই দুধ ব্যবহার করে। ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা!

* * *

আজকাল সকল জিনিষেরই প্রতিযোগিতা চলিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কে তাহারও একটি এইরূপ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। নিজ নিজ দেশে বিখ্যাত সুন্দরীগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এফ, এল, গল্ডারবীটার নামে একটি অষ্ট্রীয়া দেশের মহিলা প্রথম হইয়াছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-জগতের রাণী বলিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ঐ পৃথিবী আমাদের ভারতবর্ষ ছাড়া। ভারতের কোন নারী প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নাই, তাহা ভালও মনে করেন না।

* * *

তোমরা নিশ্চয়ই "এরোপ্লেন" বা "নবযুগের পুষ্পকরথ" দেখিয়াছ। ভারতের মাত্র দুই চারি জন লোক এই পুষ্পকরথ চালাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত

পি, এম, কাবালী প্রথম বৈমানিক। তিনি লণ্ডন হইতে এরোপ্লেনে চড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন। ভারতের নারীদিগের মধ্যে শ্রীমতী এফ, ডি, পেটিট সর্ব্বপ্রথম একাকী বিমান চালনা করে। তিনি বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ বণিকের পুত্রবধূ।

বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বি, কে সিংহ ও জে, পি, গাঙ্গুলী ঐ কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন।

* * *

ভেটিক্যানে একখানি বাইবেল (খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র) আছে, তাহার ওজন প্রায় চার মণ। কি আশ্চর্য্য !

রেল-স্টেশনে আসিলেই ত আর গাড়ী আসে না ! আরও বিশেষ করিয়া বড় বড় ষ্টেশনে যাত্রীদিগকে অনেক সময় বহু ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। পাছে যাত্রীদিগের ইহাতে কোনরূপ কষ্ট হয় সেই জন্য লণ্ডনের ষ্টেশনগুলিতে রেলের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামোফোন শুনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশের গাড়ীগুলিতে বসিবারই স্থান পাওয়া যায় না। হায় রে বাঙ্গালীর অদৃষ্ট !

* * *

বোষ্টন সহরে একজন মহিলা আছেন। তাঁহার মুখের দক্ষিণ দিক দেখিলে মনে হয় তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর, আর বাম দিক দেখিলে মনে হয় যেন ৩০ বৎসরের যুবতী। অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা এইরূপ হইয়াছে। এইজন্য ঐ মহিলাটির অনেক টাকা খরচ হইয়াছে এবং সময় লাগিয়াছিল প্রায় দশ বার দিন। তোমাদের কি কাহারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হয় ?

দিনে দিনে কতই হবে ! খাবারের যত অভাব হইতেছে ততই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন প্রকারের খাবার আবিষ্কার করা হইতেছে। লিভারপুলের একজন অধ্যাপক (ডাক্তার বেলী) রৌদ্র হইতে চিনি বাহির করিয়াছেন। এই আবিষ্কারে সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নয় ! একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক (ডাঃ ফ্রেডরিক) কাঠ হইতে খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন ! এই খাদ্য এখন গো-মহিষ প্রভৃতির আহারের জন্য হইয়াছে। তিনি বলেন চেষ্টা করিলে মানুষের খাবারও কাঠ হইতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। ডাঃ ফ্রেডরিক বার্জ্জিয়স আরও বলিয়াছেন যে, খড় হইতেও এইরূপ খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। কাগজ, নকল রেশম প্রভৃতিও খড় হইতেই প্রস্তুত হইবে।

বিজ্ঞানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞানের কথা জানিতে হইলে তাহার ভাষা শিখিতে হয়। এখন তোমরা তবে তাহার দুই একটি ভাষা শিখ। যদি তুমি একটি নূতন দেশে বেড়াইতে যাও, সে দেশের ভাষা না জানিলে সেখানকার কিছুই তুমি জানিতে পারিবে না। সেইরূপ বিজ্ঞানের কথা জানিতে হইলে তাহার ভাষা শিখিতে হইবে।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানের এই কথা-

গুলি জান। কঠিন (Solid) দ্রব্য বলিলে কি বুঝায় তাহা তোমরা জান। যেমন এই টেবিলের কাঠ দেখাইয়া তোমরা বলিবে যে ইহাই কঠিন দ্রব্য। তরল (Liquid) পদার্থ বলিলে কি বুঝায় বল ত ? তোমরা বলিবে, জল একটি তরল পদার্থ। গ্যাস (Gas) বলিলে কি বুঝায় তাহাও তোমরা জান। কিন্তু এই তিন প্রকার পদার্থের স্বভাব কি, তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কি আছে তাহা হয়ত তোমরা জান না।

এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। কঠিন পদার্থসমূহের মধ্যে এই অণুগুলি এত দৃঢ়রূপে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ আছে যে তুমি যদি একটি কঠিন পদার্থের আকার বদলাইয়া ফেলিতে চাও তাহা হইলে জোর করিয়া তাহার অণুগুলিকে ছিঁড়িয়া আলাদা করিতে হইবে। আমি এই সোজা কাঠখানাকে ভাঙ্গিয়া কিংবা বাঁকাইয়া ফেলিলাম। এই যে কঠিন পদার্থ কাঠখানার আকার অন্যরূপ হইল, ইহাতে এই কাঠের অণুগুলির মধ্যে একটি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইহার অণুগুলিকে জোর করিয়া পরস্পরের চারিদিকে নড়াইতে হইল এবং তাহা করিতে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইল। কিন্তু তরল পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের সহিত আলগাভাবে সংবদ্ধ থাকে বলিয়া অতি সহজেই তাহার আকারের পরিবর্ত্তন করা যায়। যেমন একটি বাটি হইতে এই টেবিলের উপর জল ঢালিয়া দিলাম, তাহাতে জলের বাটির আকার বদলাইয়া টেবিলের উপর চওড়াভাবে ছড়াইয়া গেল। তরল পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের চারিদিকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় বলিয়া সহজেই তাহার আকারের পরিবর্ত্তন করা যায়।

কিন্তু গ্যাসের এই অণুগুলি পরস্পরের হইতে কেবলি ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে চায়। তাহারা একেবারেই পরস্পরের সহিত আবদ্ধ নহে। তুমি যদি খুব শক্ত করিয়া গ্যাসকে কোন পাত্রে আবদ্ধ করিয়া না রাখ তাহা হইলেই দেখিবে এক মুহূর্ত্তে গ্যাস ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই তিন প্রকার পদার্থের বিভিন্নতা কোন খানে তাহা বলিতেছি, শুনিয়া রাখ।

কঠিন পদার্থের আকার ও পরিমাণ, জোর করিয়া পরিবর্ত্তন না করিলে সেইরূপই থাকে।

তরল পদার্থকে যদি মুক্ত (Free) করা যায় তবে তাহার পরিমাণ সেইরূপই থাকিবে, কিন্তু আকার বদলাইয়া যাইবে।

বাষ্পীয় (Gas) পদার্থ ছাড়িয়া দিলে তাহার আকার ও পরিমাণ দুই-এরই পরিবর্ত্তন হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। এই সব বিষয় তোমরা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

তারপর তোমরা রাসায়নিক আকর্ষণ (chemical attraction) কাহাকে বলে তাহা জানিয়া রাখ। আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই রাসায়নিক আকর্ষণের ব্যাপার তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। কিন্তু তোমরা নিজেরাও রাসায়নিক আকর্ষণের নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

আমি যদি একবাটি জলে চিনি গুলিয়া দি তাহা হইলে এই চিনি তখনি জলের সহিত মিশিয়া যাইবে ; কিন্তু চিনির কোনো পরিবর্ত্তন হইবে না, চিনি অবিকৃতরূপেই জলের মধ্যে থাকিবে। চিনি জলে গুলিয়া দিলে তাহা যে অবিকৃতই রহিয়া গেল তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে। এই চিনিগোলা জল শুকাইয়া ফেলিলেই দেখা যাইবে যে বাটির তলায় চিনি যেমন দিয়াছি ঠিক তেমনি রহিয়াছে। সুতরাং এখানে কোনো রাসায়নিক আকর্ষণের কাজ হয় নাই।

এখন রাসায়নিক আকর্ষণের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এই দেখ আমার হাতে পোটাসিয়ম্ (Potassium) নামক ধাতুর এক টুকরা রহিয়াছে। পোটাসিয়ম্ একটি অবিকৃত ধাতু অর্থাৎ ইহাকে ভাঙ্গিয়া অন্য কোনো পদার্থে পরিণত করা যায় না, ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একইভাবে পাওয়া যায়। এখন আমি এই পোটাসিয়মের টুকরাটি এই একবাটি জলের উপর রাখিয়া দিলাম। দেখ, চিনি যেমন জলে দিবামাত্র জলের সহিত মিশিয়া গেল, পোটাসিয়ম সেরূপ হইল না, কিন্তু জলের উপর ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া কেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর তার চারিদিকে একটা নীল রঙের আলো জ্বলিতেছে। এইরূপে একটু জ্বলিবার পর একটা শব্দ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কেন এইরূপ হইল ? এখানে কি কি ঘটিল ?

তোমাদের প্রথমেই জানিয়া রাখা দরকার যে যবক্ষারজান (Hydrogen) এবং অম্লজান (Oxygen) নামক দুইটি উপাদানের মিশ্রণে জল তৈয়ারি হইয়াছে। জলের এই দুইটী উপাদান যে জলের মধ্যে শুধু পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ আছে তাহা নহে, ইহারা এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব নাই, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। জলের প্রত্যেক যবক্ষারজানও অম্লজানের দুইটি অণু দ্বারা নির্ম্মিত।

পোটাসিয়ম্ ধাতু অম্লজানকে খুব ভালবাসে। যে মুহূর্ত্তে আমি ইহাকে জলের উপর ফেলিয়া দিলাম, সেই মুহূর্ত্তে ইহা তাহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য "রাসায়নিক আকর্ষণ" নামক অদৃশ্য পরীকে আহ্বান করিয়া এবং ইহার সাহায্যে জলের অম্লজানের অণুগুলিকে টানিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া ফেলিল। এই অম্লজানের অণুগুলিকে টানিবার সময় জলের মধ্যে যে যবক্ষারজানের অণু আছে তাহারও অর্দ্ধেক অংশ টানিয়া লইয়া ইহার সহিত মিশাইয়া ফেলিল। তারপর পোটাসিয়ম্ ও অম্লজান মিলিত হইয়া ও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া এমন একটা তীব্র তাপ উৎপন্ন করিল যে জলের মধ্যে যে আর অর্দ্ধেক যবক্ষারজান পড়িয়াছিল তাহাও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া যে সঙ্গীকে হারাইয়াছে তাহাকে আবার পাইবার জন্য বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। এই বাতাসে সে অম্লজানকে (বাতাসের মধ্যেও অম্লজান আছে) পাইয়া তাহাকে এমন ভীষণ বেগে ও জোরের সহিত ধরিয়া ফেলিল যে তাহারা উভয়ে মিলিয়া অগ্নিরূপে জ্বলিতে লাগিল। আর এদিকে পোটাসিয়ম্ ধাতু, অম্লজান ও যবক্ষারজানের সহিত মিলিয়া পটাস্ নামক অন্য একটি পদার্থে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। বাটির নীল জলের তলায় আমরা পটাস্ নামক নূতন পদার্থ পাইলাম। (পটাস্—কাষ্ঠ ভস্মের ক্ষার।) তাহা হইলে তোমরা দেখিলে যে "রাসায়নিক আকর্ষণ" দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতির অণুগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি নূতন পদার্থে পরিণত হইল।

তোমরা যদি মনে মনে এই "রাসায়নিক আকর্ষণ" নামক অদৃশ্য শক্তির বিষয় ধারণা করিতে পার ও বুঝিতে পার তাহা হইলে দেখিবে যে ইহার সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনার অনেক বিষয় যাহা তোমরা বইতে পড়িবে ও চারিদিকে দেখিবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

তারপর আরো কতকগুলি বিষয় তোমাদের জানা দরকার।

তোমাদের চারিদিকেই তোমরা গাছপালা

দেখিতে পাও। এই গাছপালা পৃথিবীর কত কাজে লাগে। সুতরাং তোমরা গাছপালার বিষয়ও জানিতে চেষ্টা করিবে। গাছপালা সব কেমন করিয়া বাড়ে, কেমন করিয়া বাঁচে, কিরূপে ইহাদের বীজ জন্মায়, ফুলের বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি কিরূপ, তাহাদের নাম কি—এই সব তোমরা জানিবে। তাহা হইলে উদ্ভিদ-জগতের আশ্চর্য্য তত্ত্ব সকল জানিয়া তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে।

তোমরা জীবজন্তুর এবং তোমাদের নিজের দেহের বিভিন্ন অংশের নাম তাহাদের কার্য্যে ও নির্ম্মাণ কৌশলের বিষয় জানিবে। তুমি কেমন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লও, কিরূপে তোমার দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়; কিরূপে কোন প্রাণী পায়ে হাঁটিয়া বেড়ায়, কোন প্রাণী উড়িয়া বেড়ায় এবং আর কোন প্রাণী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায় তাহার তত্ত্ব জানিবে।

তোমরা এই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিষয় জানিয়া রাখিবে। নদী, সমতল ভূমি, উপত্যকা, বদ্বীপ প্রভৃতি কাহাকে বলে, তাহাদের রূপ কিরূপ তাহা শিখিবে।

এই সকল বিষয় শিখিয়া তোমরা যদি চক্ষু ও কর্ণ খুলিয়া রাখিয়া এ পৃথিবীতে বেড়াও তাহা হইলে সর্ব্বদা কত নূতন তত্ত্ব জানিয়া তোমরা পুলকিত হইবে। তাহা হইলে তোমরা যেখানে যাইবে সেইখানেই দেখিতে পাইবে যে ;—

"বৃক্ষ কথা কবে, প্রস্তরেতে উপদেশ,
কুলু কুলু নাদে নদী দিবে মহাজ্ঞান,
খুলে যাবে দিব্য দৃষ্টি, দেখিতে পাইবে তুমি,
বিধাতার মঙ্গলের রাজ্য চারিধার।"

তোমরা প্রকৃতিকে ভালবাসিতে শিখিবে। শিশু যেমন তাহার মার প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সেই মুখকে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মুখ মনে করে সেইরূপ তোমরা বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিবে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইবে, প্রকৃতিকে ভালবাসিবে; তাহা হইলে এই বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি যাহা প্রকৃতির গূঢ় রহস্য সব খুলিয়া দেয়। পরম আনন্দের সহিত জানিতে চাহিবে ও নূতন নূতন তত্ত্ব নিজেরা বাহির করিয়া শিখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী কুমুদিনী বসু

নীতি কথা

৺লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। মূল্য ।৵০

ভবিষ্যত জীবনে যাঁহারা স্বীয় জীবনকে মহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদের চরিত্রের ভবিষ্যৎমহত্বের বীজ বাল্যের ক্রীড়ার মধ্যে প্রথিত হইয়াছিল। বাল্যকালে যাহা একবার শুনি বা শিখি, তাহা জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির হইয়া অচল ও অটল থাকে অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে। সেই জন্য নীতির আদর্শ বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকখানি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সরল ভাষা এবং লিপিকুশলতায় বইখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দৈনিক

৺লাবণপ্রভা সরকার প্রণীত

মূল্য ১৲

দৈনিক ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থে বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

"দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায্যের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা ভক্তির আলোচনা একটী প্রধান সহায়। সুতরাং আমার আশা হয় যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেই বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।"

"দৈনিক সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পাঠের যোগ্য, ইহাতে কোন সম্প্রদায়িক ভাব নাই। ইহা ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী রচনার লালিত্য ও ভাষার মাধুর্য্যে প্রচারগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

ভাই বোন

শিশুদিগের পাঠোপযোগী গল্পের বই ইহাতে ভাই বোনের যে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র স্নেহের ধারায় সংসার শিক্ত ও আমাদের প্রত্যেকের শৈশব মধুময় হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার এই অখ্যায়িকায় বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন। শিশুমহলে বইখানি অত্যন্ত আদরণীয়।

মাতা ও পুত্র

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত মূল্য ।৵০

বালকবালিকাদিগের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক গল্পের বই। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি এত করুণ যে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয় অশ্রুজলে সিক্ত করে। যাঁহারা এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে ইহা সুকুমার হৃদয় বালিকাদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে মাতার উচ্চ আদর্শ, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের অতুলনীয় চরিত্র, বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সকল নীতি গল্পচ্ছলে দেখান হইয়াছে।

মুকুল কার্য্যালয়ের ঠিকানা

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

পত্রাদি সম্পাদিকার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন :—

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲

প্রতি সংখ্যা ৷৴০

দ্বিতীয় বর্ষ

৫ম সংখ্যা

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচপত্র

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাক টিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার :—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৷৹, ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলের রাণী

মুকুল

সোণার খনির সন্ধানে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ সোণার খনির সন্ধানে বাহির হইয়া দিনের পরে দিন চলিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সে দেখিল, তাহার সম্মুখেই হিমালয় পর্ব্বত যেন আকাশে মাথা ঠেকাইয়া, সমস্ত দেশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেশ সেই পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে কি

ভীষণ জঙ্গল! কত জানোয়ার যে সেই জঙ্গলে বাস করে, তাহা কে বলিবে? সুরেশকে সোণার খনির নেশায় ধরিয়াছিল, তাই সে মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করিয়া, এক পাহাড়ের উপর হইতে আর এক পাহাড়ের উপরে এবং এক জঙ্গল হইতে আর এক জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুরেশ চলিতে চলিতে এক অসভ্যদের দেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সম্মুখেই কি ভয়ানক দৃশ্য! সেখানে ছোট ছোট দুইটী অসভ্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। সুরেশ পাহাড়ের এক জঙ্গলের ভিতরে লুকাইয়া সেই আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। এক এক দলে প্রায় দুই দুই হাজার লোক তীর ধনুক হাতে লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। কি চমৎকার অসভ্যদের তীর নিক্ষেপ! চোখের পলকে শত শত তীরন্দাজ ধনু হইতে বিষ-মাখানো তীর শত্রুদের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতেছে। সেই তীরের আঘাতেই অনেক লোক পাহাড়ের উপরে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আমরা আগেই বলিয়াছি, সুরেশ এক সময়ে পাহাড়ীদের কাছে তীর ধনুকের যুদ্ধ শিখিয়াছিল। সেইজন্যই আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার মনে ভয় যে কিছু কম ছিল, তাহা নয়।

কয়েক ঘণ্টা পরেই একদল অসভ্য হারিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল; আর একদল অসভ্য অনেকগুলি শত্রুকে বন্দী করিল। তাহার পরে অসভ্যেরা ভীষণ চীৎকার করিয়া বন্দীগুলিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। সুরেশও জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইল। সে একটি জায়গায় গিয়া বড় বড় গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু তার একটু দূরেই কি ভয়ানক দৃশ্য! অসভ্যগণ বন্দীদের এক একটি গাছের সঙ্গে হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহারা দূর হইতে বন্দীদের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়িবে, আর ঐ সকল হতভাগ্য লোক যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মারা যাইবে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সুরেশ কেমন করিয়া দেখিবে?

সুরেশ বন্দীদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। সে খুব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া অসভ্যদের সাম্‌নে দাঁড়াইল। সুরেশ এখনো পাহাড়ীদের ভাষা ভুলিয়া যায় নাই। তাই সে অসভ্যদের ভাষায় কহিল, "তোমাদের কি মনে আছে, এই পাহাড়ে এক সন্ন্যাসী ছিলেন? তিনি এদেশের বিস্তর উপকার করেছেন। এ-দেশে এমন কোন্ অসভ্য রাজা আছে যে, তাঁকে গুরু বলে মান্য করত না? সেই সন্ন্যাসীই আমাকে সন্তানের মতন মানুষ করেছেন। তিনি এখন পরলোকে। আমি আজ তাঁর নাম করে বল্‌ছি, তোমরা এই বন্দীদের নির্দ্দয়ভাবে হত্যা না করে, বন্দী করেই রাখ। হত্যা কর্‌লে এই কথা ইংরাজ সরকারের কাণে যাবে, তা' হলেই তোমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাক্‌বে না। হয়ত ইংরাজ সরকার তোমাদের রাজ্যটুকুই কেড়ে নেবেন।"

অসভ্যেরা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে ইংরাজের গুপ্তচর? তবে ত আগে তোমাকেই মেরে ফেল্‌তে হবে।"

অসভ্যগণ ঐ কথা বলিয়াই সুরেশকে ধরিয়া একটি গাছের সঙ্গে বাঁধিল। তাহার পরে তাহারা চারিদিকে দাঁড়াইয়া, সুরেশেরই গায়ে বিষাক্ত তীর ছুড়িয়া মারিবার জন্য, তীর ধনুক হাতে লইল। সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, "করুণাময় ঈশ্বর, সকল বিপদ হতে তুমিই আমাকে রক্ষা করেছ, আজ তুমি ছাড়া আর কে আমাকে রক্ষা করবে? আমি তোমারই দয়া ভিক্ষা কর্‌ছি।"

এই সময়ে কোথা হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী

সন্ন্যাসিনী আসিয়া সুরেশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আলোকে মণ্ডিত। তাঁহার পরণে গৈরিক বস্ত্র, হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। তিনি আকাশ কম্পিত করিয়া "জয় জগদীশ্বর" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অসভ্যের দল ভয়ে ভীত হইয়া সন্ন্যাসিনীর পানে চাহিয়া রহিল। তিনি তেজের সঙ্গে তাহাদিগকে কহিলেন, "এখনি তোমরা এখান হতে ছুটে আপনার আপনার ঘরে চলে যাও, নইলে তোমাদের বিপদ ঘনায়ে আস্‌তে আর বড় বেশী বিলম্ব হবে না।"

অসভ্যেরা এই সন্ন্যাসিনীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করে। তাই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসিনী সুরেশের এবং হতভাগ্য বন্দীদের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। বন্দীগণ পলাইয়া গেল। সুরেশ সন্ন্যাসিনীর স্নেহমাখা মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "মা, আপনি কে? স্বয়ং ঈশ্বরই কি আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে এই পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "এস পুত্র, নিকটেই আমার মন্দির। সেই মন্দিরে এসে বিশ্রাম কর।"

সন্ন্যাসিনী সুরেশকে সঙ্গে লইয়া একটি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ চমকিয়া উঠিল। এই মন্দিরেই ত সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাস করিত। এখনো ত মন্দিরের গায়ে তাহার হস্তাক্ষর রহিয়াছে। ঐ যে লেখা আছে, "সুরেশ—সুহাসিনী—নির্ম্মলা!"

সন্ন্যাসিনীই এখন এই মন্দিরে বাস করেন। তিনি সুরেশকে দুধ আর ফল খাইতে দিলেন। ইহা খাইয়া সে সুস্থ হইল। তখন সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "তুমি কে? কোথা হইতে কেমন করে এখানে এলে?"

সুরেশ। মা, আমি একদিন পিতৃমাতৃহীন হয়ে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই মন্দিরেই ছিলুম। আপনি কেমন করে এখানে এলেন? আপনার সব কথা শুন্‌বার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

সন্ন্যাসিনী। কে বল্‌বে, তোমার মুখ দেখে কেন আমার স্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌ছে? মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে যেন কত কালের কি একটা সম্পর্ক আছে। আমি তোমাকে খুব সংক্ষেপে আমার জীবনের কাহিনী বল্‌ছি। আমার স্বামী ডিব্রু-গড়ের বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি নৌকায় আমাকে এবং সন্তানদের নিয়ে সোণার খনির সন্ধানে যাচ্ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদীতে ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হল। তাই আমাদের নৌকা ডুবে গেল। আর সকলেই জলে ডুবে মর্‌লেন, শুধু আমিই কোলের মেয়ে নিয়ে বেঁচে রইলুম। তার পরে একটি অসভ্যদের রাজ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল। সেখানে দুঃখে দুশ্চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমি দুটি কন্যাকে সেই পাহাড়ে ফেলে, পাগল হয়ে, এক রাত্রে জঙ্গলে ঢুকে পড়্‌লুম। জামি না, কেন বনের জানোয়ারের আমার রক্ত খেতে ইচ্ছা হল না। আমি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক অসভ্যদের রাজ্যে উপস্থিত হলুম। তারা আমাকে উন্মাদ দেখে, বেঁধে রাখ্‌লো। সেইখানেই এক বৎসর কেটে গেল। অবশেষে কোথা হতে এক সন্ন্যাসী এসে পড়লেন। তাঁর ওষুদেই আমার অসুখ ভাল হয়ে গেল। হায়, আমি অভাগিনী, আমার কুটীরে ফিরে গিয়ে, দুটি মেয়েকে আর দেখ্‌তে পেলুম না। সেই হতেই আমি মনের দুঃখে সন্ন্যাসিনী। এই মন্দিরে থেকেই ঈশ্বরের নাম করি।"

সুরেশ আর থাকিতে পারিল না, সে সন্ন্যা-সিনীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "স্নেহময়ী মা আমার, পুণ্যময়ী মা আমার, আমি সোণার খনির

সন্ধানে বের হয়েছিলুম, কিন্তু তোমাকে পেয়ে যা লাভ কর্‌লাম, তার কাছে শত সোণার খনিও অতি তুচ্ছ সামগ্রী। রাখ মা, একবার তোমার স্নেহহস্ত আমার বুকের উপরে রাখ, জীবনে যত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, তার স্মৃতি আজ হৃদয় হতে মুছে যা'ক। রাখ মা, তোমার কল্যাণ হস্ত একবার আমার মাথার উপরে রেখে আশীর্ব্বাদ কর। আমার জন্ম আজ সার্থক হো'ক।

সন্ন্যাসিনী বুঝিতে পারিলেন, এই সুরেশ। তাঁহারই প্রাণাধিক পুত্র। তাই তিনি আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, স্নেহে পূর্ণ হইয়া, সুরেশের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র আমার, পরম স্নেহের পাত্র আমার, ঈশ্বর আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে, তোমাকে কি স্বর্গ হতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন? তোমাকে কি যথার্থই আমি কাছেই দেখতে পাচ্ছি, না এ আমার স্বপ্ন?"

সুরেশ। না মা, স্বপ্ন কেন হবে? এ যে সত্য। তোমার অতি ভালবাসার সুরেশই এখন তোমার সম্মুখে। শুধু আমাকে নয়, মা আমার, তুমি যে সুহাসিনী, নির্ম্মলা, সরযূ সবাইকেই দেখ্‌তে পাবে।

মা। বল কি সুরেশ! তারা কি বেঁচে আছে? তুমি কোথায় তাদের দেখ্‌লে? কেমন করে তাদের সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা হল?

সুরেশ মাতার কাছে আপনার এবং সরলা, নির্ম্মলা ও সরযূর সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিল। তখন মাতার প্রাণে যে অনুপম আনন্দ, তাহা কে বর্ণনা করিবে?

সুরেশ মাতাকে লইয়া মনের আনন্দে ডিব্রুগড় যাত্রা করিল।

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

ক্রমশঃ

ফিন দেশ

কিছুদিন আগে আমি তোমাদের রাশিয়ার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। আজ আবার তোমাদের অন্য একটী দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বসিয়াছি। ফিনলণ্ডের বিষয় তোমরা অনেকেই হয়ত বিশেষ কিছু জান না। খুব সংক্ষেপে ঐ দেশটীর সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা করাইতে চাই।

ফিন্ দেশ রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে অবস্থিত। এই দেশটীই রাশিয়া ও সুইডেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার আয়তন বড় নয়, মোটামুটী ধরিতে গেলে বলা যায় ১৩২,৫০০ বর্গ মাইল লইয়া এই দেশটী গঠিত হইয়াছে। ইহার আর একটী সুন্দর নাম আছে—(Land of Thousand Lakes) অনেকে ইহাকে সহস্র লেকের দেশ বলে। কারণ এই দেশটীর মধ্যে লেকের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু এই দেশের অর্দ্ধেকটাই আবার জঙ্গলে আবৃত। এই সকল জঙ্গলে অনেক মূল্যবান কাঠ ও নানাপ্রকার জীবজন্তু পাওয়া যায়। হরিণ ও ভাল্লুকের সংখ্যাই বেশী, নেকড়ে চিতা ও নানা রকম পাখীও যথেষ্ট।

ফিন্ দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব সুন্দর। জলহাওয়া খুব ভাল, শীতকালে অসহ্য শীত না আবার গ্রীষ্মকালেও খুব গরম নয়। দেশটী যেন

ফুলের রাজ্য। শীতের পরে গরমের সঙ্গে সঙ্গে যখন সহস্র রকমের ফুল ফুটিয়া ওঠে, তখন দেশটাকে স্বপ্নরাজ্যের মতন মনে হয়।

তোমরা এদেশে গোধূলির আলো দেখিয়াছ। গোধূলির আলো কাহাকে বলে তাহাও জান। আমাদের দেশে এই গোধূলির আলো বেশীক্ষণ থাকে না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ফিনলণ্ডে এই আলো প্রায় সমস্ত রাত থাকে। এই স্নিগ্ধ সুন্দর আলো যখন এই ফুলের দেশে পতিত হয়, তখন সমস্ত দেশটাকে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করে তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখ। কিন্তু এমন যে সুন্দর দেশ তাহার লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে খুবই কম। সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩,৩০০,০০০ লোক ইহার অধিবাসী। ইহারা দেখিতে সাধারণতঃ লম্বায় একটু ছোট কিন্তু মোটা। ইহাদের মুখ খুব সুশ্রী। উঁচু নাক উজ্জ্বল চক্ষু সমস্ত মুখখানাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া রাখে। তাদের স্বভাবটা কি রকম তোমাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না? এমন যে সুন্দর দেশ তার অধিবাসীদের স্বভাব কখনও খারাপ হতে পারে? কারণ তোমরা জান সে বিভিন্ন প্রকার জলহওয়া ও বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য, মানুষের জীবনের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে। এককথায় তোমাদের বলি ইহারা সদালাপী, সৎপ্রকৃতি, অতিথিবৎসল ও দয়ালু। তাদের প্রকৃতি গম্ভীর কিন্তু তা বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিতে ভালবাসে না। তাদের প্রধান আমোদ হচ্ছে নৃত্য ও গীত। গ্রীষ্মকালে খোলা মাঠে তারা নাচগানের প্রতিযোগিতার পর নানাপ্রকার আমোদজনক ক্রীড়া-কৌতুক করে। শিশুকাল হইতেই এই সকল নাচগান ও খেলাধূলায় তারা যোগ দেয়। ফিন দেশের লোকদের চরিত্রের প্রধান গুণ যে তাহারা স্বাধীনচেতা ও জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী। তোমাদের এই শেষ কথাটী তেমন মনের মতন হইল না—না? লোকে জোর করে পড়তে না বসালে নাকি কেউ আবার পড়ে? শুধু খেলতে খেতে আর ইচ্ছামত ঘুমুতে পারলে আর ভাবনা ছিল কি?

কিন্তু ফিনলণ্ডের লোকেরা শুধু খেলতেই ভালবাসে না। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বালক হইতে শ্বেত শুভ্র বৃদ্ধ পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যস্ত।

তাহারা কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সকল লোক চাষ করে অথবা অন্য রকম শারীরিক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জ্জন করে তাদের জন্য শীতকালে স্কুল খোলা হয় কারণ তখন শীতের জন্য ঐ সকল কাজ প্রায়ই বন্ধ থাকে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুস্তক হস্তে স্কুল বা কলেজে যাইতেছে, এদৃশ্য ফিনলণ্ডে খুবই দেখা যায়।

ফিনদেশবাসী লোকেরা খুব সত্যবাদী, তাদের কথার কখনও নড়চড় হয় না। একবার কিছু অঙ্গীকার করিলে প্রাণপণে তাহা পালন করে। তাদের সাধুতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা তোমাদের বলিতেছি।

রুষদেশবাসী একজন লোক তাদের সাধুতা পরীক্ষা করিবার জন্য ফিন্ দেশে যায়! সেখানে যাইয়া সে একটী হোটেলে চা পান করে এবং ফিরিবার সময় সেই ঘরের এক কোণে ছাতাটী ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া যায়। প্রায় এক বৎসর পরে সে আবার সে হোটেলে আসিয়া ছাতাটীর খোঁজ করে। সে দেখিতে পাইল যে ছাতাটী এক বৎসর পূর্ব্বে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল আজও ঠিক সেই অবস্থায় সেইখানেই দাঁড়করান আছে। অন্যের জিনিষ ফিনলণ্ডের লোকেরা কখনও নেয় না। তোমরা প্রথম ভাগে পড়িয়াছ "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়"। ফিন্‌দেশের লোকেরা কেমন বুদ্ধিমান দেখ, তোমাদের সেই প্রথম ভাগটী

না পড়িয়াই এই নীতি বাক্যটী শিখিয়া লইয়াছে। ফিনদেশের লোকদের আরও একটী মস্ত গুণ যে তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত কাজই তাহারা খুব সুশৃঙ্খলার সহিত করিতে চায়। তাহাদের বাসগৃহ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন —কোথাও বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নাই।

এই দেশের লোকেরা কাঠের তৈয়েরী বাড়ীতে বাস করে। এই বাড়ীগুলির চারিদিকের প্রাচীর গুলিতে লাল রং দেওয়া হয়; তাহাতে বাড়ীগুলি দেখিতে ঠিক ছবির মতন মনে হয়।

ফিনদেশের লোকেরা খুব স্বদেশভক্ত, এবং তাহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাসও খুব বেশী।

একবার একজন ইংরাজ ঐ দেশের একজন স্কুলের শিক্ষককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনাদের দেশ ত ছোট, জনসংখ্যাও কম, রুশিয়ার লোকেরা যদি আবার এদেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেশ রক্ষা করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" সেই শিক্ষক তখন সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন—"আমাদের দেশ রক্ষা করিবার মতন শক্তি আমাদের আছে, কারণ আমাদের দেশজোড়া কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হইতেছে"। ইংরেজটী তখন বলিলেন, "আপনাদের সেই বৃহৎ কারখানাটী আমাকে একবার অনুগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারেন?" ফিনদেশীয় শিক্ষকটী তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া একটী প্রকাণ্ড গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেটী একটী স্কুলগৃহ, তখন দলে দলে ছেলেরা বই হাতে আসিতেছে। তিনি তাঁহার সঙ্গী ইংরাজটীকে বলিলেন, "এইটী আমাদের কারখানা আর ঐ সকল বালক আমাদের অস্ত্রশস্ত্র"।

যাঁদের মধ্যে মনের শক্তি এত অধিক তাঁরা কি কখনও পরাধীন থাকিতে পারে?

ফিনদেশ প্রথমে সুইডেনের পরে রাশিয়ার পরাধীন ছিল; কিন্তু এখন তাহারা নিজেদের দেশকে স্বাধীন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সে দেশে প্রত্যেককে নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিতে হয়। মেয়েদেরও ছোট বয়স হইতে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যে পরে যেন সে স্বাধীন স্বাবলম্বী হইতে পারে। সেখানে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে কাল কাটান অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। সেখানে স্কুলের শিক্ষা শুধু বইয়ের উপর নির্ভর করে না। এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় কোমলমতি শিশুদের অন্তরের সকল বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া তাহাকে সংসারের পথে চলিবার উপযুক্ত করিয়া তোলে। এ-ভাবে শিক্ষা পায় বলিয়াই তাহারা তাহাদের দেশকে এত শীঘ্র উন্নত ও স্বাধীন করিতে পারিয়াছে। তোমাদের আগেই বলিয়াছি যে ফিনদেশের লোকেরা প্রধানতঃ জ্ঞানচর্চ্চা করিতে ভালবাসে। তোমরা সেখানে গেলে দেখিতে পাইবে সব সহরে এমন কি সুদূর গ্রামের মধ্যেও ভাল ভাল পুস্তকের দোকান আছে।

এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে একবার একটু বলিব। এদেশের মেয়েরা ঠিক সে দেশের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সমান উন্নতি করিয়াছেন। ফিনের মেয়েরা আইনব্যবসায়ে, সরকারী উচ্চপদে এমন কি ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগেও পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। সেখানে মেয়েরাও আত্মনির্ভরশীলা—পিতামাতা এমন কি স্বামীর উপরও নির্ভর করিতে তাঁরা চান না।

এমন সে স্বাধীনচেতা জাতি তাহাদের কি কেউ বেশী দিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

তোমাদের এতক্ষণ কেবল এঁদের গুণের দিকটাই দেখাইয়াছি। এবার এদের একটী দোষের কথা

বলিব। এঁদের মধ্যে যারা গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যে এখনও অল্প অল্প কুসংস্কার আছে। এর একটী উদাহরণ দিচ্ছি—এরা যদি কখনও কোন মালী বাড়ীতে যায়, তাহা হইলে বাড়ীতে প্রবেশ করিবার আগে সেই মালী বাড়ীটার উদ্দেশে শুভসম্ভাষণ জানায়। কারণ তাদের বিশ্বাস যে মালী বাড়ীতে ভূত কিম্বা অন্য কোন অপদেবতা বাস করে, তাকে সম্ভাষণ না করিলে সে তার অশিষ্টাচারে বিরক্ত হইয়া তাহার ক্ষতি করিবে। কিন্তু সুখের বিষয় এখন এই সকল কুসংস্কার অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

আমি মোটামুটিভাবে তোমাদের এই সুন্দর অধীন জাতির বিষয় বলিলাম। এখন যদি তোমরা আবার এই লেখাটী পড়িয়া ইহাদের গুণগুলি গ্রহণ করিতে পার তবেই আমার লেখা ও তোমাদের পড়া সার্থক হইবে।

শ্রী নলিনী দীন্দা বি, এ

অতি-পুরাতন কাহিনী

আমরা কে না গল্প শুনিতে ভালবাসি? ছেলেবেলায় ত সকলেই ঠাকুরমার নিকট, দিদিমার কাছে "জুজুবুড়ীর গল্প," "রাজপুত্রের কাহিনী," "রাক্ষসের অদ্ভুত কথা," "ভূতের বর্ণনা" প্রভৃতি কত গল্পই না সকলে কত মন দিয়া শোনে, এবং শুনিতে শুনিতে আশ্চর্য্যে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া যায়; কখন আনন্দে আটখানা আবার কখন বা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে। বড় হইলেও গল্পের বই পড়িতে মন যায়। কিন্তু এই সকল গল্পই মিথ্যা—কাল্পনিক। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন বালি দিয়া নিজের মনের মত খেলার ঘরটি প্রস্তুত করে, তেমনি যিনি গল্প বলেন বা লিখেন তিনিও নানা ভাবের কল্পনা দিয়া গল্পটি সাজাইয়া তোলেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাহা শুনিতে গল্পেরই মত; কখনও আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কখনও আনন্দ পাই। কিন্তু এগুলি মিথ্যা নয়—সত্য। এইরূপ সত্য কথাগুলিই ইতিহাস। তোমরা কি সেই কথা কিছু কিছু শুনিতে চাও? যখন বড় হইবে, অনেক বই পড়িবে—তখন সেই সব কথা আরও পড়িবে, আরও জানিতে পারিবে, আরও অনেক আনন্দ পাইবে।

অতীতের দিনে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে আজ যাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না। আজ যদি বলি আমাদের এই বাংলা দেশ ছিল না—ইহার উপর ছিল এক বিশাল সমুদ্র; আজ যেখানে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র, একদিন তথায় ছিল এক মহাদেশ—ঐ ক্ষুদ্র লঙ্কাদ্বীপ যাহার এক অংশ; যে সাহারা মরুভূমির বালুকারাশির কল্পনা করিলেও অন্তরাত্মা ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে সেই ধূধূ মরু-প্রান্তরে বিশাল এক সমুদ্র ছিল, আজ পৃথিবীর কত স্থানে কত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতেছে—তাহাদের অধিকাংশ হিন্দু, পারসীক, মুসলমান, ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি এককালে এক ছিল, এক তাহাদের ভাষা, এক তাহাদের আচার ব্যবহার—তাহা হইলে প্রথমে হয়ত তোমরা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যখন বুঝিবে এসকলই সত্যকথা

তখন কি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবে না? ইতিহাস ও বিজ্ঞান অদ্ভুত গল্পের মতই মনে হয়, কিন্তু তাহা গল্পের মত অসার নয়। মিথ্যা কখনও ইতিহাস বা বিজ্ঞান হইতে পারে না ইতিহাস বা বিজ্ঞানের কথা বলিলেই তাহা যতই কেন বিস্ময়কর বা অদ্ভুত হোক না তাহা সত্য বলিয়াই জানিতে হইবে। ইতিহাস বলিতে বুঝায় পুরাতন কথা। সেই পুরাকালের কথা—কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা ইতিহাস বলিয়া দিতে পারে। সেই অতীতের কথাই দুই চারিটি বলিব।

আমরা আমাদের কথা অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস বলিব। আমরা পৃথিবীতে বাস করি। অতএব প্রথমে পৃথিবীর কথা একটু বলা ভাল। এই পৃথিবীর যে বয়স কত তাহা বলা একরকম অসম্ভব। কি করিয়া যে পৃথিবী সৃষ্টি হইল তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক ভাবে বলা যায় না। ইহার জন্মকথা মোটামুটি এই:—এই পৃথিবী সেই লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড আগুনের গোলা ছিল মাত্র। মানুষ কি জীবজন্তু ত দূরের কথা কোন গাছের পর্য্যন্ত চিহ্ন ছিল না। ক্রমে ক্রমে এই আগুনের গোলার উপর একটা আচ্ছাদন পড়িল। সূর্য্য তখন মেঘে ঢাকা ছিল। আগুনের উত্তাপে বাষ্প উঠিয়া উঠিয়া পৃথিবীর উপর বারংবার জল হইয়া পড়িতে লাগিল। এই রকম বৃষ্টি পড়িয়া যেমন পৃথিবীর উপরটি একটু একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তেমনি আবার স্থানে স্থানে ভিতর হইতে প্রবলবেগে আগুন উঠিয়া ভূমিকম্প হইতে লাগিল। ইহার ফলে পৃথিবীর কতক স্থান উপরে উঠিয়া গিয়া হইল পাহাড়, আর কতক স্থান অত্যন্ত নীচু হইয়া হইল সমুদ্র। আর বাকী স্থান রহিল সমতল। হাজার হাজার বৎসর এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াই হঠাৎ যে এখনের মত সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি হইল তাহা নয়। পৃথিবীতে জীব-সৃষ্টির পরেও এই পরিবর্ত্তনের শেষ হয় নাই। দেখ না, পৃথিবীর সবার চাইতে উচ্চ পর্ব্বত যে হিমালয় তাহারও চূড়ায় সমুদ্রের জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি দেখা যায়।

এইরূপে পৃথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া যে আর কিছু পরিবর্ত্তন হইল না তাহা নহে। ইহার পরেও কতবার কত সমুদ্র-স্থানে পাহাড় হইয়াছে আবার কত পাহাড় ডুবিয়া সমুদ্র হইয়াছে। এমনিভাবে কত যুগ ধরিয়া পরিবর্ত্তন হইতে হইতে পৃথিবীর এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবী ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর জন্ম হইল না। প্রথমে জলজন্তুর সৃষ্টি হয়। পরে বৃক্ষলতা, তাহার পর কত প্রকার জীবের উৎপত্তি। কতদিন পূর্ব্বে—কেমন করিয়া এই সকল হইল তাহা কে ঠিক ঠিক বলিবে? প্রথম কোন্ স্থানে মানুষের প্রথম জন্ম হয় তাহাই বা কে জানে? এ সকল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেদিন একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের জন্ম হয়। কতদিন পূর্ব্বে কখন কোথায় কোন্ কোন্ স্থানে কত রকমের মানুষের বসতি ছিল তাহা ঠিক ঠিক বলিতে না পারিলেও—সেই আদিম মানব সকলের অনেক আচার ব্যবহার আমরা জানিতে পারি। সেগুলি ঠিক অনুমান নয়। তবে সকল স্থানের সকল মানবের সম্বন্ধেই ঠিক ভাবে বলিতে পারা যায় না বলিয়া এগুলিও ইতিহাসের পূর্ব্বের ঘটনা। ইতিহাসের পূর্ব্বের ঘটনা বা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা এইজন্য যে ইতিহাসে মিথ্যা, কল্পনা বা অনুমানের স্থান নাই।

এখন পৃথিবীতে আমরা যত মানুষ দেখিতে পাই সেই আদিম যুগে তত ছিল না, এবং দেখিয়া

শুনিয়া মনে হয় যে তাহারা সকলেই একস্থানে বাস করিত না; এক এক স্থানে কতকগুলি লোক থাকিত। সব দিক দিয়াই তাহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্য এখনও আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যেই যে এই পার্থক্য তাহা নহে,—এক দেশের লোকদের মধ্যেই আচার ব্যবহারে কত তফাৎ। সেই তখনকার দিনেও একস্থানের লোকেরা ঠিক অন্য স্থানের মত ছিল না, আবার সকলের উন্নতিও একভাবে একই সঙ্গে যে হইত তাহা নহে। মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। তাহার ফলে আজ আমরা যে সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাই সেই আদিকালে ইহার অধিকাংশেরই কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখন আমরা সকলেই কেহ গ্রামে, কেহ সহরে বাস করি। কাহারও ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা, আবার কাহারও বা পর্ণকুটীর। পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী ব্যতীত প্রত্যেকেই গৃহে বাস করি। কিন্তু সেই অতি পুরাকালে সহর বা গ্রাম ছিল না; এখনকার মত কোন গৃহও ছিল না। পর্ব্বতের গুহায় অন্যান্য বনের হিংস্র জন্তুগণের সহিতই তাহাদিগকে বাস করিতে হইত। অবশ্য এই বসবাস যে বেশ সুখের ছিল না এবং তাহা বন্ধুত্বেরও পরিচয় দিত না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন কোন স্থানে লোকেরা পাখীর ন্যায় গাছের উপর থাকিত। ইহার বহুকাল পরে মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতর বাস করিবার প্রথা চলিত হয়। এই গৃহগুলিকে আমরা "পাতাল গৃহ" বলিয়া থাকি।

যেমন থাকিবার স্থান ভোজনও তাহারই অনুরূপ। গাছের ফল ও নদীর জল ইহাই ছিল সেকালের খাদ্য। আদিম মানব মাছমাংস আহার করিত না। তাহারা ছিল নিরামিষভোজী। ইহা যে কেবল মাছমাংসের অভাবের জন্যই তাহা নহে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি ভগবান্ আমাদিগকে আমিষভোজী করেন নাই। যে সকল জীবজন্তু মাংসাশী তাহাদের দাঁত, পাকস্থলী প্রভৃতি আমাদিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আরও সেকালে একস্থানে এত মানব বাস করিত না। প্রায় সকলই বন। সেই গাছের ফলেই তাহাদের বারমাস অনয়াসে চলিয়া যাইত। কিন্তু বহুদিন পরে স্বভাবের পরিবর্ত্তনে সহসা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি শীতপ্রধান হওয়ায় ফলের অভাব হইল এবং তাহারই ফলে স্বভাবতঃই মানবগণ অন্য খাদ্যের খোঁজ করিতে লাগিল। একে ত বন্য জন্তুগণের সহিত বাস করার জন্য বহু সময়েই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইত। এখন এই ফলের অভাবে অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য খুঁজিয়া পাইল না। কারণ, তখন ত আর কেহ চাষ করিতে জানিত না! কাজে কাজেই যাহা সহজে ও নিকটে পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই সকল অভাব পূরণ করিতে হইত। যুদ্ধে নিহত বন্য জন্তুগণ তাহাদের খাবার হইল। বহুকাল পরেও যখন মানব পশুর সঙ্গ হইতে দূরে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং চাষ করিয়া খাদ্যের অভাব দূর করে তখনও এক দলের সহিত অপর দলের যুদ্ধ হইলে যাহারা জয়লাভ করিত তাহারা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃই পরাজিতগণের মাংস ভক্ষণ করিত। ইহা তাহাদিগের নিকট এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। এখনও যে এই নিয়ম একেবারে নাই তাহা নহে। আজকালও বিজেতাগণ পরাজিতের উপর নানা অত্যাচার করিয়া থাকে। মানব-সমাজ এইরূপে বাধ্য হইয়াই মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বহুকাল পরে মানুষ যখন কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইচ্ছামত শস্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন সভ্য ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিয়াই আমিষ আহার ছাড়িয়া দিল।

খাওয়ার পরই কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা। মানুষ কথা না বলিয়া থাকিতেই পারে না। কিন্তু শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে সেই আদিম মানবগণ কথা বলিয়া মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করিতে পারিত না। কিন্তু এই মনের ভাব ত আর না বলিয়া থাকা যায় না, চলেও না। এক সঙ্গে থাকিলেই পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান করার দরকার ও ইচ্ছা হয়। তাহাদেরও ইহাই হইয়াছিল। কিন্তু কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকায় নানাপ্রকার হাব ভাবের দ্বারা, ইসারা এবং সঙ্কেত করিয়া, এবং ইহার বহুপরে ছবি আঁকিয়া বা বাজনা বাজাইয়া কথা বলার কাজ চালাইত। এই প্রণালীই ভাষার প্রথম অবস্থা। ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার প্রণালী এখনও চীনদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়। ক্রমে ক্রমে যখন দুই চারি দল একসঙ্গে মিশিতে থাকে—তখন সকলের প্রণালী হইতে ভাব লইয়া ক্রমশঃ ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারিল। একবার ভাবিয়া দেখ ত ভাষার পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা কিরূপ ছিল! বোবা মানুষ দেখিলে কি তোমাদের দুঃখ হয় না? কেন হয়? আহা—ঐ লোকটি নিজের মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারে না—এই জন্য। আজ কাল যেমন অনেক রকম বাংলা, হিন্দী তেলেগু, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত সেকালে এইরূপ কত স্থানে কত রকম ভাষা যে ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব। কত ভাষা উঠিয়া ছিল, কত ভাষা লোপ পাইল—,আবার কালে কত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল! ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, গড়িয়া ভাঙ্গিয়াই জগৎ উন্নতির পথে চলিয়াছে।

আদিম মানবগণের থাকিবার স্থান, খাদ্য ও ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি জানিলে। তাহাদের জামা কাপড় কেমন ছিল তাহা বলিয়াই আজের মত আমার কথা শেষ করিব।

যেমন অন্যান্য বিষয়ে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের আদিম পুরুষগণের বস্ত্রও কার্পাসের প্রস্তুত নয়। কোন সময়ে তাহারা একেবারে উলঙ্গ থাকিত কিনা বলা যায় না, তবে বোধ হয় তাহাই অনেকটা সত্য। তাহার পর তাহাদের প্রথম পরিবার কাপড় হইয়াছিল—গাছের পাতা সেলাই করিয়া। অবশ্য সেলাই মানে কোনরকমে যোড়াতালি দেওয়া। এইরূপ বস্ত্রই স্বাভাবিক। ইহারও পরে মৃত পশুর চর্ম্ম সরু হাড় এবং ঐ মৃত জন্তুগণেরই সরু শিরা দ্বারা সেলাই করিয়া বহুদিবস তাহারা লজ্জা দূর করিত। অন্যান্য সকল বিষয়েরই ন্যায় কার্পাস যে কখন প্রথম আবিষ্কৃত ও তাহা হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

সকল দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে,—সমস্ত মানব সমাজ একটী মানুষের জীবনের মতই। মানুষ যেমন ছোট হইতে বড় হয় ততই জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করে, যখন শিশু থাকে তখন কোন গৃহের প্রয়োজন হয় না। মায়ের কোল বুকই তাহার আশ্রয় স্থান; ভগবানের প্রেমের দান মায়ের দুধ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। কোন কথা বলিতে পারে না, হাসিয়া কাঁদিয়া, হাত পা ছুড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করে; কাপড় জামা প্রভৃতি কোন আচ্ছাদনই দরকার নাই—এই মানব-সমাজও সেই আদিকালে, প্রথম অবস্থায় ঐরূপ ছিল—এবং যতই দিন যাইতেছে ততই নানাদিকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নতির পথে চলিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছাই জগৎ-মানুষ জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হউক, এবং তাহাই হইতেছে।

মণ্টিক্রীষ্টো।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্যারিয়ার কাহিনী

(৩)

বৃদ্ধ বলিলেন—"এস প্রথমে তোমাকে আমার ঘরখানি দেখাই—তার মানে তুমি যদি কিছু আপত্তি না কর, তবে তোমাকে এই গর্ত্তের ভিতর দি'য় যেতে হ'বে।"

এডমণ্ড হাসিয়া বলিল—"এই ঘর থেকে বাহির হবার জন্য আমি আরও অনেক অসুবিধা সহ্য ক'রতে রাজী আছি।"

বৃদ্ধ সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন, এডমণ্ডও তাঁকে অনুসরণ করিয়া আর একটা ঘরে উপস্থিত হইল। ঘরখানি ঠিক তার কুঠরিখানির মত করিয়াই সাজান।

বৃদ্ধ বলিলেন—"যাক্—কেবলমাত্র বারটা বেজে পনর মিনিট হয়েছে—অনেকখানি কথা বলবার সময় পাওয়া যাবে"

এডমণ্ড অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—বৃদ্ধের ত কোন ঘড়ি দেখা যাইতেছে না—অথচ তিনি কি করিয়া বলিলেন—বারটা বাজিয়া পনর মিনিট হইয়াছে। বৃদ্ধ তাহার আশ্চর্য্যের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তারপরে বলিলেন—"এই যে জানালার ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মি আসিয়া এ দেওয়ালের সাদা লাইনগুলির উপর পড়িতেছে, ঐটাই আমার ঘড়ি—ঐ দাগের উপর আলোর ছায়া দেখিয়া আমি সময় ঠিক করি। ঘড়ি পড়ে ভেঙ্গে যাবার, কিম্বা অন্যরকমে খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকে—কিন্তু আমার এ ঘড়ি বন্ধ হয় না—সূর্য্য রোজই ওঠে—তার আর ব্যতিক্রম নেই। আমার নির্জ্জন বাসে এটা আমাকে খুব আনন্দ দেয়।" বৃদ্ধ তারপরে ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়া একটা পাথর সরাইলেন, সেখানে একটা বড় গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া গেল। সেটাকে আলমারীর মত ব্যবহার করা হয় মনে হইল। সেখান হইতে কতকগুলি বাণ্ডিল বাহির করিয়া—(দেখিয়া মনে হইল সে-গুলি কাগজ)—এডমণ্ডকে দিয়া বলিলেন—"এই আমার বই—ইচ্ছা করলে দেখ্‌তে পার।"

এডমণ্ড আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনার বই! আমি জানতাম না যে কয়েদীদের কাগজ কলম দেওয়া হয়।"

———"নাহে বাপু তাদের দেওয়া হয় না, কিন্তু এই ব্যাপারটা কায়দা করতে হলে একটু বুদ্ধি খাটালেই হয়। ঐ যে দুটো বাণ্ডিল দেখ্‌ছ ওগুলো কাগজ নয়, তুমি যা ভেবেছ—ওগুলো কাপড়। আমার দুটো সার্ট আর কতকগুলো রুমাল ছিঁড়েছি। আমাদের শুক্রবারে যে হ্যাডক মাছ খেতে দেওয়া হয়, তার মাথায় একরকম কাঁটা পাওয়া যায় তারই কলম করে লিখি। বেশ ভালো করে কাট্‌লে ওগুলো ঠিক খাগের কলমের মত হয়।"

এডমণ্ড আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি ক'রে কাটেন?"

———"কেন ছুরি দিয়ে—আমার সব আবিষ্কারের মধ্যে সেটাই হচ্ছে মজার। সেটা একটা পুরাণো লোহার বাতিদান থেকে তৈরী করেছি—

এই দেখ।” এডমণ্ড ছুরিটা হাতে লইল। বৃদ্ধ বলিলেন, “পাথরের উপর শান দিয়া ক্ষুরের মত ধার হয়েছে।”

এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা, আপনি কালি পান কোথায়?”

———“তুমি দেখ্ছ এখানে একটা চিমনি আছে—এটাকে অনেক বৎসর ধরে ব্যবহার করা হয়েছে—সেজন্য ভিতরে অনেক ঝুল জমেছে। যখন আমার কালি দরকার হয়—খানিকটা ঝুল নিয়ে আমাদের রবিবারে যে মদ দেওয়া হয় তার সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দর কালি তৈরী হয়।”

এই সব শুনিয়া এডমণ্ড এত আশ্চর্য্য হইল যে সে আর কথা বলিতে পারিতেছিল না। বৃদ্ধ তার আশ্চর্য্যের ভাব দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন—তারপরে একটি দড়ির সিঁড়ি বাহির করিয়া বলিলেন—“এটা হচ্ছে পাহাড়ের গা দিয়ে নামবার জন্য। আমার ধারণা ছিল আমি বাইরের দিকে গর্ত্ত করছি—তোমার ঘরের মধ্যে নয়। আমার সমস্ত শ্রম বৃথা হয়েছে—যদিও তোমার মত একজন বন্ধু পেয়েছি, যার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারছি—আর মরবার আগে আমার গুপ্ত কথাগুলো বলে যেতে পারব। আমি বুড়ো হয়েছি—আর বেশী দিন বাঁচব না। যাক্—তুমি কি আমার জীবনের ইতিহাস শুনতে চাও?”

এডমণ্ড বলিল—“সব চেয়ে আগে তাই শুনতে চাই।”

বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—“আমার নাম ফ্যারিয়া। আমি ইটালী দেশের একজন ধর্ম্মযাজক, এখানে রাজনীতিক ব্যাপারে বন্দী হয়েছি। আমার শত্রুদের ধারণা ছিল যে আমার মাথায় অনেক কিছু খবর আছে। তাই তারা ষড়যন্ত্র করে আমাকে এখানে বন্দী করেছে। আমি এক সম্ভ্রান্ত ধনী ইটালীবাসীর সেক্রেটারী ছিলাম; বর্গিয়া নামে একজাতি তাঁহাদের ধন লুট করিবার জন্য তাঁদের এক পূর্ব্বপুরুষকে খুন করে—সেই থেকে তাদের ধনের আর কোন খবরই পাওয়া যায় না। সকলেই জান্ত ঐ ভদ্রলোকটী একটী উইল করে তাঁর টাকাকড়ি কোথায় লুকানো আছে তা লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরও উইলটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না! যতই দিন যেতে লাগ্ল ততই সে পরিবারটী গরীব হয়ে পড়ল। আমার যে মনিব তিনি পরিবারের শেষ বংশধর।

আমার মনিবের যা কিছু সম্বল ছিল—তার মধ্যে যে বাড়ীতে বাস করিতেন সেটা আর কতকগুলি বই। কয়েকখানি বই খুব পুরাণো আর দামী ছিল। এই বইগুলির মধ্যে একখানি আমার খুব ভাল লাগিল। সেখানি খুব সুন্দর রোমান ক্যাথলিকদের একখানি ধর্ম্ম পুস্তক—সোণারপাত দিয়ে বাঁধানো ছিল। বইখানি আমার মনিবের পূর্ব্বপুরুষ কার্ডিনাল স্পাডার ছিল। তিনি মরিবার সময় বলিয়া যান যে বইখানি যেন কখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে না যায়। তাই নানা বিপদ আপদের মধ্যেও বইখানা তাঁর বংশধরেরা খুব যত্নের সহিত রেখেছিলেন।

আমার কাছে বইখানা একটা রহস্য বলে মনে হোত। আমি যখন বইখানার পাতা উল্টাতাম তখন মনে হোত—সে যদি কথা বল্তে পারত তা’ হলে হয়ত কার্ডিনালের গুপ্ত ধনের সংবাদ দিতে পারত।

একদিন শীতের দুপুরে—লাইব্রেরীতে কাজ ক’রতে ক’রতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি চারিদিক অন্ধকার—কেবল নিবন্ত চিমনি থেকে অল্প অল্প আলো আস্ছে’—হাতড়িয়ে দিয়া শালাইটা খুঁজে দেখি সেটা খালি; হঠাৎ আমার

মনে হোল সেই বিখ্যাত ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে একটা বাজে কাগজ আছে—সেইটা দিয়ে বাতি জ্বালানো যাবে এই ভেবে আমি সেটাকে চিমনির কাছে নিয়ে গিয়ে আগুনে ধরলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় অমনি তার মধ্যে হাতের লেখা দেখা গেল। ঐ কাগজটা কেউ এমন কালি দিয়ে লিখেছিল যে আগুনের তাপ না দিলে তার লেখা পড়া যায় না। আমি তাড়াতাড়ি কাগজটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আগুণ নিভিয়ে দিলাম তার পরে বাতির ফিতেটা আগুণে দিয়ে আলো জ্বেলে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলাম। তার খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল—কিন্তু যেটুকু ছিল তাতে বুঝতে পারলাম যে—এতে সেই গুপ্ত ধনের কথাই লেখা আছে—তার মানে সেটাই কার্ডিনালের হারানো উইল।"

খুব মন দিয়া শুনিতে শুনিতে এই সময় এডমণ্ড বলিল, "সেই হারানো উইল—একটুকরা কাগজে আপনি একটা বইয়ের মধ্যে পেলেন।"

ফ্যারিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এই টুকরো কাগজটা বইয়ের পাতায় চিহ্ন রাখ্‌বার জন্যে ব্যবহার করা হোত—তাই ওটাকে বইয়ের একটা অংশ বলে ধরা হোত। কার্ডিনালের বংশধরেরা দূরে থেকে ছাড়া কখন বইখানা দেখেনি।"

———"তাহ'লে তারা যে রহস্য জানবার চেষ্টা করছিল—আপনি তা জানতে পারলেন?"

———"হাঁ—কিন্তু একজন জেলের কয়েদীর তা জেনেই বা লাভ কি? আর সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এই সমুদ্রে ঘেরা পাহাড়ে দ্বীপটা থেকে—"

কার্ডিনালের গুপ্ত ধন খুব কাছেই আছে। সেই গুপ্ত ধন মণ্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে একটা গুহায় লুকানো আছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয় আর আমার মনে হয় দ্বীপটিতে কেহ বাস করে না। কেন জানিনা—তবে আমার মনে হয়, আমি এখন থেকে ছাড়া পেলে আর সব কাজ খুব সহজ হবে। আমি যখন গর্ত্ত করিয়াছিলাম—আমার ধারণা ছিল আমি দেওয়ালের বাইরের দিকে গর্ত্ত করছি। তুমি বুঝতে পারছ—আমি আর একজন কয়েদীকে পাবার আশায় এত খাটিনি।" তার পরে হাসিয়া বলিল—"যাই হোক আমি দেখ্‌ছি অদৃষ্ট আমাকে তোমার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে—কেন না আমি এই কাজের পক্ষে এখন খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি—আমার গায়ে আর সে রকম শক্তি নাই। তুমি এখন ছেলে মানুষ—গায়েও বেশ জোর আছে—আমার বদলে তুমিই একাজের ভার নেবে।"

এডমণ্ড খুব জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।"

ফ্যারিয়া তাহাকে খুব বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এডমণ্ড প্রত্যেক বারেই অস্বীকার করিল। শেষকালে ফ্যারিয়া খুব আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে তুমি বল আমার মৃত্যুর পরে যাবে? বল তুমি যাবে? সেখানে অত ধন আছে—তা দিয়ে কত কি করা যায়—অথচ কেউ কিছু করবে না তা ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমি যখন মরে যাব তখন তুমি যাবে!"

এডমণ্ড বলিল—"মরণের কথা বলিবেন না—আপনাকে পাবার পর আবার একলা হবার কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।"

ফ্যারিয়া বলিলেন—"সেইজন্যই তোমাকে পালিয়ে যেতে বল্‌ছি, কেমন করে পালাবে তা তুমি ঠিক কর। 'আমি বুঝতে পারছি আমি বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু যে ক'দিন বেঁচে আছি—তোমাকে এই ধনের অধিকারী করবার জন্য যত রকম উপায় আছে আমি তাতে সাহায্য করব।"

ড্যাণ্টি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা এই সম্পত্তির আমরা ছাড়া কি আর কেউ উত্তরাধিকারী নেই।"

—"না না সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার—কার্ডিনাল স্পাডার বংশ লোপ পেয়েছে—তাঁর শেষ বংশধর আমাকে এই ধনের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছেন—এই ধন যদি কখন উদ্ধার করতে পারি আমরা তা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারব"

—"কিন্তু দেখুন এই ধন আপনার—আপনারই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। আমার ইহাতে কোন দাবী নাই আমি ও আপনার কেউ নই।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"ড্যাণ্টি তুমি আমার ছেলে। তোমাকে আমি আমার এই বন্দী দশায় পেয়েছি। আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারক—আমাদের বিবাহ বারণ। কিন্তু ভগবান এই অপুত্রক কয়েদীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন।"

এই বলিয়া ফ্যারিয়া এডমণ্ডকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন।

এডমণ্ড যদিও তার বৃদ্ধ বন্ধুর প্রস্তাব কি করিয়া সম্ভব হইবে বুঝিতে পারিল না, তবুও তাহাতেই রাজী হইল। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল। ইতিমধ্যে এডমণ্ড ফ্যারিয়ার কাছে খুব মনযোগ দিয়া পড়াশুনা করিল। সে ইংরাজী, জার্ম্মাণী, আর স্পেনীয় ভাষা শিখিল—ইটালিয়ান ভাষা আগেই জানিত। তাহার শিক্ষক ফ্যারিয়া খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি অনেক বই পড়িয়াছিলেন ও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফ্যারিয়া এডমণ্ডকে কার্ডিনাল স্পাডার গুপ্তধনের জায়গাটার বিবরণ মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এডমণ্ডকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যখন এখান থেকে যাবে হয়ত উইলটা সঙ্গে নিতে পারবেনা—তাই এটা মুখস্থ করে রাখ।"

শ্রী বিমলেন্দু সরকার

শেফালি গান

সাঁঝের বেলায় ফুটি মোরা
গন্ধ বিলাই রাতে।
সবাই তাহে মাতে।

সাঁঝের বেলায় ফুটি মোরা
গন্ধ বিলাই রাতে।

সকল দিক
গন্ধে ভরে
ছড়িয়ে গিয়ে
বায়ু ভরে ;
মাতাই ওরে, ভ্রমর দলে
মানব তাহে মাতে।

শরৎ রাতে
খেলা করি
বাতাস ভরে
নৃত্য করি ;
না ফুটিতে অরুণ কিরণ
ঝরে পড়ি প্রাতে।

সাঁঝের বেলায় ফুটি মোরা
গন্ধ বিলাই রাতে ॥

রাত্রি-শেষে
পল্লী মেয়ে
আমার কাছে
আসে ধেয়ে,—
বাঁশের বোনা সাজিটা তার
লয়ে কোমল হাতে।
সাঁঝের বেলায় ফুটি মোরা
গন্ধ বিলাই রাতে !!

শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্ত্তী

দেবতার দান

(ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

সোভান্ দরজীর একচালা ঘরখানা গাঁয়ের সকলেরই পরিচিত। পুরাণো ঘড়্‌ঘড়ে-শব্দ-ওয়ালা কলখানির সাম্‌নে একটা ভাঙ্গা টুল নিয়ে বসে সারাদিন এক মনে সে নিজের কাজ কোরে যাচ্ছে, আর গুণ গুণ কোরে গান গাইছে। মাটীতে একখানা চাটাই পাতা, তার উপর কতগুলি ছেঁড়া কাপড়ের স্তুপ, একদিকে খানিকটা লাল, সবুজ চেক্-কাটা মোটা কাপড়ে থান এবং ময়লা একটী গজ-ফিতা। এই টুকুই তার ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জাম। গাঁয়ের লোকই বা ক'জন, আর তার মধ্যে জামা সেলাই কোরতে দেবার মতন পয়সা আছে কার? শত-তালি-দেওয়া ছেঁড়া জামার মেরামতি কাজই সে পায়, কচিৎ ২।৪ টা পিরাণ বা পায়জামার অর্ডার আসে গাঁয়ের মোড়লদের কাছ থেকে, তার মজুরীর তুলনায় ডাক্-ধমকটাই বেশী লাভ হয়।

এই আয়তে তাকে তিনটী পেটের খোরাক যোগাতে হয়। দু' বেলা দুটি ভাত যে কবে খেয়েছিল, তা সে ভুলেই গিয়েছে। দিনান্তে যেদিন একবেলা চারটী ভাত পায় সেদিন তার পরম সৌভাগ্যের দিন। এক পয়সার মুড়ি বা এক মুঠো ছোলা সিদ্ধই তার কপালে জুট্‌তো। তাতেই বেশ সন্তুষ্ট—যেদিন আর ময়লা-গন্ধ-মাখা জীর্ণ জামা নিয়ে কেউ তার দরজায় এসে দাঁড়াত না, সারাদিনে যেদিন তার দুটী পয়সাও সংস্থান হোতনা, সেদিনও কেউ তার মুখ খানা মলিন দেখেনি। সেলাইএর কলের টেবিলটার ওপর কনুইটী রেখে গালে হাত দিয়ে পথের পানে চেয়ে থেকেই দিনটা বেশ কেটে যেতো। অন্ধকারে গাঁয়ের রাস্তা যখন আর মালুম হোতনা, তখন সে ধীরে ধীরে ঝাঁপটী ফেলে ঘরখানি রাস্তার থেকে আড়াল কোরে নিয়ে চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়্‌ত।

এক ঘুমের পর তার স্ত্রী এবং মেয়েটীর চীৎকারে সে জেগে গিয়ে, "অকর্ম্মা মানুষটা যে কেবল ঘুমোতে পারে, এক পয়সা রোজগার করবারও ক্ষমতা নেই" এই অভিযোগ টুকুই প্রতিদিন শুন্‌তে পেতো। স্ত্রী এবং মেয়ের কাছে গালাগালি শোনাতে সে এমন অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিল যে তাতে তার মনের শান্তি কেউ নষ্ট কোরতে পার্‌তনা।

মেয়েটী পরমা সুন্দরী, নাম ছিল তার রূপজান বিবি। কালো কুচ্‌কুচে কোঁকড়ানো চুল এক রাশ, গাল দুটী রাঙা টুকটুকে, হাত পায়ের গড়ন সুন্দর নিটোল, শরীরের গড়নে দারিদ্র্যের চিহ্ন কোথাও নেই। কিন্তু চুলগুলি জটা বেঁধে নারকেলের দড়ির মতন পাকিয়ে থাক্‌ত পিঠের উপর পড়ে, মুখখানার উপর একপর্দ্দা আলগা ময়লা জমে গায়ের অমন রংএর ওপর রাখ্‌ত কালি ঢেলে, পরণে একখানা শত ছিন্ন ময়লা লুঙ্গী, গায়ে ও মাথায় একখানা নীল ওড়না জড়ানো, তার খানিকটা ছিঁড়ে পড়েছে পা পর্য্যন্ত ঝুলে। অমন গোলাপ ফুলের মত সুন্দরী মেয়েটীর অমন দীন বেশ—বাপের প্রাণে বড়ই আঘাত দিত। কিন্তু কি কোর্‌বে সে? যদি কখনো বল্‌ত—"রূপজান, একটু ভাল কোরে স্নান কোরে চুলটা বাঁধ্‌না,—কাপড়গুলো দেনা একটু সেলাই কোরে দিই" তা হোলে রূপজানের রাগ দেখে কে? সে বোলে উঠ্‌তো—মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে "পর্‌তে যে একখানা আস্ত কাপড় পায়না, পেটে যে খেতে পায়না, তার আবার রূপ দিয়ে কি হবে?" মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে সোভান্‌ ভাব্‌ত, "হা আল্লা, এম্নি কোরেই কি দিন যাবে? তোমার যা মরজী।"

মেয়েটীর রূপ ছিল বটে কিন্তু মেজাজখানা ছিল বড়ই কড়া। সে মনে জান্‌ত বাপ তার সারাদিন খাটে, তার সাধ্যে যতদূর কুলোয় রোজগারও করে, যা পায় স্ত্রীর আর মেয়ের হাতেই দেয়, নিজে কখনো কিছু দাবী করেনা, তবু তার রাগ হোতো কেন কে জানে? তার মনে এই বড় অভিমান, খোদা তাকে এমন রূপ দিলেন কেন, যদি এমন গরীবের ঘরেই জন্ম দিলেন এমন রূপ তো বাদসার বেগমদেরই মানায়, এ কুঁড়ে ঘরে কেন? এই অভিমানেই সে বাপের উপর রাগ কোরে ইচ্ছা কোরেই আরও অপরিষ্কার হোয়ে থাক্‌ত, ইচ্ছা কোরেই সে শরীরের অযত্ন কোরত।

মা আর মেয়ে মিলে যদি রোজগারের কিছু চেষ্টা কোরত, তবে হয়ত তাদের এমন দৈন্য দশায় পড়তে হোতনা কিন্তু এবিষয়ে তারা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে, লোকের বাড়ীর কুৎসা কুড়িয়ে দিন কাটিয়ে, সন্ধ্যেবেলা ঘরে এসে সোভান্‌কে গালাগালি করাই যেন তাদের নিত্যকার কর্ত্তব্য ছিল। এক মুঠো চাল সিদ্ধ কোরে খাবারও যেন গরজ নেই তাদের। সোভান্‌ ভাব্‌ত—"আমারই তো দোষ—আমি যদি ওদের ভালো কোরে খেতে পরতে দিতে পারতুম, তবে কি আর ওরা এমন কোরে কথা শোনাতে পারত?"

সেদিন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার রাত্রি—ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ কোরে বৃষ্টি পড়ছে, শন্‌ শন্‌ কোরে বাতাস বইছে, ঘরের চালখানা দিয়ে ঝির্‌ ঝির্‌ কোরে জল প'ড়ে চাটাই খানা ভিজে গেছে। সোভান্‌ সেলাইয়ের কলটীকে বাঁচাবার জন্যে গায়ের কোটটা খুলে চাপা দিচ্ছে। সেদিন ঘরে এক মুঠো চালও নেই, একটা দানাও নেই, সবাই উপোস্‌। ঘরের এক কোণে ভাঙ্গা তক্তপোষের ওপর বসে মা আর মেয়ে শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাঁপছে আর নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছে, এমন সময় বেড়ার ঝাঁপখানার উপর কে যেন জোরে ধাক্কা দিচ্ছে আর হাকৃছে "ওগো কে আছ খোল একটু"। সোভান্‌ ভাব্‌লে এমন সময় তো কেউ কখনো ডাকেনা, বুঝি বা কারও জরুরী কাজ নিয়ে কেউ এসেছে, আল্লার বুঝি দয়া হোয়েছে, দুটো পয়সাও যদি পাই। সে ঝাঁপটী তুলে ধরে বল্লে—"ভিতরে এসো"। শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে লাঠী ভর কোরে একটী বুড়ো ভিখারী—গায়ের

শত তালি দেওয়া জামাটীর একটী হাতা কিসে খোঁচা লেগে ঝুলে পড়েছে সেইটী এক হাতে ধরে বল্লে—"দরজী ভাই আমার এইটুকু জোড়া দিয়ে না দিলে আমি বাঁচব না—শীতে আমার হাত অবশ হেয়ে আস্‌ছে এখনও অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। লক্ষ্মীটী ভাই, এটুকু দাও সেলাই কোরে, আমি নইলে মারা যাব।" সোভান্ রেগে উঠে বল্লে, "কত দেবে বল মজুরী, আমি আজ সপরিবারে উপোস্ রয়েছি, বিনি পয়সায় এক ফোঁড়ও তুল্‌তে পারবো না।" ভিখিরী কাতর স্বরে মিনতি কোরে বল্লে—"ভাই আমার কাছে একটী আধলাও নেই—তুমি আমার কাজ কোরে পয়সা পাবে না বটে, কিন্তু এটুকু দয়া যদি কর তবে তুমি ঠক্‌বে না, আল্লা তোমায় পুরস্কার দেবেন। তুমি দুঃখী বোলেই তো আমার দুঃখ বুঝ্‌বে, তাই তোমার দ্বারে এসেছি ভাই, ফিরিও না আমায়"। সোভানের চোখ দুটী জলে ভরে উঠ্‌লো ; সে বল্লে—"দাও তোমার জামা, আর তুমি এগিয়ে এসে ঐ শুক্‌নো যায়গায় বোসো।" সেলাইয়ের কলের উপর থেকে নিজের কোটটী নিয়ে ভিখিরীর গায়ের ছেঁড়া জামাটা খুলে নিয়ে নিজেরটী তার পিঠের উপর ঢাকা দিয়ে দিলে। টিম্‌টিমে প্রদীপটা উস্কে দিয়ে ঘাড় নীচু কোরে সেলাই কর্‌তে বসে গেল। স্ত্রী আর মেয়ে ততক্ষণে চীৎকার আরম্ভ কোরেছে, "যত ব্যাগার খাট্‌বে, এদিকে কারও পেটে একটা দানা পড়েনি। এম্নি কোরে সারাদিন ভূতের ব্যাগার খাটো নিশ্চয়, নইলে পয়সা পাওনা কেন ?" ইত্যাদি। সোভান্ নীরবে যত্ন কোরে কাজটী সেরে ভিখিরীর হাতে দিলে, ভিখিরী উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হঠাৎ বিজলী বাতির মতন চোখ-ঝল্‌সানো একটা আলোয় ঘর ভ'রে গেল, সোভান্ তাকিয়ে দেখে ভিখিরী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে একজন দেবদূত দাঁড়িয়ে, হাতে তাঁর একটী থলি—সোভানকে বল্লেন—"এই নাও আমার ভিক্ষার থলি, তোমায় দিয়ে গেলুম, এই থলে তুমি যখনই হাতে কোরবে, তখনি মোহরে ভ'রে যাবে। তোমার ছাড়া আর কারও হাতে এ থলি কখনো ভ'রবে না। যত্ন কোরে এটী রেখো, যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, এতেই তোমার সকল অভাব পুর্‌বে। আমি আজ ভিখিরীর বেশে তোমার মন পরীক্ষা কোরতে এসেছিলুম—দুঃখীর দুঃখে তোমার মন গলেছে, এই তোমার পুরস্কার। কিন্তু একটী কথা সর্ব্বদা মনে রেখো—যদি কোন দিন ধনী হোয়ে গরীবের অপমান কর বা অহঙ্কারে মত্ত হোয়ে দীনের দুঃখ দূর কোরতে ভুলে যাও, সেদিন তোমার থলি আর ভ'রবে না, আর সব ধন ঐশ্বর্য্য তোমার অন্তর্দ্ধান হবে।" দেবদূত কোথায় অদৃশ্য হোয়ে গেলেন, সোভান্ হতভম্ব হোয়ে থলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, স্ত্রী আর মেয়ে এসে তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলুলে—"বোকা, ভাবছ কি ? দেখি, তোমার থলেতে কি আছে ? সোভান্ তাকিয়ে দেখলে সত্যিই তার হাতের থলে মোহরে ভরা। চমক্ ভাঙ্গ্‌তেই তার খানিক সময় গেল, ইতিমধ্যে তার স্ত্রী ও মেয়ে মোহরগুলি ঢেলে নিয়ে মহা চীৎকার হাঙ্গামা বাধিয়ে তুল্‌লে। ভোর বেলা উঠেই তারা বাজার থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়, খাদ্যসামগ্রী সব নিয়ে এল। মেয়ের মুখে হাসি ধরে না, বাপ্‌কে কত আদরে কাছে বসে যত্ন কোরে খাওয়াল। যখনই টাকার দরকার হয়, সোভান্‌কে বলে থলি হাতে কোরতে, অমনি থলে ভরে ওঠে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের মস্ত বড় বাড়ী হোল, চাকরবাকর লোকজনে ঘর ভরে গেল,হাল, চাল সব বদ্‌লে গেল। সোভান্ স্বপ্নে পাওয়া ধনের মতন থলেটী আঁকড়ে বোবার মতন

বসে থাকে, ভয় হয় কি জানি কখন স্বপ্নেরই মতন সব হারিয়ে ফেলে বুঝি !

সোভানের স্ত্রী ও মেয়ে বাদসার ঘরের বিবিদের মতনই হীরে, মুক্তো, সাটিন্ পরে গাড়ী চ'ড়ে হাওয়া খেতে যায়। এখন গাঁ ছেড়ে সহরে এসেছে, সবাই অবাক হোয়ে চায় কি কোরে এমন রাতারাতি বড়লোক হোল এরা কাণে কাণে আসল কথা বেরিয়ে পড়ল, সোভানের কপাল ফিরে গেল। বড় বড় ধনীজমিদার, রাজরাজারা সোভনের সঙ্গে দেখা কোরতে আসে। সোভানের মেয়ের রূপের খ্যাতি আর ধরে না। একে তো রূপজানের রূপ, তার উপর বাপের মোহরের থলি। দুই মিশিয়ে মেয়ের দাম বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সোভানের বাড়ীতে বড় বড় ভোজের আয়োজন হয়। বড় বড় বনেদী ঘর থেকে রূপজানের বিয়ের সম্বন্ধ আসে—সোভানের মন ওঠে না। মেয়েও নাক সিট্‌কায়, সে কি যাকে তাকে বিয়ে কোরতে পারে ? সোভানের স্ত্রীরও গরবে মাটীতে আর পা পড়ে না।

দেশের বাদসাহের নিমন্ত্রণ হোলো সোভানের বাড়ী। সোভানের প্রাসাদ এখন বাদসাহের খাস দরবারকেও হার মানিয়েছে। বাদসাহের তা চোখ ঝল্‌সাবার যোগাড়। এমন ঘরের মেয়ে নিলেই তো আমার বেগম-মহলের সম্মান থাক্‌বে। বাদসাহ রূপজানের রূপে মুগ্ধ হোয়ে সোভানের কাছে সসঙ্কোচে প্রস্তাব করলেন তাঁর মেয়েকে যদি মেহেরবানী কোরে বাদসাহের বেগম করবার অনুমতি দেন। সোভানেরও গর্ব্বে বুক উঁচু হোয়ে উঠ্‌ল—এই তো গৌরবের পরাকাষ্ঠা। সোভান আনন্দে সম্মতি দিল।

বিয়ের আয়োজন চল্‌ল একমাস ধরে। কত গাড়ী, কত হাতী, কত আলো, কত বাজনা, বাইরের মহলে আর অন্দর মহলে হীরে, জড়োয়ার, আতর গোলাপের, জরি, সাটিন্, রঙীন্ ওড়নার ছড়াছড়ি। সোভান জরীর টুপী মাথায় দিয়ে, মখমলের জুতা পায়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সকল কাজের তদারক কোরে বেড়াচ্ছে, সোভানের স্ত্রী চাকর বাকরকে হুকুমের পর হুকুম চাপিয়ে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌ছে, রূপজান বিবি গয়না আর কাপড় বাছ্‌তে বাছ্‌তে হয়রাণ হোয়ে পড়্‌ছে। বিয়ের তারিখের আর দেরী নেই। বাদসাহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে, একথা ভাব্‌তেই যেন সোভানের বুক দু'হাত উঁচু হোয়ে উঠ্‌ছে, ধরা খানা সত্যিই যেন সরার মতন মনে হোচ্ছে। নিজের ধন দৌলত দেখাবার জন্য কোথাও আর আড়ম্বরের কম্‌তি নেই। এত যার ধন, এত যার বাহুল্যের ছড়াছড়ি, তার বাড়ীতে গরীবের কিন্তু স্থান নেই কোথাও একটু। সোভানের কাছে হাত পেতে একটী পয়সাও কেউ ভিক্ষে পায় না। নিজের বাড়ী ঘর সাজিয়ে, নিজের সুখের ষোল-আনা আয়োজন কোরেই সোভানের আনন্দ, তার বেশী কাউকে কিছু দান করা যেন তার হাতে ওঠে না। সবাই বলে "গরীব যখন ফেঁপে ওঠে, তখন এম্নিই হয় বটে !"

বিয়ের আগের দিন সকালবেলা সোভানের দরজার এক ভিখারী ছেঁড়া জামা গায়ে, লাঠিভর কোরে এসে দাঁড়াল। দরওয়ান, চৌকিদাররা সন্ত্রস্ত হোয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা কোরল। সে কিছুতেই যাবে না, বলে—"সোভান্‌কে চাই।" সোভানের কাছে খবর পৌঁছাতে সে অগ্নিমূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হোল। ভিখারী বল্লে, "সোভান্ ভাই, আমার এই জামাটা একটু সেলাই কোরে দাও না, আমি শীতে কাঁপ্‌ছি দেখ্‌ছ তো ? কত রাস্তা চল্‌তে হবে আমায় এখনো, দাও ভাই একটু জোড়া দিয়ে দয়া কোরে।" সোভান্ তো রেগেই অস্থির—"কী,

এত বড় আস্পর্দ্দার কথা !! কাল আমার মেয়ের বিয়ে দেশের বাদসার সঙ্গে, আমি কি যে সে লোক ? আমায় কি এখনও দরজী পেয়েছিস্ ? বেরো আমার বাড়ী থেকে" বোলেই এক পদাঘাতে দিল ভিখিরীকে রাস্তার নালার মধ্যে গড়িয়ে। এ কি ব্যাপার !!! চারদিক রোসনাই কোরে যেন হাজার বাতি জ্বলে উঠ্‌লো, সে আলোয় সোভানের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এ আলো যে তার বড় চেনা ! এম্নি কোরেই তো আর একদিন এই আলো তার একচালা ঘরে জ্বলে উঠেছিল—এক আঁধার রাতে ! ভয়ে সোভানের বুক দুরদুর কোরতে লাগ্‌লো, সে আলোর মাঝখানে আবির্ভাব হোল এক দেবদূতের —এসে বল্লেন, "সোভান্, আমার থলি ফিরিয়ে নিলুম আজ। আমার দেওয়া ধনের তুমি সদ্ব্যবহার কোরতে পার্‌লে না, ঐ ধনের অহঙ্কারে তুমি তোমার হৃদয়টীও হারিয়েছ। আজ আর দীনের দুঃখে তোমার চোখে জল পড়ে না, তোমার দ্বারে আজ আমি ভিখারীর বেশে এসে পদাঘাত খেয়েছি, তোমার মন পরীক্ষা কোরতে এসে যা পরিচয় পেয়েছি আর তোমার মতন অযোগ্যের হাতে আমার থলে রাখ্‌বনা।" এই বোলে দেবদূত কোথায় মিলিয়ে গেলেন। সোভান্ মুর্চ্ছিত হোয়ে পড়্‌লো মেঝের ওপর কেউ আর জল নিয়ে, পাখা নিয়ে ছুটেও এলোনা, কেউ আর 'আহা'ও বল্‌লে না। চোখ মেলে সোভান্ দেখে—সেই তার এক চালা ঘরের চাটাইয়ের ওপর সে পড়ে আছে, স্ত্রী আর মেয়ে পাশে বসে তাকে গালাগালি কোর্‌ছে।

বাদসা দূতের মুখে খবর পাঠালেন তিনি আর সোভানের মেয়েকে বেগম কোরতে পারবেন না। অতো গরীবের মেয়ে যে যত সুন্দরীই হোক্ না কেন, বেগম-মহলের অপমান হবে যে তাকে নিলে ! রূপজান বিবি ছেঁড়া ওড়নার কোণে চোখ মুছ্‌লো !

দুই বন্ধু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস ও কারামুক্তি।

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যবন্ধু নামক গল্প তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

নলিন রাগ করিয়া বিপিন বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল বেলা পৌনে দশটা হইয়াছে। ফটকের বাহির হইয়া সে দ্রুতপদে উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। ক্রমে যখন সে ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় সে বিশ্রামার্থ দাঁড়াইল।

অদূরে চৌরঙ্গীর সৌধশ্রেণী। ঘণ্টা বাজাইয়া, হু হু করিয়া অফিসযাত্রী-বোঝাই ট্রামগাড়ী ছুটিতেছে। কর্ম্ম-কোলাহলের অন্ত নাই। নলিন দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, এত লোক কর্ম্মস্থানে যাইতেছে,—চাকরী করিয়া দু পয়সা আনিয়া স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইতেছে। আমারই স্ত্রীপুত্র কেন খেতে না পেয়ে মরবে ?

আমিও কর্ম্মের সন্ধান করব, যে কোনও কর্ম্ম হোক্—আমার আর মান অপমান নেই। সামান্য চাকরী ক'রে যদি মাত্র একবেলার ভাত জোটে, তাহ'লেও তো প্রাণধারণ হবে। তাও কি জুটবে না? অবশ্য জুটিয়ে নেব। আমায় বাঁচাতেই হবে। দেখি ভগবান্ কি করেন।"

চৌরঙ্গীর একটা ত্রিকোণ অট্টালিকার উপর বড় বড় লাল অক্ষরে এক ইংরাজি দোকানের নাম পড়া যাইতেছিল। নলিন সেই দিকে চলিল।

দোকানের দ্বারে পৌঁছিয়া, দ্বারবানের অনেক খোসামোদ করিয়া ত্রিতলের উপর বড় সাহেবের অফিসে নলিন পৌঁছিল। সাহেব খাতাপত্র লইয়া হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। নলিন প্রবেশ করিয়া বলিল—"গুড্ মর্ণিং সার।"

সাহেব কাগজ হইতে চক্ষু তুলিয়া ইংরাজিতে বলিল—"গুড্ মর্ণিং। কি চাই বাবু?"

"কর্ম্ম চাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আমায় কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে আমি খাইতে পাই। নহিলে আমায় চুরি কিম্বা আত্ম-হত্যা দুইয়ের একটা করিতে হইবে।"

সাহেব নলিনের ভাবভঙ্গি দেখিয়া এবং তাহার এই অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। ভৃত্যকে ডাকিবার ঘণ্টা বাজাইলেন। ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব তখন বলিলেন—"বাবু, আমি বড় দুঃখিত হইলাম, উপস্থিত আমাদের আফিসে কোনও কার্য্য খালি নাই। ডাকে আমার নামে এক দরখাস্ত পাঠাইও। কর্ম্মখালি হইলেই তোমার বিষয় বিবেচনা করিব। গুড্ মর্ণিং।" ভৃত্যকে বলিলেন—"বাবুকো রাস্তা দেখাও।"

নলিন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। পরে পরে আরও কয়েকটী ইংরাজী দোকানের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেস্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। কোথাও দ্বারবানের অনুগ্রহ হইল না, তাহার অনুগ্রহ হইল তো সাহেবের ফুরসৎ হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে কোনও বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র আফিসের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল, ফটকের বাহিরে একস্থানে কতকগুলি ইউরেশিয়ান ও ফিরিঙ্গি সাহেব দাঁড়াইয়া কি পড়িতেছে। নিকটে গিয়া দেখিল তক্তার উপর সেইদিনকার সংবাদপত্রখানি লাগান রহিয়াছে। অধিকাংশ লোকই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করিতেছে। ইহাই তো নলিন চায়। সেও মনোযোগসহকারে বিজ্ঞাপনগুলি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল দুইটি বিজ্ঞাপন তাহার কাজে লাগিতে পারে। অন্যান্য ব্যক্তিগণ, কেহ বা পকেট বুকে, কেহ বা ফাঁস কাগজে নিজ নিজ মনোমত বিজ্ঞাপনগুলি টুকিয়া লইতেছিল। কিন্তু নলিনের পকেটে কাগজও নাই, পেন্সিলও নাই, কিনিয়া লইবার পয়সাও নাই। প্রথমে সে ভাবিল, বিজ্ঞাপন দুইটা মুখস্থ করিয়া লইবে। মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, তাহার মাথা ঠিক নাই, মুখস্থ হইতেছে না। তখন হতাশ, ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে দেখিল, একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ পথে পড়িয়া রহিয়াছে। নলিন সেটি কুড়াইয়া লইল। কাগজ ত সংগ্রহ হইল, পেন্সিলের কি হয়? একজন ইউরেশিয়ান সাহেব সেখানে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন টুকিতেছিল। লেখা শেষ হইবামাত্র, নলিন তাহার নিকট গিয়া হিন্দিতে বলিল—"সাহেব, পেন্সিলটা একবার দিতে পার?"

এই অনুরোধে সাহেব চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল—"গেট্ আউট্, ইউ ড্যাম নিগার।"

নলিন আর সহ্য করিতে পারিল না। বিপিন বাবুর সঙ্গে তার রাগারাগি হইয়া গিয়াছে ; আফিসে আফিসে বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া তার মন বিরক্ত হইয়া আছে। এতখানি পথ চলিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার শরীর অস্থির ; ভবিষ্যতের ভাবনায় মন অস্থির। এমন অবস্থায় ইউরেশিয়ান সাহেবের মুখ হইতে অপমানসূচক "ড্যাম্ নিগার" কথায় যেন বারুদে আগুন পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে নলিন সাহেবের গণ্ডে এক প্রবল চপেটাঘাত করিল।

বাঙ্গালী হস্তের স্বদেশী চড় খাইয়া সাহেব প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। একটু পরেই, আস্তেন গুটাইয়া নলিনকে সে আক্রমণ করিল। তখন দুই-জনে ঘোর বাহুযুদ্ধ বাধিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শত শত পথচারী ইহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। এক পাহারওয়ালা আসিয়া—"ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" বলিতে বলিতে ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অনেক কষ্টে দুইজনকে ছাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে একজন ইংরেজ পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইউরেশিয়ানের নাসিকা হইতে রক্তপাত হইতেছে, নলিনের বালাপোষ ও জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সার্জ্জেণ্ট সাহেবকে দেখিবামাত্র ইউরেশিয়ানটি বলিল—'এই নেটিভ আমায় মারিয়াছে।'

নলিন উত্তেজিত স্বরে আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দিতে বলিল—"আমি কি শুধু শুধু মারিয়াছি ? অপরাধের মধ্যে আমি উহার পেন্সিলটা একবার চাহিয়াছিলাম। বেটা আমায় বলে কিনা "ইউ ড্যাম নিগার !" আমি "নিগার" আর উনি কি ? ওঁর রঙ ও আমার উপরেও এক পোঁছ"।

সার্জ্জেণ্ট তখন কনেষ্টবলের সাহায্যে দুই-জনকেই থানায় লইয়া চলিল। সেখানে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, উক্ত ইউরেশিয়ানের, কনেষ্টবলের এবং সার্জ্জেণ্টের জবানবন্দী লইয়া, নলিনের বিরুদ্ধে রাজপথে শান্তিভঙ্গ করিবার এক মোকর্দ্দমা দাঁড় করাইলেন। নলিনের নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া বলিলেন—"আজ শনিবার। পরশু সোম বার লালবাজার পুলিশ কোর্টে তোমার মোকর্দ্দমা হইবে। তোমার যদি কেহ জামিনদার থাকে তবে ২০০্ টাকার জামিনে তোমাকে এখন ছাড়িয়া দিতে পারি নতুবা তোমাকে হাজতে বন্ধ থাকিতে হইবে।"

নলিন বলিল—"আমার কেহ জামিনদার নাই।" তখন তাহাকে হাজতে বন্ধ করা হইল।

শনিবারের দিনের বাকী অংশটুকু ও রাত্রিটা এবং রবিবারের দিন ও রাত্রি—নলিনের যে কি ভাবে কাটিল, তাহা সেই জানে, আর যিনি সকলের অন্তর্য্যামী তিনিই জানেন। হঠাৎ তাহার নিরুদ্দেশে হেমাঙ্গিনীর কি অবস্থা হইয়াছে! সে নিশ্চয় ভাবিতেছে, মনের দুঃখে নলিন হয়ত বিবাগী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নয় আত্মহত্যা করিয়াছে। হায় সে অভাগিনী হয় ত অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছে। কে তাহাকে সংবাদ দিবে, কে দুইটা ভরসার কথা বলিবে ? ছেলেটির মেয়েটিরই বা কি অবস্থা হইয়াছে ? ঘরে তিনটী টাকা ছিল, এখনও তাহারা অনশনে পড়ে নাই। কিন্তু আদালতের বিচারে নলিনের যদি জেল হয়, তবে তাহারা কি খাইবে, কোথায় যাইবে ? হয়ত তাহার স্ত্রীকে ছেলেটি কোলে করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া পথে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হইবে। কারাগারের মধ্যে বসিয়া বসিয়া—নলিন এইরূপ আকাশ পাতাল চিন্তা করে, আর তাহার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া সেই প্রস্তরময় কক্ষতল আর্দ্র হয়। রক্ষী তাহাকে নিয়মিত সময়ে খাদ্য দিয়া

যায়, সে খাদ্যকে স্পর্শমাত্র করে। রাত্রেও সে ঘুমাইতে পারে না, একাকী জাগিয়া বসিয়া থাকে।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় তাহাকে বিচারার্থ হাজির করা হইল। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিবার পর তাহার ডাক পড়িল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নে, যথার্থ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই নলিন বলিল।

ইউরেশিয়ান সাহেব বলিল, সে একটা বিজ্ঞাপন দেখিতেছিল, এমন সময়ে নলিন বিজ্ঞাপনটী আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। সাহেব তাই বিনীতভাবে নলিনকে একটু সরিতে অনুরোধ করে। ইহাতেই নলিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে ভয়ানক রকম মারিতে আরম্ভ করিল। প্রহারের চোটে তাহার নাক দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত বহিয়াছিল, কনেষ্টবল ও সার্জ্জেণ্ট সাহেব দেখিয়াছে।

ইউরেশিয়ানের কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নলিনকে বলিলেন—"তোমার উকীল আছে?"

"কেহ না।"

"কি জেরা করিব?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন স্বয়ং নলিনের উক্তিমত পেন্সিল চাওয়া প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না ইউরেশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল ও সকল কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তারপর কনষ্টেবল ও সার্জ্জেণ্ট সাহেব যেমন যেমন দেখিয়াছিল, তাহা সাক্ষ্য দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন নলিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী কেহ আছে?

নলিন বলিল—"প্রকৃত ঘটনা রাস্তার সবাই দেখিয়াছিল। সবাই বলিবে আমার কথা সত্য।"

"তাহাদের কাহারও নাম ঠিকানা বলিতে পার?"

"কি করিয়া বলিব?"

তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঁচ মিনিট ধরিয়া রায় লিখিলেন। অবশেষে বলিলেন—"তোমার ২৫৲ টাকা জরিমানা হইল। না দিলে এক সপ্তাহ কয়েদ।"

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার নলিনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা দিবে?"

নলিন বলিল—"টাকা কোথায় পাইব?"

কোর্টের কনেষ্টবল তখন নলিনকে জেলে লইয়া যাইবার জন্য কাঠগড়ার দিকে গেল। এমন সময়ে হঠাৎ একজন নূতন লোক বলিয়া উঠিল—"হুজুর, আসামী আমার বন্ধু, আমি জরিমানার টাকা দাখিল করিতেছি।"

নলিন বিস্মিত হইয়া লোকটীর পানে চাহিল। দেখিল, একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ। চোখে সোণার চশমা, গায়ে একজোড়া মূল্যবান শাল। তাঁহার মুখ নলিনের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যুবক, টাকা দাখিল করিয়া নলিনকে মুক্ত করিয়া লইলেন। তাহার পর নিকটে গিয়া চুপি চুপি তাহাকে বলিল—"আমার সঙ্গে আসুন। এখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।"

নলিন মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়া, রাজপথের নিকট আসিয়া নলিন দেখিল, একখানি ভাল গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি বলিলেন—"উঠুন।"

নলিনের মাথা তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য যে বাড়ী গিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সংবাদ লওয়া—তাহা সে করিতে পারিল না।

কলের পুতুলের মত সে সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বাবুটিও উঠিলেন। গাড়ী তখন দ্রুতবেগে শিয়ালদহ অঞ্চলের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

স্বাস্থ্য-প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা জলবায়ু ইত্যাদির গুনাগুণ দেখ ছিলাম। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের বায়ু বিশেষ প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর উপর সারাটা জায়গা বায়ু ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বায়ু ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে হাওয়ার সৃষ্টি কর্‌ছে। গ্রীষ্মকালে আমরা প্রত্যেকেই এই স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য ঘরের বাইরে আসি। অনেক ধনী ভদ্রলোক তাহাদের স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য বায়ুর পরিবর্ত্তনে কলিকাতার বহির্ভাগে সুদূর দেশপ্রান্তে চলে যান। আমাদের কলিকাতার বায়ু বড় দূষিত, কারণ এইস্থানে অনেক কল হইতে নির্গত চিমনীর ধূমরাশি, পথিমধ্যে নানারূপ আবর্জ্জনা বায়ুমধ্যে সঞ্চারিত, নানাবিধ জনসমাগমের দূষিত শ্বাস-বায়ু আমাদের মুক্তবায়ু সেবনের প্রতিবন্ধক। বিশেষতঃ এখানে বিশেষ উন্মুক্ত স্থান নাই যেখানে বায়ু সম্পূর্ণ সঞ্চারিত হতে পারে। এখানকার প্রত্যেক জায়গায় ঘরবাড়ী পরিপূর্ণ, কাজেই এই বদ্ধবায়ুর মধ্যে অবিরাম বাস করিয়া মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্তহয় তখন চিকিৎসকেরা তাদের অন্য উপায়ে কিছু পরিবর্ত্তন না লাভ করায় তাদের বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

এই বায়ু অতি অমূল্য পদার্থ, কিন্তু আমরা যাহা অনায়াসে পেতে পারি তাহারই জন্য কত রকম করে তবে ইহা উপভোগ করতে পারি। আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে বায়ু বেশী গায়ে এসে লাগলে শরীরে ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং সর্দ্দি কাশি কিংবা গাত্রে কোন বেদনা উপস্থিত হয়। কাজে কাজেই এই সব লোক বায়ুর প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেয় যাতে তাদের গাত্রে কোন বায়ু স্পর্শ না করে। তাদের আরো ভয় যে শরীর যখন কোন ব্যারামে আক্রান্ত হয় সে সময় বায়ু গায়ে লাগাটা অত্যন্ত অহিতকর। এইরূপে রুগ্ন ব্যক্তির শরীর আরও খারাপ হয়ে থাকে এবং যখন আমরা তাকে অনায়াসে এই অমূল্য বায়ুসেবন করতে দিতে পারি তখন আমরা তাহারই বিরুদ্ধে সমস্ত অন্ধকার করে দিয়ে তাকে এক দুর্গন্ধময় বাষ্পের মধ্যে পুরে রাখি এবং বোতলের পর বোতল ঔষধ দিয়েও তাকে আরোগ্যের পথে আন্‌তে পারি না। আমাদের শরীরে ঠাণ্ডা লাগার আর কোনই কারণ নাই, যত আমরা এই স্বাভাবিক বায়ুসেবন করার বিপক্ষে নিজেদের রক্ষা করব তত শরীর এমন গঠিত হবে যে যদি কোন কারণে বায়ুর তারতম্য হয় তবে সে ধাক্কা আমরা সহ্য করতে না পারায় প্রায়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। যাঁহারা এই রকম খোলা গায়ে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়ান তাঁরা প্রায়ই সর্দ্দি কাশিতে ভুগেন না বরং তাঁহারাই বেশী ভুগেন যাঁহারা নিজেদের বায়ুর পথ হতে রক্ষা করতে বৃথা সময় নষ্ট করেন। আমাদের দেশে কৃষক, মজুরেরা অনাবৃত দেহে থাকায় এদের

শরীর ঠাণ্ডায় কাতর হয় না যত আমাদের ভদ্র বালক-বালিকাদের হয়ে থাকে। আমাদের শরীর যখন কোন রোগাক্রান্ত হয় তখন রোগীর শরীর ঢাকা দিয়া তাকে জানালা দরজা সমস্ত খুলে মুক্ত বায়ুর মধ্যে রাখা খুব প্রয়োজনীয় এতে রোগী নিজেও ভাল অনুভব করেন এবং তাঁর নির্ম্মল বায়ুর শ্বাস প্রশ্বাসে রোগও আরাম হয়। আমরা ঠিক বিপরীত করি এবং আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমরাই কষ্টভোগ করি।

আমরা প্রতি মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার করিয়া লই। যখন শ্বাস টানিয়া লই তখন বায়ুর অম্লজাল অর্থাৎ অক্সিজেন আমরা শরীরে টানিয়া লই। এই অক্সিজেন মুক্ত বায়ুতে বেশী পাওয়া যায়। যেখানে সহরের মধ্যে বায়ু ধূমরাশিতে দূষিত সেখানকার অক্সিজেন অনেক ময়লা পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে সুতরাং সে বায়ু হইতে আমরা নির্ম্মল অক্সিজেন সেবন করতে পারি না। এই অক্সিজেন আমাদের দেহের রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে লাল পদার্থ করে দেয় এবং রক্তের মলিনতা সব নষ্ট করে দেয়। আমরা খোলা মাঠে সমুদ্রের ধারে, গাছপালার জায়গায় বেশী অক্সিজেন সেবন করতে পারি—সেইজন্যই কলিকাতার মধ্যে মাঝে মাঝে বিহার উদ্যান করে দেওয়া হয়েছে যেখানে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তারা বাইরে এসে মুক্তবায়ু উপভোগ করতে পারে।

এই অক্সিজেন আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অতিশয় দরকার সেই জন্য যখন মানুষ স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না তখন চিকিৎসকেরা বাহির থেকে অক্সিজেনপূর্ণ এক নল দিয়া নাসারন্ধ্রে অক্সিজেন প্রবেশ করাইয়া দেন। আমাদের সকলের ফুস্‌ফুস্ পরিষ্কার রাখিবার জন্য দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া কর্ত্তব্য। এই দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাসে ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণ আকুঞ্চন এবং প্রসারণ হয়। এই সম্পূর্ণ আকুঞ্চন এবং প্রসারণ হইলে শরীরের প্রত্যেক স্থানে নির্ম্মল অক্সিজেন উপস্থিত হয়। এবং সব মলিনতা নষ্ট করে দিয়ে শরীর নূতন রক্তে সঞ্জীবিত হয়। আমরা যে শ্বাস ফেলিয়া দেই তাহাতে অনেক শরীরের ময়লা বাষ্পাকারে নির্গত হয়। এই ময়লা বেশীর ভাগ কার্ব্বনিক এসিড। আমাদের প্রত্যেক প্রশ্বাসে এই বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। যদি শরীরের অভ্যন্তরে এই বিষময় বাষ্প অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয় তবে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বড় দ্রুত হতে থাকে কারণ ঐ গ্যাসকে যাহাতে সত্বর বাহির করিতে পারে তাহারই চেষ্টা করা হয়। আমরা দেখেছি যে পাহাড়ের ক্রমশঃ উপর স্তরে যত উঠিতে থাকি ততই হাঁপাতে থাকি অর্থাৎ আমরা খুব ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি তখন একটু শ্বাসেরও কষ্টবোধ হয়। এই সময় কার্ব্বনিক এসিড যথেষ্ট পরিমাণে শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে দেয়। ফুসফুসের মধ্য দিয়াই শরীরের দূষিত বায়ু নির্ম্মল হয়ে যায়।

পৃথিবীর উপর বায়ুর কিঞ্চিৎ পরিমাণ চাপ আছে। এই চাপ স্বাভাবিক মতে ২৯ ইঞ্চি। ইহার কম বেশী হলে ঝড় কিংবা উল্কাপাত তাহা আগে থাকতে বুঝা যায়। যখন বড় বড় জাহাজ অগাধ সমুদ্রের মধ্যদিয়া চলে যায় সেইখানকার আবহাওয়ার সংবাদ এই বায়ুচাপ মাপিবার যন্ত্র দ্বারা জানতে পারা যায়। এই বায়ুর চাপ উপরে উঠলে পরে বুঝিতে পারা যায় খুব কম এবং তখন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং যত নীচে আসা যায় ততই একটু একটু করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রক্ষিত

নীতি কথা

৺লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। মূল্য ।৶০

ভবিষ্যত জীবনে যাঁহারা স্বীয় জীবনকে মহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদের চরিত্রের ভবিষ্যৎমহত্বের বীজ বাল্যের ক্রীড়ার মধ্যে প্রথিত হইয়াছিল। বাল্যকালে যাহা একবার শুনি বা শিখি, তাহা জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির হইয়া অচল ও অটল থাকে অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে। সেই জন্য নীতির আদর্শ বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকখানি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সরল ভাষা এবং লিপিকুশলতায় বইখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দৈনিক

৺লাবণপ্রভা সরকার প্রণীত

মূল্য ১৲

দৈনিক ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থে বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

"দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সাধকের সঙ্গে সাধুজনের চরিত বা উক্তির আলোচনা একটী প্রধান উপায়। সুতরাং আমার আশা হয় যে এই গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেই বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।"

"দৈনিক সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পাঠের যোগ্য, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। ইহা ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী রচনার লালিত্য ও ভাষার মাধুর্য্যে প্রচারগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

ভাই বোন

শিশুদিগের পাঠোপযোগী গল্পের বই। ইহাতে ভাই বোনের যে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র স্নেহের ধারায় সকলের শিশু ও আমাদের প্রত্যেকের শৈশব মধুময় হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকার বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন। শিশুমহলে বইখানি অত্যন্ত আদরণীয়।

মাতা ও পুত্র

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত মূল্য ।৵০

বালকবালিকাদিগের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক গল্পের বই। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি এত করুণ যে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া যেন অশ্রুজলে সিক্ত করে। যাঁহারা এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে ইহা সুকুমার হৃদয় বালিকাদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে মাতার উচ্চ আদর্শ, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের অতুলনীয় চরিত্র, বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সকল নীতি গল্পচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মুকুল কার্য্যালয়ের ঠিকানা

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

পত্রাদি সম্পাদিকার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন :—

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাষক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

আশ্বিন ১৩৩৬ দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

মুকুল

(নব পর্য্যায়)

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

[illegible] সম্পাদিত

বঙ্গের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বালকবালিকাগণের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

সূচী পত্র

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
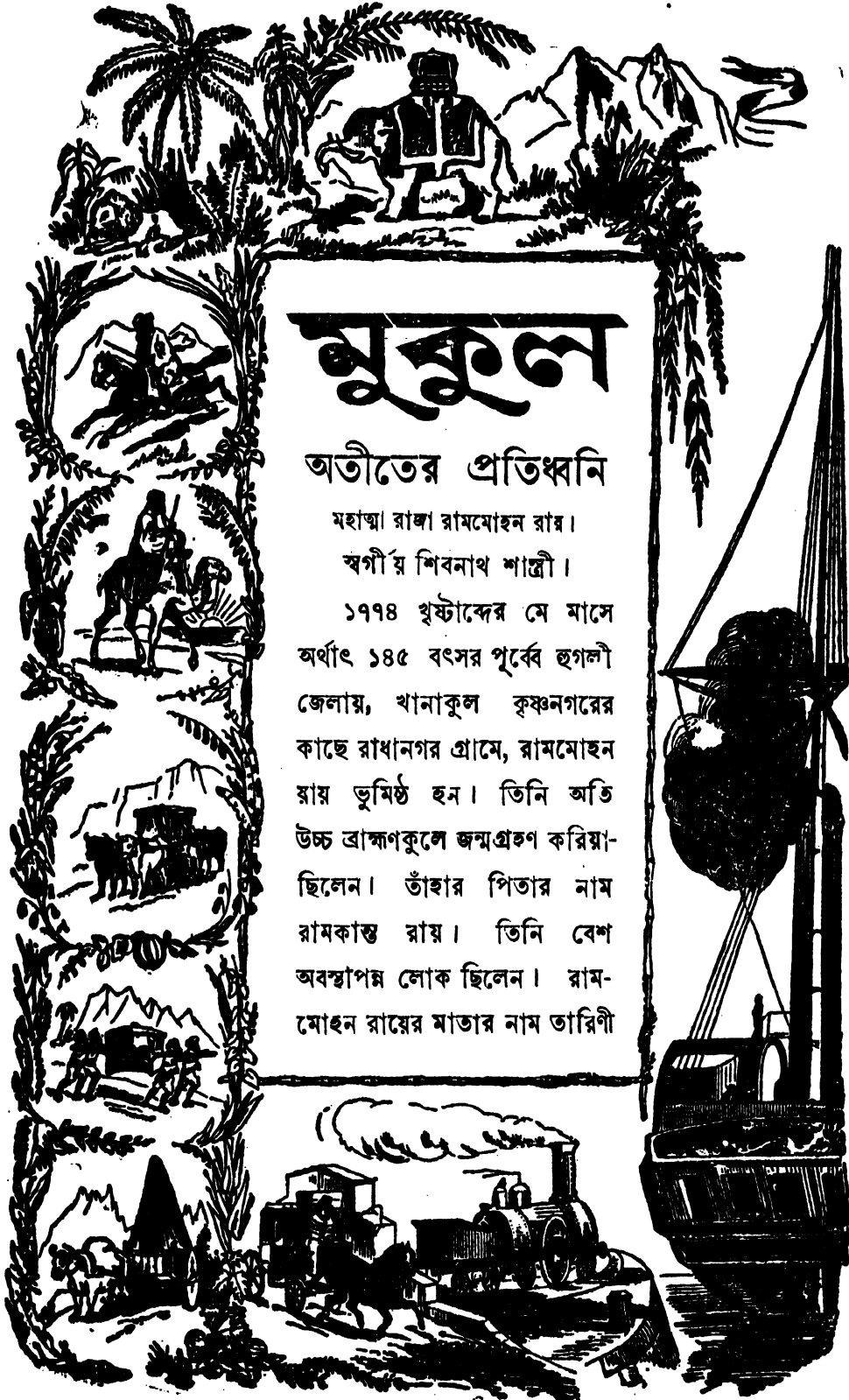
মুকুল

অতীতের প্রতিধ্বনি

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্থাৎ ১৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলায়, খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে, রামমোহন রায় ভুমিষ্ঠ হন। তিনি অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। রামমোহন রায়ের মাতার নাম তারিণী

দেবী ছিল, লোকে তাঁহাকে "ফুল ঠাকরুণ" বলিয়া ডাকিত। লোকে বলে "মায়ের গুণে ছেলে ভাল হয়"; কথাটা বড় ঠিক। রামমোহন রায়ের মা ফুলঠাকুরাণী সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্ম্মকর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, ও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন।

দেখ, রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনাই হয় না। তখন না ছিল রেলের গাড়ী, না ছিল ঘোড়ার গাড়ী, না ছিল ভাল পথ ঘাট, না ছিল স্কুল কলেজ, না ছিল হাঁসপাতাল, কিছুই ছিল না। শোনা যায় তখন হুগলী থেকে কলিকাতায় আসিতে হইলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত—যেন কত দূরদেশে যাইতেছে। আজকালকার ছেলেদের মত রামমোহন রায়ের লেখাপড়া শিখিবার সুবিধাও ছিল না। তখনকার লোকে ইংরাজি পড়িত না। আরবী পারসি পড়িত। কারণ মুসলমানী আমলের ব্যবস্থা তখনও চলিতে ছিল। আরবী পারসি জানিলে লোকের বড় বড় চাকরি হইত। রামমোহন রায় যখন খুব ছোট তখন তাঁহাকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়। তখনই তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের পিতা খুব ছোটবেলা হইতেই তাঁহাকে আরবী ও পারসি পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং ৯ বৎসর বয়সে উত্তমরূপে আরবী পারসি শিখিবার জন্য পাটনায় একজন মৌলবির কাছে পাঠান, সেখানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া বেশ সুন্দর আরবী, পারসি শেখেন, এবং আরবী ভাষায় জ্যামিতি ও আরিষ্টটেলের বই পড়েন। ভাব দেখি, ১২ বৎসরের ছেলের পক্ষে অন্য ভাষায় এই সকল কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা কিরূপ বুদ্ধির কথা। রামমোহন রায়ের আরবী পারসি পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠান। তথায় অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বেদবেদান্ত উপনিষদ পড়িয়া তিনি আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় একমাত্র পরমেশ্বরের পূজা করিতে শিখিলেন, এবং কথায় সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায়ের পিতা অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। রামমোহন রায়কে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। বালক রামমোহন তখন একাকী পদব্রজে দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। একবার মনে কর, তখনকার দিনে হাঁটিয়া দেশ ভ্রমণ করা কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার ছিল। ১৬ বৎসরের বালক রামমোহনের এই দেশভ্রমণ নিতান্তই উপকথার মত মনে হয়। তিনি যদি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতেন, তাহাহইলে, উপন্যাসের মত সেই গল্প এখন আমরা পাঠ করিতাম। এই সময়ে তিনি যে কেবল ভারতবর্ষের নানাস্থানে বেড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে যান। তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধ। সেখানে গিয়াও রামমোহন রায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেখানকার ভাষা শিখিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কুসংস্কারের কথা লামাদিগকে (বৌদ্ধ আচার্য্য) বলিলেন। তাহারা বিদেশী বালকের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া এতদূর কুপিত হইল যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলাই স্থির করিল। তিব্বতের মেয়েদের কৃপায় অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিলেন, এবং সেখান হইতে কোন প্রকারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এতদিন পরে হারানিধি পাইয়া রামমোহন রায়ের মাতা পিতা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন

হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মমত লইয়া পিতা পুত্রে আবার বিরোধ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে রামমোহন রায়কে তাঁহার সম্পাত্তর এক অংশ দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় তাহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। তাঁর মা পুত্রের ধর্ম্মমতের জন্য এতদূর বিরক্ত ছিলেন যে, তাঁহাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিবার জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জননী এমনই তেজস্বিনী স্ত্রীলোক ছিলেন! কিন্তু রামমোহন রায়কে অর্থের অভাবে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানি করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে "দেওয়ান রামমোহন" বলিত। রামমোহন রায় এই কয়বৎসর কাজ করিয়া প্রায় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবং কলিকাতায় আসিয়া স্বজাতির সেবায় সেই লক্ষ টাকা অল্পদিনের মধ্যেই ব্যয় করিয়া ফেলেন।

রামমোহন রায়ের ছবি দেখিয়া তিনি যে বেশ সুন্দর ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বোধহয় ইহা তাঁহার ঠিক ছবি নয়। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। যেমন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, তেমনি গৌরকান্তি; সুন্দর, উজ্জ্বল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড সুগঠিত মস্তক। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বীরমূর্ত্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় দুর্লভ। যেমন সুন্দর মূর্ত্তি তেমনি আশ্চর্য্য বল তাঁহার শরীরে ছিল। কি মানসিক, কি শারীরিক শক্তিসামর্থ্যে তাঁহার সমকক্ষ আজও বঙ্গদেশে কেহ জন্মে নাই। তাঁহার আকৃতির মত প্রকৃতিও অতি সুন্দর ছিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। জননীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। রামমোহন রায়ের, রাধাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ নামে দুইটী পুত্র ছিল; তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যখন বিলাতে যান তখন রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত কাঁদিতে ছিলেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, "পুরুষ বাচ্চা, কাঁদ কেন।" রাজারাম নামে তাঁহার এক পালিত পুত্র ছিল, তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং অকাতরে তাহার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। ইহা ভিন্ন সকল বালকবালিকাকেই রামমোহন রায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে ও খেলিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ছেলেরা দুলিবে বলিয়া বাগানের একটা গাছে দোলনা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও মাঝে মাঝে দুলিতেন। ছেলেদের দোলা শেষ হইলে নিজে দোলায় বসিয়া বলিতেন "এইবারে আমার পালা।" সকলে মহা আনন্দে তাঁহাকে দোল দিত। একদিন তিনি এইভাবে দোলায় দুলিতেছেন এমন সময় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন,—তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি মহাশয়! এ কি করিতেছেন?" রামমোহন রায় বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে যাইব কিনা, সমুদ্রে জাহাজ বড় দোলে, তাই আগে থেকে দুলিতে শিখিতেছি—তা না হলে সমুদ্রপীড়ায় বড় কষ্ট পাব।"

রামমোহন রায় বালকের মত সরল, অমায়িক, এবং দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি এ দেশবাসীর জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত বড় মন না হইলে মানুষ অপরের জন্য ধন প্রাণ সকলই বিসর্জ্জন করিতে পারে না। তিনি এ দেশের লোকের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন,

তাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইবে। রামমোহন রায় আমাদের সকল উন্নতি ও সকল সুখ সৌভাগ্যের মূলে। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে ছাপাখানা ছিল না, তাঁহার সময়ে প্রথম ছাপাখানা হয়। তিনি নিজ-ব্যয়ে নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে এদেশে গদ্য রচনার প্রথা ছিল না, তিনিই প্রথমে গদ্য রচনা আরম্ভ করেন; তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, তিনি একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া সে অভাব পূর্ণ করেন। ভূগোল ছিল না, তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভূগোল লেখেন, এবং খগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে এদেশের লোকের জ্ঞানোন্নতির জন্য পুস্তক রচনা করেন। যে ইংরাজি শিক্ষা ভারত-বাসীকে নবপ্রাণ, নবজাগরণ ও নবউৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাও রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি। ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি অনেক ঘুরিয়াছেন, অনেক নির্য্যাতন, অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছেন। ইহার জন্য ভারতের জ্ঞানাভিলাষী, বালক ও যুবকগণ চিরদিন রামমোহন রায়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এদেশের দুঃখিনী মহিলাদিগের জন্য রামমোহন রায়ের হৃদয় বড়ই ব্যথিত ছিল; তিনি সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণচেষ্টা করিয়াছিলেন। আইনতঃ স্ত্রীলোকের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতই না পরিশ্রম করিয়াছেন, যাহার জন্য ভারতের নারীগণের নিকট তিনি চিরআরাধ্য হইয়া থাকিবেন। দেশের গরীব প্রজাদিগের দুঃখে বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয় সর্ব্বদাই কাঁদিত। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সুদূর বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতের প্রজাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছেন! যাহাদের জন্য দীন দরিদ্রের মত ঘোর অভাবের মধ্যে বিদেশে দেহপাত করিয়াছেন, তাহারা কোনও দিনই সেই পরহিতৈষণার জন্য তাঁহাকে একটী ধন্যবাদও দিবে না! রামমোহন রায় আমাদিগের জন্য যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। যেমন বিশাল হৃদয়, তেমনি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার কথা ভাবিলে, তাঁহাকে কখনই সেই সময়ের লোক বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা বলিয়া ও যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব এখনও এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষার এই উজ্জ্বল আলোকময় দিনে, দেখদেখি কোথায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, পারসি, উর্দ্দু, ইংরাজি, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি ভাষায় এমন সুপণ্ডিত লোক দেখিতে পাও? তিনি অনর্গল সংস্কৃত, আরবী, পারসি কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন। জানি না সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্ববিষয়ে এমন আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ইউরোপখণ্ডেই বা কয়জন জন্মিয়াছেন। সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য যথায় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!

রামমোহন রায় সকল বিষয়েই আমাদের নেতা, এ দেশবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইয়া দিল্লীর নবাবের কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবেদন করিতে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। তিনিই রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন। ভারতের দুঃখী প্রজাদিগের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আন্দোলন করা ও যাহাতে সতীদাহ প্রথা নিবারণ হয় সেই চেষ্টা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, তিনি পালিত পুত্র

রাজারাম, রামরত্ন, রামহরি, এবং দুই একজন ভৃত্য লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। জাহাজে তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্নস্থানে রন্ধন করিত, তিনি ক্যাবিনে বসিয়া আহার করিতেন। রামমোহন রায় কোন-মতেই হিন্দু রীতি নীতি অতিক্রম করিতেন না। তথাপি তখনকার লোকে রামমোহন রায়কে নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া গালি দিত, এবং বিলাত যাত্রার কথা শুনিয়া দেশে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল।

জহরীই মাণিক চেনে। বিলাতের গুণগ্রাহী মহাত্মারা প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার অসাধারণত্ব দেখিয়া চমকিত হইয়া ছিলেন। বন্ধুবিহীন বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু দুদিনের পরিচিত বন্ধুরা তাঁহার ভিতর এমন কি দেখিয়াছিলেন, যাহার জন্য ৫০ বৎসর ধরিয়া অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে, তাঁহার উপবীত, কেশ ও হস্তাক্ষর অমূল্য সম্পত্তির মত বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহারা রামমোহন রায়ের সেই বীরজনোচিত সুন্দর মূর্ত্তিতে, এমন কি বিশেষত্ব দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত দেহের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া রক্ষা করিয়াছেন? ভাগ্যে তিনি এ দেশে দেহত্যাগ না করিয়া বীরপ্রসবিনী রত্নখনি, ইংলণ্ড ভূমিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নচেৎ আমরা আজ কখনই তাঁহার উপবীত, কেশ এবং অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত, তাঁহার সেই সুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম না। আমাদিগেরই জন্য গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ এ সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কপ্রদাহ রোগে তিনি শয্যাগত হইলেন, আর উঠিলেন না, ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২॥ টার সময় সকল শেষ হইল। ঘোর অন্ধকারময় ভারতাকাশের উজ্জ্বল তারকা সেদিন ব্রিষ্টল সহরে চিরদিনের মত অস্ত গেল! ইংলণ্ডবাসী বন্ধুগণ কাঁদিলেন, কিন্তু যাহাদিগের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার সবল সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ পাত হইল, তাহারা একবার 'আহা'ও বলিল না। রামমোহন রায়ের মত এ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন আর কে আছে?

রামমোহন রায় মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়া ছিলেন, যেন তাঁহাকে খ্রীষ্টান বা অন্য কোন জাতীয় লোকের সহিত একই স্থানে সমাহিত করা না হয়। সেই জন্য তাঁহার বিলাতের বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্রিষ্টল নগরে একটি উদ্যানে সমাহিত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ঐ স্থান হইতে তুলিয়া আরনোস ভেল (Arnos Vale নামক স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপর নিজ ব্যয়ে এক সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। যা হোক, তাঁহার সমাধিমন্দির যে ইংরেজ বন্ধুদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহার জন্য এ দেশবাসীগণ চিরদিন দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

দুই বন্ধু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যবন্ধু নামক গল্প তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

ভুবনেশ্বর বাবু।

গাড়ীতে সমস্তক্ষণ বাবুটি নীরবে বসিয়া রহিলেন। নলিনেরও মনের অবস্থা কথোপকথনের উপযোগী ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া তাহার বিপন্ন স্ত্রী কন্যার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার বাহিরে তাকাইয়া দেখিতেছিল, গাড়ী কোথায় যাইতেছে।

ক্রমে গাড়ী শিয়ালদহ পুল পার হইয়া বেলেঘাটায় প্রবেশ করিল, ও ক্ষুদ্র বাগান যুক্ত একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বাবুটি নলিনকে বলিলেন—"আসুন।"

নলিনও গাড়ী হইতে নামিয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাবুটি একটি সুসজ্জিত কক্ষে নলিনকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্নান আহার বোধ হয় কিছুই হয় নি?"

"না, স্নান হয় নি। বেলা ন'টার সময় আমায় খাবার এনে দিয়েছিল, কিন্তু আমি খাইনি। আমি হাজতে ছিলাম কি না।"

বাবুটি তাঁর চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, নলিনের স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দাও, একখানি ধুতি আনিয়া দাও।

নলিন বলিল—"না থাক্। আমি বাড়ী গিয়েই স্নানাহার করব। আজ তিন দিন আমি বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ। আমার খবর না পেয়ে তারা যে কি অবস্থায় আছে, তা ভগবানই জানেন।"

"বাড়ীতে আপনার কে কে আছে?"

"আমার স্ত্রী আছেন, একটি মেয়ে একটি ছোট ছেলে আছে, একজন ঝি আছে।"

"আপনার বাড়ী কোন খানে?"

"বহুবাজারে, ব্যানার্জ্জির লেনে।"

"এখনি যাবেন?"

নলিন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার মনটা ভারি অসুস্থ রয়েছে। আপনি আজ জেল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, এ উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলব না। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি ওবেলা আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব—"

বাবুটি একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"শুধুমুখে যাবেন? একটু কিছু জলটল খেয়ে যান।"

নলিন বলিল—"যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?"

"কি, বলুন।"

"আপনার নামটি কি, আর কেনই বা আমার জন্যে আপনি আজ এত কষ্ট স্বীকার করলেন?"

বাবুটি হাসিয়া বলিলেন—"আমার নাম শ্রী ভুবনেশ্বর রায়। রাজসাহী জেলায় বন্দীপুর গ্রামে।"

নলিন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিই কি বন্দীপুরের বিখ্যাত জমিদার ভুবনেশ্বর বাবু?"

ভুবনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমি সেই লোক বটে, কিন্তু বিখ্যাত নয়, সামান্য লোক।"

এই সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ নলিনের জন্য সরবৎ ও রেকাবীতে কিছু খাবার আনিয়া দিল। পিপাসায় নলিনের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, সরবৎ টুকু পান করিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। একটি রসগোল্লা হাতে তুলিয়া বলিল, "আমার দ্বিতীয় কথা টির ত উত্তর দিলেন না?"

ভুবনবাবু বলিতে লাগিলেন—"আপনার সে ঘটনা শনিবারে হয়েছিল না?—কাল রবিবার খবরের কাগজে আমি তাহা পড়লাম। পড়ে মনটায় বড় আহ্লাদ হ'ল। বাঙ্গালীরা পথে ঘাটে প্রতিদিন কত অপমানিত হয়, অথচ তার কোনও প্রতিকার করতে পারে না। কাগজে লেখা ছিল, আপনি সেই ফিরিঙ্গীটার কাছে পেন্সিলটা একবার চেয়ে ছিলেন, তাই সে আপনাকে ড্যাম্ নিগার বলে। তখনি আপনি তার নাকে—"

নলিন বলিল—"নাকে নয়, গালে।"

"গালে? লেখা ছিল, তার নাকে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিয়েছিলেন।"

"ঘুঁসি নয়, চড়। তারপর যখন সে আমায় আক্রমণ কর্‌লে, তখন ঘুঁসি চালিয়েছিলাম বটে।"

ভুবনবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বেশ করে ছিলেন, উত্তম করেছিলেন। দেখবেন, সে ফিরিঙ্গী ইহজীবনে আর কোনও বাঙ্গালীকে ড্যাম্ নিগার বলবে না।—তারপর কাগজেই লেখা ছিল, সোমবার পুলিশ আদালতে আপনার মোকদ্দমা হবে। ভাবলাম, যাই, দেখি লোকটার চেহারা কি রকম। ভেবেছিলাম, মস্ত একটা দীর্ঘাকৃতি জোয়ান মানুষ দেখব। ও হরি, আপনি যখন এসে দাঁড়ালেন, দেখি যে এক তালপাতার সেপাই। বুঝলাম, গায়ের জোরে মানুষ বীর হয় না, মনের জোরেই বীর।"

নলিন নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইল। তখন তার জলখাবার খাওয়া শেষ হইয়াছে। ঘড়িতে ঠং করিয়া একটা বাজিল। নলিন উঠিয়া বলিল—"যদি অনুমতি করেন তবে এখন উঠি। সন্ধ্যার পর আবার আসব।"

ভুবনবাবু বলিলেন—"তখন ত আমি বাড়ী থাকব না। আপনি বরং কাল সকাল বেলা আট্‌টার সময় আসবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু মনে না করেন।"

"কি?"

"আপনি চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখছিলেন। চাকরি পেলে করেন?"

"করি বৈ কি।"

"কতটাকা মাইনে হলে স্বীকার করেন?"

"আমার বড় দুরবস্থা। দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাতের যোগাড় হয়, এমন চাকরি পেলেও আমি করি।"

"আর কখনও চাকরি করেছেন?"

"না।"

"কতদূর পড়েছিলেন?"

"এণ্ট্রেন্স ফেল। হেয়ার স্কুলে পড়তাম।"

ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এমন অবস্থায়, মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকার বেশী মাইনের চাকরি যোগাড় করা শক্ত। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি। কাল বেলা আটটার সময় আসবেন।"

নিশ্চয়ই আসিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিয়া নলিন গৃহাভিমুখে চলিল।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞানের কথা

প্রবাল দ্বীপ

তোমরা প্রবাল-দ্বীপের কথা জান বোধ হয়। প্রবাল-দ্বীপ সম্বন্ধে শুধু নীরস শুষ্ক বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখস্থ করিয়া না রাখিয়া যদি তোমরা ছোট ছোট প্রবাল জন্তুদিগের কথা, তাহারা কেমন করিয়া দ্বীপ গঠন করে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তাহারা কেমন করিয়া বাস করে, কি খাইয়া বাঁচে যদি জানিয়া রাখ তবে প্রবাল-দ্বীপের নীরস শুষ্ক সূত্র জানা জানা অপেক্ষা ইহাতে কত আনন্দ পাইবে।

ছোট ছোট প্রবাল জন্তুরা তাহাদের সরু সরু শুঁড় বাহির করিয়া সমুদ্রের জলে যে সব অতি ছোট ছোট প্রাণী থাকে তাহাদিগকে টানিয়া পাকস্থলীতে লইয়া গিয়া আহার করে। তাহাদের পাকস্থলী একরূপ তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই তরল পদার্থ তাহাদের খাবারগুলি হজম করিয়া দেয়। প্রবাল কখনো দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী প্রাণী হইয়া যায়, কখনো তাহাদের দেহের একপার্শ্ব হইতে কুঁড়ির মত প্রবাল পরপর জন্মগ্রহণ করিয়া একটি ছোট গাছের মত হইয়া যায়, আবার কখনো ইহাদের দেহের ভিতরে ডিম জন্মায়। এই সকল ডিম হইতে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন তাহারা তাহাদিগকে মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই সব বাচ্চাদের গায়ে ছোট ছোট চুল থাকে, তাহারই সাহায্যে তাহারা সাঁতার কাটিয়া নূতন স্থানে গিয়া বাসা বাঁধে।

প্রবাল জন্তুর কঙ্কাল জমিয়া জমিয়া প্রবালদ্বীপ নির্ম্মিত হয়। যে সকল জন্তু হইতে লাল প্রবাল হয় তাহারা সাদা প্রবাল হইতে ভিন্ন রকমের। এই সকল প্রবালদ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরেই দেখা যায়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাত খাইয়া কেমন করিয়া সুদৃঢ় দ্বীপ গঠন করে তাহা কি তোমাদের নিকট বিস্ময়জনক মনে হয় না?

এমন কত দ্বীপ আছে—যেগুলির হ্রদের নীচে লাল, নীল, সবুজ রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী শুঁড় বাহির করিয়া জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে। তাহাদিগকে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুলের মত দেখায়। এই দ্বীপের চারিদিকেও এইরূপ ছোট ছোট প্রাণীরা সমুদ্রের ঢেউতে ভাসিয়া আসিয়া দ্বীপের গায়ে লাগিয়া যায়। এইরূপে বহু প্রবাল এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে যখন মরিয়া যায় তখন তাহাদের কঙ্কালগুলি জমিয়া ছোট ছোট পাহাড়ের মত হয়। ক্রমে তাহারা সমুদ্রের নীচে চলিয়া গেলে তাহাদের উপর আবার ঐরূপে প্রবালের কঙ্কাল জমে। এই রকমে আশ্চর্য্য উপায়ে মহাসমুদ্রের মাঝখানে প্রবালদ্বীপ নির্ম্মিত হয়। তোমাদের নিকট ইহা কি পরীর প্রাসাদ নির্ম্মাণের অপেক্ষাও আশ্চর্য্য জনক বলিয়া মনে হইতেছে না? তোমরা যদি প্রবাল না দেখিয়া থাক' তবে যাদুঘরে গিয়া দেখিয়া আসিবে। তাহা দেখিয়া একবার মনে ভাবিও যে কি অদ্ভুত কৌশলে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা এই প্রবাল-দ্বীপ গঠন করিয়াছে। এইরূপে দেখিতে শিখিলে তোমরা প্রকৃতির সব জিনিষকে ভালবাসিতে শিখিবে।

প্রকৃতির এইসব কাজ দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের সৃষ্টিরাজ্যে যে একই নিয়ম, শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতি কেমন নীরব ও অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া আমরা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা করি।

শ্রীকুমুদিনী বসু বি, এ সরস্বতী।

হাতী শিকার

গত বৎসর "মুকুলে" হাতীর বিষয় অনেক কথা বলা হইয়াছে। এবার হাতী শিকার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

তোমরা হয়ত অনেকেই হাতী দেখিয়াছ, এবং ইহাও দেখিয়াছ যে, তাহার "মাহুত" হাতীকে যখন যাহা করিতে বলে সে তখনই তাহাই করে। ইহাতে তোমরা হয়ত মনে করিবে "হাতী দেখিতে এত বড় হইলে কি হয়, কিন্তু খুব শান্ত।" হাতী যখন বনে থাকে অর্থাৎ বন্য হাতীর স্বভাব যে কত ভয়ঙ্কর তাহা তোমরা ভাবিতেও পারিবে না। বিশেষতঃ হাতী যখন মত্ত হয় তখন সে মানুষকেও মারিয়া ফেলে। এমন যে সব বন্য হস্তী,—মানুষ তাহাদিগকে ধরিয়া, শিক্ষা দিয়া, কত কাজ করাইয়া লইতেছে; হাতীর ব্যবসা করিয়া কত লোক ধনী হইয়াছে। কিন্তু এখন আর ভারতবাসীর হাতী ধরিবার ক্ষমতা নাই। যে যে বনে হাতী থাকে প্রায় সকল গুলিই গভর্ণমেণ্টের নিজের হাতে। এই হাতী-বন হইতে লাভও কিছু কম হয় না।

বন্য-হস্তী শিকার সহজ ব্যাপার নহে। কত লোক লইয়া কত আয়োজন করিতে হয়। শিকারে যে গুলি বিশেষ দরকার তাহাদের মধ্যে এই চারিটি প্রধান।

১। বিশেষভাবে শিক্ষিত হাতী—যাহারা এই বনের হাতীগুলিকে কোন রকমে উপযুক্ত স্থানে লইয়া আসিবে। এই শিক্ষিত হাতীগুলিকে "ফুন্‌কি" বলে। ইহা যেন অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—, নয় কি ?

২। ফাঁদ। পাটের দ্বারা তৈয়ারী মোটা দড়া।

৪। যে সমস্ত ব্যক্তি 'ফুন্‌কি'র সাহায্যে বন্যহস্তী ধরিবে এমন লোক। ইহাদিগকে "ফাঁন্দি" বলে।

৪। গড় অর্থাৎ খোঁয়াড়। ইহার চারিদিকে বড় মোটা খুঁটীর বেড়া থাকে বা খাল কাটা থাকে।

সাধারণতঃ গড়ে ফেলিয়া হাতী ধরা হয়।
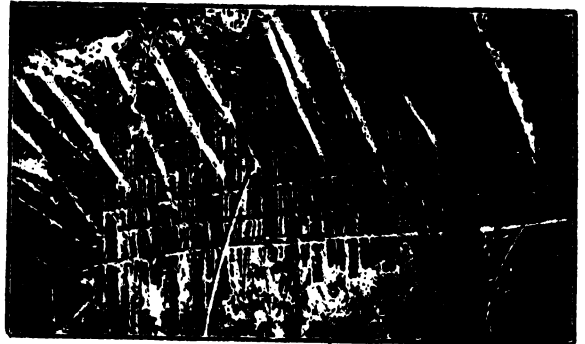
গড়ের বাহির দিক

গড় আবার যথায় তথায় প্রস্তুত করিলেই চলে

না। নোনা মাটিতে গড় প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ, বন্য হস্তী মাঝে মাঝে নূন-মাটী খায়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।—নোনা মাটির এক মাইলের মধ্যে গড় করিবার উদ্দেশ্য এই যে হাতীগুলি সহজেই ঐ স্থানে আসিবে।

গড় (ভিতরের দৃশ্য)

প্রত্যেক গড়টি যে অতি যত্ন ও শক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। চারিধারের বেড়ার খুঁটী গুলি খুব মোটা। তাহার পর ভিতরের দিকে চারিধারে ২।৩ হাত প্রস্থ ও ৩।৪ হাত গভীর নালা কাটিতে হয়। প্রত্যেক গড়ে একটি কিংবা দুইটি দরজা থাকে এবং প্রত্যেক দরজার উপর মাচা করিয়া তাহাতে লোক থাকে। দরজার বাহিরে দুইদিকে তিন কোণা বেড়া থাকে। এইগুলি প্রায় ১০০ কি ১৫০ হাত লম্বা। গড়ের বেড়া এবং এই বেড়াটি গাছের লতাপাতা দিয়া ঢাকা থাকে; কারণ হাতীগুলি যদি বুঝিতে পারে যে ইহা একটি বেড়া তবে আর সেখানে আসিবে না। সেই জন্যই যাহাতে তাহারা জানিতে না পারে এই জন্য বেড়াটি ঠিক যেন গাছের সারি এই ভাবে ঢাকিয়া রাখা হয়। এই তেকোনা বেড়াটির ভিতর একবার ঢুকিলে আর বাহিরে আসিতে পারে না, তখন তাহাকে গড়ে যাইতেই হয়।

হাতী যে কখন নূন-মাটি খাইতে আসিবে তাহার কিছু ঠিক নাই। সেই জন্য লোক সকল সময়েই গাছের উপর মাচা করিয়া দেখিতে থাকে। যখনই হাতী আসিয়া এই তেকোনার ভিতর ঢোকে—তখনই সেই লোক নামিয়া অপর সব লোকজনদের খবর দেয়। হাতী প্রায় দুই তিন ঘণ্টা নোনা-মাটীতে থাকে। এই সময় সকল লোক আসিয়া যে পথটি গড়ের দিকে গিয়াছে সেইটি বাদ দিয়া অপর সব দিক হইতে নানাপ্রকার শব্দ করিতে থাকে, বন্দুকের শব্দও মাঝে করিতে হয়। এই শব্দে ভয় পাইয়া হাতীগুলি এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকে। তাহারা যেদিকে যায় সেই দিকেরই লোকেরা ঐরূপ শব্দ করিতে থাকে। চারিদিকে বাধা পাইয়া শেষে গড়ের রাস্তা ধরিয়া তাহারা তথায় প্রবেশ করে। ঠিক ঐ সময় গড়ের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয়।

গড়ে হাতী পড়িয়াছে

এই ত গেল গড়ে ফেলিয়া হাতী ধরিবার ব্যাপার। শিক্ষিত হাতী দিয়া অর্থাৎ ফুন্‌কী দিয়া কি ভাবে হাতী ধরা হয় এবার তাহাই শোন।

যে সব বনে হাতী আছে তাহার নিকটে কোন স্থানে ফুন্‌কী ও ফাঁন্দির আড্ডা হয়। ইহাতে এক সঙ্গে অনেক গুলি লোক ও শিক্ষিত হাতীর

দরকার। প্রত্যেক ফুন্‌কীর পিঠে মোটাও শক্ত দড়ী দিয়া দুই বা তিন পা'ন্টা বাঁধা থাকে। সেই দড়ীর সহিত আর একটি ২০।২৫ হাত লম্বা দড়ী বাঁধিয়া রাখা হয়। এই দড়টির শেষে একটি ফাঁস থাকে। এক একটি শিক্ষিত হাতীর উপর একজন ফাঁন্দী ও একজন মাহুত থাকে। আড্ডার লোকজন যখন বন্য হস্তীর সন্ধান পায় তখন তাহারা সকলে সেই গুলিকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। বন্যহস্তী

ফাঁস দিয়া হাতী ধরা

হাতী যাইবার রাস্তা

গুলি ফুন্‌কীদিগকে দেখিয়া ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করে। তখন ফুন্‌কী গুলিও তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে। ফুন্‌কী বন্যহস্তীর পাশে থাকিতেই ফাঁন্দি

গাছে বাঁধা হইয়াছে।

তাহার গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করে। ফাঁস লাগলে হাতী চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে। তখন ফান্দী ক্রমশঃ দড়ী ছাড়িতে আরম্ভ করে। আবার যখন হাতী কাছে আসে তখন সেই দড়ী গুটাইয়া লয়। এইরূপ ক'রতে করিতে হাতীটি ক্লান্ত হইয়া যায়তখন তাহাকে ফুন্‌কীর পাশে আনিয়া ফাঁদটি ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফাঁদের মুখে একটি ছোট দড়ী দিয়া বাঁধা হয়।

ইহার পর হাতীকে আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহাকে ঘাস জল খাওয়াইয়া একটি গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়।

আর এক ভাবে হাতী ধরা যায়। বন্যহস্তী যে সকল পথ দিয়া সাধারণতঃ বনের মধ্যে যাওয়া আসা করে সেই পথে এক বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া তাহা এমন ভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হয় যে তাহা অন্য স্থান অপেক্ষা ভিন্ন বলিয়া কিছুতেই সন্দেহ করিতে না পারে। হাতী তাহার উপর দিয়া যাইবার সময় সহজেই সেই ঢাকা ভাঙ্গিয়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই প্রণালী এখন অতি অল্প স্থানেই চলিত আছে।

এই বন্যহস্তীগুলিকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা আগামী বারে জানিতে পারিবে।

বন্ধুলাভ

স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় মৃণালিনীর মুখ গম্ভীর—সে একেলাই চলিল। প্রায়ই সে বাড়ীতে যাইবার সময় একেলাই যায়। তাহার কোন বন্ধু ছিলনা। বন্ধুলাভের আকাঙ্ক্ষা যদিও তাহার মনে প্রবল ছিল।

মৃণালিনী অহঙ্কার করিয়া বলিত "কেউ আমাকে কথায় হারাতে পারবে না। আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব ও বলব।"

একটু আগেই সে জয়ন্তীকে বলিয়াছে যে সে তাহাকে কোন কাজে সাহায্য করিতে পারিবে না। তাহারা এক ডেস্কের মধ্যেই স্কুলে বই রাখিত। জয়ন্তী বলিয়াছিল "আমাদের ডেস্কটা বড় অপরিষ্কার হয়েছে, একে গোছাতে হবে।" মৃণালিনী বলিল—"যদি অপরিস্কার হয়ে থাকে ত তুমি পরিস্কার করলেই পার, আমি ও কাজ করতে পারবনা।"

জয়ন্তী বলিল—"আমি ভেবেছিলাম আমরা দুজনে মিলে ডেস্কটা বেশ গুছিয়ে রাখব।" এমন সময় আর কয়েকজন মেয়ে আসিয়া জয়ন্তীকে তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাড়ী যাইতে ডাকিল। মেয়েরা মৃণালিনীর দিকে তাকাইল না এমন কি তাহাদের পাশের বাড়ীতে যে অমলা থাকিত সেও তাহাকে ডাকিলনা।

সেজন্য মৃণালিনী গম্ভীর মুখে একেলা বাড়ীর দিকে রওনা হইল। মৃণালিনী অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে অমলাকে বেশী ভালবাসিত কিন্তু সেও তাহার জন্য অপেক্ষা করিল না। অমলা শান্ত শিষ্ট মেয়ে ছিল, তাহাকে সকলেই ভালবাসিত।

মৃণালিনী ভাবিল—"আমি অমলাকে জিজ্ঞাসা করিব কে তার কাছে আমার বিরুদ্ধে কি বলেছে, যে সে আর আমার কাছে আসেনা।"

সে বাড়ী যাইয়া কিছু খাইয়াই অমলার কাছে

গেল। অমলা তখন রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া বাসন মাজিতেছিল এবং গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছিল।

মৃণালিনী ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে বলিল—"আমি ভেবেছিলাম তোমাদের ঝি আছে।"

অমলা বলিল—"হাঁ, আমাদের ঝি আছে কিন্তু তার এক আত্মীয়র সঙ্গে সে দেখা করতে যেতে চেয়েছিল, আমি তাকে বললাম আমি তার কাজটা এ বেলায় করে দেব।"

মৃণালিনী বলিল "বাঃ বেশ ত, আমি হলে কক্ষন এরকম করতামনা। সে যে কাজের জন্য মাহিনা পাচ্ছে, সে কাজ সে করবেনা?"

অমলা অবাক হইয়া বলিল ঝি অনেক কালের পুরান ঝি, আমায় মানুষ করেছে, সে আমায় কত ভালবাসে, আমার জন্য বেচারী কত খাটে। আমি আজ তার কাজটা করছি। কাল তা করব না আবার সে আমার জন্য হয়ত কোন ভাল খাবার তৈরী করে দেবে, না হয়ত আমার কাপড়গুলি সব সাবান দিয়ে পরিস্কার করে দেবে, এরকম তার মন।"

মৃণালিনী আর কিছু বলিলনা। অমলা কাজ করিতে লাগিল সে বসিয়া দেখিল। অমলা বাসন মাজিতে মাজিতে হাসিতেছিল। মৃণালিনী বলিল "তুমি হাসিছ কেন?"

অমলা বলিল "বাসনগুলি বেশ ঝক্‌ঝক করছে দেখলে ঝি খুব খুসী হবে। সে খুসী হয়েছে দেখলে আমারও আনন্দ হবে।"

মৃণালিনী বলিল "আমি জানতে এসেছি তুমি কেন আমার উপর রাগ করেছ?"

অমলা অবাক হইয়া বলিল "তোমার উপর রাগ করেছি! কই, আমি ত রাগ করি নাই।"

"তবে তুমি আমার কাছে আসনা কেন?"

অমলা বাসনগুলি গুছাইয়া রাখিয়া বলিল "আমি তোমার কাছে যাই না, তাইত, ইচ্ছা করে ত নয়, ভাল লাগেনা তাই হয়ত যাই না।"

"কেন আমি কি তোমায় খেয়ে ফেলব যে আমার কাছে আসনা।"

অমলা বলিল "এই রকম সব কথা বল বলেইত তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না—কি কথাই বললে যে আমায় তুমি খেয়ে ফেলবে!"

মৃণালিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল "কথায় কোন মেয়েকে আমাকে হারাতে দেব না।"

অমলা বলিল "কে তোমায় কথায় হারাতে চায়। আমি ত চাই না। অন্য মেয়েরাও চায়না জানি। তারা তোমার সঙ্গে ভাব করতে চায় তা তুমি করতে দাও না। তোমার কর্কশ কথায় তুমি তাদের তাড়িয়ে দাও।"

মৃণালিণী "আমি বন্ধু চাই কিন্তু আমার একটাও বন্ধু নাই।"

অমলা বলিল "বন্ধু পেতে হলে মিষ্ট ব্যবহার করতে হয়। যারা সে রকম করতে পারে না লোকেরা তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না।"

মৃণালিনী বলিল—"অমলা, এ কথা ত আমার মনে হয় নাই যে আমার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা মিষ্ট নয়।"

মৃণালিনী এই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল "আমি বন্ধু চাই, আমি এবার থেকে মিষ্টি কথা বলতে চেষ্টা করব।"

পরদিন সে কর্কশ কথা না বলিতে খুব চেষ্টা করিল। সময় সময় তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কঠিন হইত। কিন্তু সে যতই খারাপ অভ্যাসটা ত্যাগ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল

ততই সে কৃতকার্য্য হইতে লাগিল এবং মিষ্ট ও বন্ধু ভাবে কথা বলা সহজ হইয়া আসিল।

তখন একদিন আনন্দের সহিত সে অমলাকে বলিল যে তাহারা দুজনে মিলিয়া ডেস্কটা পরিষ্কার করিবে—এই কথা বলার ফলে দেখিল যে অমলাও বন্ধুভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া তখন হাসিল এবং বলিল সে খুব খুসী হয়ে ও কাজটা করিবে।

পরদিন বিকালে তাহারা দুজনে ডেস্কটী পরিষ্কার করিল। তাহার পর গল্প করিতে করিতে তাহারা খুব হাসিতেছিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া কয়েকটী মেয়ে তাহাদের কাছে আসিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল "এরা অত হাসছে কেন?"

মৃণালিনী এ কথা শুনিতে পাইয়া বলিতে যাইতেছিল "তোমাদের তাতে কি?" কিন্তু সে তাহা না বলিয়া হাসির কারণ তাহাদের বলিল। তখন মেয়েরা মৃণালিনী ও অমলাকে তাহাদের সঙ্গে খেলতে ডাকিল।

অমলা বলিল "মৃণালিনী, দেখত তুমি ওদের সঙ্গে হেসে কথা বললে, তাইত ওরা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।',

মৃণালিনী বলিল "আমিও কর্কশ কথা বলবনা বলে প্রাণপণে চেষ্টা করছি সেটা ওরা বুঝতে পেরেছে তাই তাদের ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী।

মণ্টি-ক্রীষ্টো

ফ্যারিয়ার মৃত্যু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে এডমণ্ডের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সে ফ্যারিয়ার ঘরের দেওয়ালে টক্ টক্ শব্দ শুনিতে পাইল। যখন তাহার এবং ফ্যারিয়ার কথা বলিবার দরকার হইত, তখন এইরূপ সঙ্কেত করিয়া একজন আর একজনকে ডাকিত। এত রাত্রিতে ফ্যারিয়ার কি দরকার এই ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিল। একবার ভাবিল তাঁর কি কোন অসুখ করিয়াছে? কথাটি মনে করিয়া এডমণ্ড শিহরিয়া উঠিল, আবার একলা হইতে হইবে ইহা ভাবিতে তাহার কষ্ট হইত। পালিয়ে যাবার আশা,—যেটা ফ্যারিয়া বিশ্বাস করিত সে পারিবে—তাহাত অনিশ্চিতের কথা। এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে পাথরখানি সরাইয়া সে বৃদ্ধের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—তাহার বন্ধুটি কুণ্ডলা পাকাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে। এডমণ্ড ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তিনি তখনও মারা যান নাই—অজ্ঞান হইয়া আছেন। সে তাঁহাকে সাবধানে উঠাইয়া বিছানার উপর ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্যারিয়ার জ্ঞান হইলে তিনি চোখ খুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন। তারপরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"তোমার বৃদ্ধ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় লইবার সময় হয়েছে এডমণ্ড।"

এডমণ্ড তাঁকে বাধা দিতে যাচ্ছিল তখন বৃদ্ধ বলিলেন—"এই ভালো—কিন্তু মরবার আগে আর দু একটা কথা বলতে চাই তাই তোমাকে ডেকেছি।" তিনি এডমণ্ডকে সেই গুপ্ত ধন কোথায় কি ভাবে আছে সেই লাইন কয়টি মুখস্থ বলিতে বলিলেন। সে কার্ডিনাল স্পাডার উইল খানি মুখস্থ বলিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"এডমণ্ড, যখন এই ধনের অধিকারী হবে তখন এই ফ্যারিয়ার আর তার পরামর্শের কথা ভুলোনা।" তারপর বৃদ্ধ চুপ করিয়া থাকিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। এডমণ্ড ফ্যারিয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ ফ্যারিয়া চোখ বুজিয়া ছিলেন—কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া এডমণ্ডের দিকে তাকাইয়া হাসিতে ছিলেন। যেন বলিতে ছিলেন "ভয় কি"। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল তিনি ঘুমাইতেছেন—কেন না আর চোখ খুলিতে ছিলেন না। এডমণ্ড তাঁহার পানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল বৃদ্ধের হাত দুখানি খুব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ভয়ে ঝুঁকিয়া পড়িল—নাকের কাছে হাত লইয়া দেখিল আর নিশ্বাস পড়িতেছে না। বুঝিল ঘুমের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এডমণ্ড শোকে দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িল—সে বৃদ্ধের হাতখানি ধরিয়া সেই ভাবেই বসিয়া থাকিল। সকাল বেলা জেল বাবুর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার চেতনা হইল। সে তাড়াতাড়ি কোন রকমে তাহার ঘরে আসিয়া, পাথর দিয়া গর্ত্ত বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই জেলবাবু চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

এডমণ্ড তখনও ঘুমাইতেছে দেখিয়া তিনি কিছুই আশ্চর্য্য হইলেন না। যাদের কোন কাজ নাই তাদের কুঁড়েমির জন্য খানিকটা বক্ বক্ করিয়া কুঁজোর খানিকটা জল আর কয়েদীর সকাল বেলার খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল।

দরজায় যেই চাবি দেওয়ার শব্দ হইল অমনি এডমণ্ড উঠিল। ফ্যারিয়ার ঘরের দেওয়ালে কান দিয়া খুব মনযোগের সহিত শুনিতে লাগিল সেখান হইতে কোন শব্দ আসে কি না। শুনিতে পাইল জেল বাবু ফ্যারিয়ার ঘরে ঢুকিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি তুমি ও ঘুমাচ্ছ ?" তারপরে বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে বিছানার কাছে গিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "একি এযে মারা গিয়েছে—যাই গভর্ণরকে ডেকে আনি।" এডমণ্ড বুঝিতে পারিল জেলবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—পরে কি হয় তাহা জানিবার জন্য সে সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা গেল এবং ঘরে কয়েক জন ঢুকিল। এডমণ্ড শুনিল গভর্ণর জেলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ফ্যারিয়া তাহাকে কোন অসুখের কথা বলিয়াছিল কিনা। জেলবাবু বলিলে কয়েদী ভালই ছিল—রাত্রিতে অন্যদিনের মত খাইয়াছে। তারপরে ডাক্তার ফ্যারিয়াকে পরীক্ষা করিয়া বলেন—তাহার আর প্রাণ নাই। তখন গভর্ণর মৃতদেহ কবর দিবার হুকুম দিলেন। জেলবাবুকে বলিলেন—"আজ রাত্রি দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ইহাকে কবর দেবে।"

তারপরে সকলে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এডমণ্ডের পলায়ণ।

যতক্ষণ না চারিদিক চুপচাপ হইল ততক্ষণ এডমণ্ড অপেক্ষা করিল। যখন সে বুঝিল জেলের কর্ত্তারা চলিয়া গিয়াছে—এখন আর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন সে আবার অ্যাবির ঘরে

উপস্থিত হইল। ক্যারিয়ার মৃতদেহ তখনও বিছানার উপরে ছিল—কিন্তু তাহা একটি বড় থলির মধ্যে রাখিয়া মুখটি শেলাই করা হইয়াছে।

এডমণ্ড অনেকক্ষণ ফ্যারিয়ার অবস্থার দিকে তাকাইয়া থাকিল। এই লোকটির কাছে সে অনেক প্রকারে ঋণী। তাহাদের প্রথম যেদিন মিলন হয় সেই দিনকার কথা মনে পড়িল—তারপরে দীর্ঘ দিনগুলি দুজনে কত ফন্দী আঁটিয়া, আলোচনা করিয়া, দুজনে দুজনকে ভালবাসিয়া কাটাইয়াছে—তাহাই ভাবিতে লাগিল। এখন আবার সে একলা হইল—কি করিয়া সঙ্গীহীন দিনগুলি কাটাইবে মনে করিয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এক যদি ফ্যারিয়ার দেখ না পাইত তবে সে কোন রকমে দিনগুলি কাটাইতে পারিত, কিন্তু একবার তাহাকে পাইয়া আবার সঙ্গীহীন হইতে তাহার মন চাহিতেছিল না। ভাবিতে ভাবিতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"অসহ্য অসহ্য একেবারে অসহ্য—আমি এখানে থাকতে পারব না। হঠাৎ তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিল—সে কেন নিজেকে ফ্যারিয়ার জায়গায় রাখিয়া দিক না? লোকেরা যখন কবর দিবার জন্য মৃতদেহ লইতে আসিবে—তাহারা মরা কি জীবন্ত মানুষ লইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিবেনা। একবার যদি এই ঘরের বাহির হইতে পারে—হয়ত ভগবানের আশীর্ব্বাদে মুক্তি পাইবার উপায় জুটিবে।

গভর্ণর বলিয়াছেন রাত্রি দশটা হইতে এগারটার মধ্যে কবর দেওয়া হবে। জেলবাবু আটটার মধ্যে কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবে। এডমণ্ড ঠিক করিল জেলবাবুর শেষবার চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে—তারপরে সে যে উপায়টা ভাবিয়াছে সেই উপায়ে পালাইবার চেষ্টা করিবে। সেদিন সারাটা বিকাল বেলা সে তার মৃত বন্ধুর ভালবাসার কথা, আর তার কাছে কত কি শিখিয়াছে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

জেলবাবু রাত্রিবেলা খাবার দিতে আসিয়া তাহাকে জানাইল যে পাশের ঘরের কয়েদীটি মারা গিয়াছে। এডমণ্ড কোনরূপ চঞ্চলতা না দেখাইয়া শুনিল—তারপরে বলিল—"কোন কোন লোক খুব ভাগ্যবান্।" জেলবাবু করুণার চক্ষে একবার তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে খাইতে বলিয়া চলিয়া গেল। এডমণ্ড একবার ফিরিয়া ও দেখিলেন না কি খাইতে দিয়াছে। জেলবাবু চলিয়া যাইবার দুই মিনিট পরেই সে ফ্যারিয়ার ঘরে আসিল।

ভালমন্দ ভাবিবার সময় ছিলনা। ফ্যারিয়ার তৈরী ছুরীর সাহায্যে থলির মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। বৃদ্ধের মৃতদেহটা বাহির করিয়া তাঁহাকে সাবধানে লইয়া সে নিজের ঘরে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার বিছানার উপর ফ্যারিয়াকে শোয়াইয়া মুখটি দেওয়ালের দিকে ফিরাইয়া দিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিল। কাজটা সারিয়া আবার ফ্যারিয়ার ঘরে ফিরিয়া গিয়া গর্ত্তটা বন্ধ করিল। তারপরে নিজে থলির মধ্যে ঢুকিয়া ভিতর হইতে মুখটি বাঁকিয়া ফেলিল। সঙ্গে ছুরীখানি রাখিল—এত বড় একটা সাহসের কাজ করিতে কোন রকম অস্ত্র সঙ্গে না রাখাটা ভাল মনে করিল না।

যখন এইভাবে অপেক্ষা করিতেছিল তখন নানাপ্রকার চিন্তা তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। 'হয়ত জেলবাবু কোন কাজে আবার ফিরিয়া আসিবে আর সমস্ত ব্যাপারটা জানিতে পারিবে?' 'হয়ত ডাক্তার সাহেব ফ্যারিয়া সত্যই মরিয়াছে কিনা জানিবার জন্য আবার পরীক্ষা করিতে চাইবে।' নানা ভাবনায়, উৎকণ্ঠায় মন ভরপুর—সময় ও আর যেন কাটে না।

জেলের প্রহরী ঘণ্টা বাজাইল—দশটা রাত্রি। এডমণ্ড আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। একবার ভাবিল, পালাইয়া দরকার নাই—ধরা পড়িলেঃ আরও কষ্ট দিবে। আর ভাবিল 'যা হবার তা ত হবেই চেষ্টা করিতে দোষ কি?' কিছুক্ষণ পরেই দুই জন লোক ঘরে ঢুকিল। একজন বলিল—"লোকটা বুড়ো হয়েছিল কিন্তু ভারীতে কম নয়।"

এডমণ্ড বুঝিতে পারিল তাহারা সিঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। হঠাৎ বাতাস খুব ঠাণ্ডা লাগিল—এডমণ্ড বুঝিল তাহারা জেলখানার বাহিরে আসিয়াছে।

বাহকেরা তাহাকে মাটির উপর নামাইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল "ওটা তৈরী হয়েছে?" সে ভাবিল আবার কি তৈরী হচ্ছে—বোধ হয় কবর দিবার গর্ত্ত করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সে বুঝিল একটি ভারী জিনিষ তার পায়ের উপর রাখিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা হইতেছে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল "বেশ শক্ত করে বেঁধেছ ত?" আরেকজন উত্তর করিল—"আজ্ঞে—আমার সে বুদ্ধিটুকু আছে।"

এডমণ্ড আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই ত ব্যাপার কি? তারপরে মনে হইল একজন তার মাথা ও একজন তার পা করিয়াছে।

একজন বলিল—"প্রস্তুত হয়েছ?"

যাহারা তাহাকে করিয়াছিল বলিল "হাঁ"

'এক'

'দুই'

'তিন'

এডমণ্ড বুঝিল তাহারা তাহাকে শূন্যের মধ্যে খুব জোরে ছুঁড়িয়া দিয়াছে ও সে পাক খাইয়া নীচের দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতেছে। তাহার মনে হইল—এ পড়ার বুঝি আর শেষ হইবে না। হঠাৎ গম্ভীর গর্জ্জনের শব্দ তার কানে গেল—কিছুক্ষণ পরেই সে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ অনুভব করিল। তাহার পায়ে একটী পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের ভারী লোহার গোলা বাঁধিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদ্রই সেই জেলখানাটীর কবর-খানা। থলির মধ্যে আবদ্ধ এডমণ্ড গভীর সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল। সে কি আর বাঁচিবে? জেল হইতে মুক্তি পাইতে গিয়া, বুঝি সে অকালে প্রাণ হারায়! (ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলেন্দু সরকার।

সোণার খণির সন্ধানে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরে)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশের ছোট দুটি বোন নির্ম্মলা ও সরযূ যে চা বাগানের বড় বাবু বলাই চাটুর্য্যের বাসায় আছে, সে কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। বলাইবাবুর কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একটি বিবাহ। সেজন্য তিনি সপরিবারে গরুর গাড়ীতে ডিব্রুগড় যাইতেছেন। ডিব্রুগড় হইতে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ, আবার সেখান হইতে রেলগাড়ীতে কলিকাতা যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে নির্ম্মলা ও সরযূ কলিকাতা যাইতেছে। এজন্য দুটি বোনেরই মনে আনন্দ

আর ধরে না। তাহারা ভাবিতেছে, কলিকাতা গেলেই মেয়েদের বোর্ডিংয়ে, সরলার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, আবার তাহার ভালবাসা পাইবে।

বলাই বাবুর গরুর গাড়ী ভয়ানক জঙ্গলের পথ দিয়া যাইতেছিল। তিনি সঙ্গে যে খাবার জল আনিয়াছিলেন, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে ; তাই সঙ্গের ছেলেটি জল পিপাসায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। একটু দূরেই একটা ঝরণা দেখিতে পাওয়া গেল। ঝরণাটি উঁচু পাহাড় হইতে নীচুতে নামিয়া কোন্ নদীর সঙ্গে গিয়া যেন মিশিয়াছে। তাহার জল অতি নির্ম্মল। বলাইবাবু ঝরণা দেখিয়াই জল নেবার জন্য গাড়ী থামাইলেন। কিন্তু কে জল আনিতে যাইবে ? এই জঙ্গলে বিস্তর বাঘ, রাত্রে ভয়ে কোন গরুর গাড়ীও এই পথ দিয়া চলে না। বলাইবাবু নিজে বাঘের ভয়ে গাড়ী হইতে নামিলেন না ; গাড়োয়ান জাতিতে বড় ছোট, তাই সে যে জল ছুঁইবে, গৃহিণী তার ছেলেকে তাহা খাওয়াইবেন না। কাজেই তিনি হুকুম করিলেন—"নির্ম্মলা, তুই এই ছোট কল্‌সীটি নিয়ে ঝরণার কাছে যা, তাড়াতাড়ি কল্‌সীতে জল ভরেই গাড়ীর কাছে ছুটে আসিস্।"

ভয়ে নির্ম্মলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গিন্নির হুকুমের মত কাজ না করিলে কি আর রক্ষা আছে ? কাজেই সে একটিবার ছোট বোন সরযূর মুখের পানে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া, জল আনতে চলিল। সরযূ কহিল, "দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

গিন্নি মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবে বাঘের মুখে ?" সরযূর আর কথা বলিতে সাহস হইল না। সে দিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নির্ম্মলা ঝরণার কাছে গিয়া যখন কল্‌সীতে জল ভরিল, তখনই এক বাঘিনী বিকট গর্জ্জন করিয়া, সঙ্গে বাচ্ছা লইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে জঙ্গল হইতে বাহির হইল। গাড়ীর দুই গরু দেখিতে ত প্রকাণ্ড, কিন্তু এমনই ভয় যে, একটিবার বাঘের পানে চাহিয়াই ছুটিয়া চলিল। আর কাহার সাধ্য সেই দুই গরুকে থামাইয়া রাখে ? সরযূ "দিদি দিদি" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে কান্নায় গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল না। সে গরীবের ঐ গরু দুটিই সম্বল ; বাঘ আসিয়া গরুর উপর লাফাইয়া পড়িলে, সে কেমন করিয়া গরু দুটিকে বাঁচাইবে ? গাড়োয়ান গাড়ী খুব ছুটাইয়া চলিল, নির্ম্মলা ঝরণার কাছেই পড়িয়া রহিল। বলাই বাবু মনে করিলেন, যে প্রকাণ্ড বাঘ, আবার তাহার সঙ্গে একটি বাচ্ছা ; নিশ্চয়ই সে বাচ্ছা লইয়া খাবার জন্য শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। বাঘের কাছে মানুষের রক্ত যেমন উপাদেয় খাদ্য, এমন আর কিছুই নয়, কাজেই বাঘিনী এবং তাহার বাচ্ছা এতক্ষণে নির্ম্মলার তাজা রক্ত খাইয়া হাড় মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন গাড়ী ফিরাইয়া নির্ম্মলার কাছে গিয়া আর লাভ কি ?

কিন্তু নির্ম্মলাকে স্বয়ং ঈশ্বরই রক্ষা করিলেন। সে, বাঘ বাহির হইয়াছে দেখিয়াই, সাম্‌নের পাহাড়ের এক গহ্বরে গিয়া লুকাইল এবং গহ্বরের মুখ পাথর দিয়া বন্ধ করিল। সাম্‌নের মানুষ পলাইয়া গেল দেখিয়া, বাঘিনী হরিণ খুঁজিতে খুঁজিতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। নির্ম্মলা অনেকক্ষণ পরে, সাহস করিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিল, কিন্তু কোথায় গরুর গাড়ী ? অসহায় বালিকা সেই জঙ্গলে পাগলের মতন ছুটাছুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে কয়েক জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিবার জন্য সেই বনে আসিয়া পড়িল। নির্ম্মলাকে তাঁহারা একটি রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিল। দুঃখিনী বালিকা সেইখানে চোখের জলে ভাসিয়া বলিতে

লাগিল—সরষূ, তুমি কোথায়? তোমায় না দেখে আমি কেমন করে থাক্‌ব?"

একটি পরীর মতন সুন্দর বালিকাকে এই ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া, ছোট ষ্টেসনের লোকজন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তাহার কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। ঠিক্ এই সময়ে এক-খানি রেলগাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। সেই গাড়ীতেই সুরেশ এবং তাহার মা ডিব্রুগড় যাইতে-ছিলেন। সুরেশ গাড়ী হইতে নির্ম্মলাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে ত চা-বাগানে বলাই বাবুর বাড়ীতে ঢুকিয়া এই মেয়েটিকেই দেখিয়াছিল। তাহার বোন ছাড়া এত দুঃখ আর কাহার হইতে পারে? আর কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে অসহায় অবস্থায় একটি ষ্টেসনে পড়িয়া কাঁদিতে পারে? সুরেশ গাড়ী হইতে নামিয়াই বালিকার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল—"তোমার নামই কি নির্ম্মলা? তোমরা দুই বোনই কি চা-বাগানে বলাইবাবুর বাড়ীতে ছিলে? এখানে কেমন করে এলে? তোমার ছোট বোনটি কোথায়?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমারই নাম নির্ম্মলা, আমিই বলাইবাবুর বাড়ীতে ছিলাম। তিনিই আমাকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে, আমার ছোট বোনটিকে নিয়ে ডিব্রুগড় গিয়েছেন।"

সুরেশের মা গাড়ীতে বসিয়া নির্ম্মলার সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তিনি আর সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; তাড়াতাড়ি নির্ম্মলার কাছে আসিয়াই, সেই বার তের বৎসর বয়সের মেয়ে-টিকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মা তাহার সমস্ত স্নেহই মেয়েটির প্রাণে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, "নির্ম্মলা আমার, দুঃখিনী কন্যা আমার, তুমি কি অভাগিনী মাকে চিন্‌তে পার? এস, এস, আমার প্রাণের ভিতরে এস, আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়ে যা'ক।"

নির্ম্মলা অবাক্ হইয়া একবার মায়ের মুখের পানে, আর একবার সুরেশের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। ষ্টেসনের মানুষগুলির কাছে সবলই যেন ভেল্কীবাজির মতন মনে হইল। মা নির্ম্মলাকে বলিলেন, "এই তোমার দাদা সুরেশ, আশ্চর্য্য ভাবে এর প্রাণ রক্ষা হয়েছে; এবং আশ্চর্য্য ভাবেই এর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে।"

নির্ম্মলা যে কি বলিবে, ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না। সে অনেকক্ষণ মায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু সুরেশকে কেমন করিয়া চিনিবে? তাহার ত কোন কথাই সে মনে করিতে পারে না। তাহাদের নৌকা ডুবির সময়ে সে যে অতি ক্ষুদ্র একটি বালিকা ছিল।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর বালিকাকে মা নিজের হাতেই ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বোন সরযূর জন্য নির্ম্মলার চোখের জল ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল, "আমার সঙ্গে সরযূ যদি মাকে আর দাদাকে দেখ্‌তে পেত, তবে তার মন যে পুলকে পূর্ণ হয়ে যেত। কে বল্‌বে আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি না?"

সুরেশ কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি সরযূর জন্য কেঁদ না। তুমি কি বুঝ্‌তে পারছ না, আমা-দের মস্তকে কেমন আশ্চর্য্যভাবে ঈশ্বরের করুণার ধারা নেমে এসেছে। তাঁর করুণা না হলে কি এই-খানে মার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হত? বলাইবাবু সরযূকে নিয়ে নিশ্চয়ই আজ ডিব্রুগড় থাক্‌বেন। কাল ছাড়া ত তাঁর কলিকাতার ষ্টিমার পাবার আর যো নেই। আমি আজ ডিব্রুগড় পৌঁছেই, যেমন করেই হো'ক না কেন, সরযূকে খুঁজে বের কর্‌বই।"

সুরেশের মাতা কহিলেন, “সরযূকে চোখের সাম্‌নে দেখে, প্রাণ জুড়াবার জন্য আমারও মন আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ না হোক, কাল তাকে পাবই। এখন যে তুমি আমার সাম্‌নে রয়েছ, তোমার মুখে কি হাসি দেখ্‌তে পাব না? সেই তুমি যেমন মিষ্টি করে আমাকে মা বলে ডাক্‌তে, তেম্‌নি কি আমায় মা বল্‌বে না? আমাকে বুঝি এখনো তোমার মা বলে বিশ্বাস হচ্ছে না?”

নির্ম্মলা। বিশ্বাস হবে না কেন মা? সরযূর জন্য আমার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে, সেই জন্যই আমি তোমাকে মা বলে ডাক্‌তে পারি নি। আচ্ছা মা, সরযূর কথা কি তোমার মনে পড়ে? না, না, আমি কি কথা বল্‌ছি? তুমি সরযূকে ভুল্‌বে কি করে? সে যে সকলের চেয়েই ছোট। তবে তুমি তাকে দেখ্‌লে কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌বে না। কেমন করে চিন্‌বে? তুমি যে তাকে একটুখানি রেখে চলে গিয়েছ।

মা। লক্ষ্মী মা আমার, তুমিই ত কত ছোট, বল ত কেমন করে বোনটিকে মানুষ কর্‌লে?

সুরেশ। মা, সে দুঃখের কাহিনী শুনলে পাষাণও গলে যায়।

মা। সুরেশ, তুমি বুঝি সবই সুহাসিনীর কাছে শুনেছ?

নির্ম্মলা। সুহাসিনী কে? আমার দিদি? তিনি কি বেঁচে আছেন? দাদা যে বেঁচে আছেন, তা সরলাদিদির মুখেই শুনেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তোমার সুরেশ দাদার সঙ্গে দেখা হবে। তা দেখা ত আজ হ'ল। কিন্তু আমার বাবা আর দিদি মরে গেলেন কেন? তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আর সরযূ কাছে থাক্‌লে আজ কি সুখই হত!

সুরেশ। নির্ম্মলা, তোমার দিদির কথা কিছু মনে হয়?

নির্ম্মলা। কিছুই না। কেমন করে মনে হবে? আমার শুধু মার কথাই মনে ছিল। আপনার কথাও ত আমার মনে ছিল না। পাহাড়ে অসভ্যদের দেশে একটু বড় হয়ে মার কাছে শুধু আপনার আর দিদির গল্প শুন্‌তাম।

সুরেশ। তাই বুঝি মাকে পেয়েই তুমি খুসী হয়েছ? আমাকে দেখে খুসী হও নি?

নির্ম্মলা। আপনাকে দেখে খুব খুসী হয়েছি। যে দিন কলকাতায় সরলা দিদি বল্লেন, আপনি বেঁচে আছেন, সেই দিন থেকে কতবার ইচ্ছা হয়েছে আপনাকে একবার দেখি। তা, কেমন ক'রে দেখ্‌ব? আপনি যে কোথায় আছেন, তা ত সরলাদিদিও জান্‌তেন না। তিনিও যে আপনাকে খুব ভালবাসেন। কত দিন আপনার কথা বল্‌তে বল্‌তে চোখের জল ফেল্‌তেন।

সুরেশ। সরলার কাছে শুনেছি, তোমরা তাঁকে খুবই ভালবাস।

নির্ম্মলা। আপনার সঙ্গে তাঁর কবে দেখা হল? তাঁর কাছেই বুঝি আমাদের সব কথা শুনেছেন?

সুরেশ। হাঁ, তারই কাছে আমি তোমাদের কথা শুনেছি। কিন্তু নির্ম্মলা, ডিব্রুগড় গিয়েই সরযূকে যখন তোমার কাছে নিয়ে আস্‌ব, যখন তোমরা দুটি বোন মিলিত হবে, যখন তোমাদের দুজনকে দেখে মা'র মনে আনন্দ আর ধর্‌বে না, তখন এমন একটা আশ্চর্য্য কথা বল্‌ব, যা শুনে তোমরা সুখে একেবারে ভেসে যাবে।

নির্ম্মলা। সে কথা, এখনি বলুন না।

সুরেশ। না, তা এখন ত বল্‌ব না।

মা। নির্ম্মলা, তুমি ত দাদার সঙ্গেই কথা

বল্‌ছ ? আমার সঙ্গে মন খুলে কথা ত বল্‌ছ না ? তবে বুঝি আমার চেয়ে দাদাকেই বেশী ভাল-বাস্‌বে ?

নির্ম্মলা। মা, তোমার চেয়ে দাদাকে কেমন করে বেশী ভালবাস্‌তে পার্‌ব ? বড় হয়ে দাদাকে ত দেখ্‌তে পাই নি, তোমাকেই দেখেছি, তোমার, কাছেই দাদার সব কথা শুনেছি। এখনো মনে পড়ে, দাদার কথা আর দিদির কথা বল্‌তে বল্‌তে তুমি চোখের জলে ভেসে যেতে।

মা। তখন তুমি যে কি কর্‌তে তা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তুমি বল্‌তে "মা, তুমি কেঁদ না, তোমার চোখের জল ত দেখ্‌তে পারি নে।" তার পরে আমার যখন অসুখ হল, তখন তুমি অতি ছোট মেয়ে হয়েও আমার যে রকম সেবা কর্‌তে, তা দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম, মনে হত, তুমি আমার মেয়ে নও, কোন্ দেবলোক হতে যেন আমারই কাছে নেমে এসেছ।

নির্ম্মলা। মা, আপনি ত পাগল হয়ে রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের রেখে চলে গেলেন। তার পরে কেমন করে ভাল হলেন ? ভাল হয়ে কোথায় ছিলেন ? কেমন করেই বা দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হল ?

সুরেশের মা একটি একটি করিয়া আপনার সকল কথা বলিলেন। নির্ম্মলা কহিল—"মা, আপনি চলে যাবার পরে, পাহাড়ের পুরুষ মেয়ে সকলেই আমাদের যে কত ভালবেসেছে, তা কেমন করে বল্‌ব ? তারা নানা রকম খাবার জিনিষ এনে আমাদের দিত, আর বল্‌ত, তোমাদের মা নিশ্চয়ই আবার ফিরে আস্‌বেন।" এখন ত দেখ্‌ছি পাহাড়ীদের কথাই সত্য হল, তোমাকেও ফিরে পেলুম, দাদার সঙ্গেও দেখা হল। ঈশ্বর করুণ ডিব্রুগড় গিয়েই যেন সরযুকে কাছে পাই। তাকে না পেলে কোন সুখেই ত সুখী হতে পার্‌ব না।"

সুরেশ। পাহাড়ীদের কথার চেয়েও আমার কথা সত্য হবে। আজ না হো'ক, কাল যে সরযুকে কাছে পাবে, সে কথা আমি নিশ্চয় করেই বল্‌তে পারি। শুধু কি তাই, কিছুদিন পরে যে তোমাদের দিদিকেও দেখ্‌তে পাবে।

নির্ম্মলা। আপনার কথা শুনে আমার মন যে কিছু রকম কর্‌ছে, আমি তা ভাল করে বুঝ্‌তেই পার্‌ছি নে।

মা। সরযূ আমাকে দেখ্‌লে মোটেই চিন্‌তে পার্‌বে না।

নির্ম্মলা। তা আর কেমন করে চিন্‌বে ?

মা। তার চেহারা কি এখন তোমারই মতন হয়েছে ?

নির্ম্মলা। আমি তা ঠিক্ বল্‌তে পারি নে। কিন্তু মা, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার মেয়েরা বল্‌ত, আমার চেহারা নাকি ঠিক্ সরলা দিদির মতন। মা, তুমি নিশ্চয়ই দাদার কাছে সরলা দিদির কথা শুনেছ।

সুরেশের মাতা ছেলেকে আর মেয়েকে লইয়া যতক্ষণ গাড়ীতে রহিলেন, ততক্ষণ কতই সুখদুঃখের কথা হইতে লাগিল। আজ যদি সরযূ তাঁহাদের কাছে থাকিত, তাহা হইলে না জানি এই মাতা, পুত্র ও কন্যার মনে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

রেলগাড়ী ডিব্রুগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। সুরেশ মাতাকে এবং নির্ম্মলাকে লইয়া তাঁহাদের আগের বাড়ীতেই উঠিলেন। সে বাড়ীতে যে এক উকিল বাবু বাস করিতেছিলেন, আমরা তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উকিল বাবু অত্যন্ত সমাদর করিয়া সবাইকেই আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। সুরেশের মাতা একদিন দেবতার মতন স্বামী ও

সন্তানদের লইয়া পরম সুখে এই বাড়ীতে বাস করিতেন। আজ একে একে কত সুখ ও দুঃখের কথাই তাঁহার মনে পড়িল। তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া, কিছু জলখাবার খাইয়া বাড়ীটির চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা সরযূকে কাছে পাইবার জন্যই অস্থির হইয়া উঠিল। সুরেশ একটু বিশ্রাম করিয়াই বলাইবাবুর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু সে দিন আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সরযূর জন্য সমস্ত রাত্রি কাহারও আর ঘুম হইল না। সরযূকে যদি কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে? সরযূকে আর পাওয়া যাইবে না, এই কথা ভাবিতেও যে সকলের হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

আদিম যুগের কথা

মানব-জাতির প্রথম আবিষ্কার অস্ত্র। আজকাল নিত্য নূতন কত জিনিষ আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু সবার মূল অস্ত্র। সেই জন্যই বোধ হয় এই সভ্য যুগে মনুষ্যগণও কেবল নূতন নূতন মরণ কল বাহির করিতে ব্যস্ত, এবং যে জাতি যত নূতন ও উন্নত প্রকারের অর্থাৎ একই সঙ্গে অধিক মানুষ মারিতে পারিবার কল আবিষ্কার করিবে সেই জাতিই পৃথিবীর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হইবে। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি—মানুষ অনেক পুরাতন আচার ব্যবহার ছাড়িয়াছে, বহুদিকে বহু উন্নতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি ভাবিলে দেখা যায় এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সেই আদিম অবস্থাতেই আছে। ঈশ্বরের যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির আদর্শ তাহা লাভ করা জগতের অনেক লোকেরই, আমরা যাহাদিগকে সভ্য বলি তাহাদেরও হইয়া উঠে নাই।

মানুষের মনে এই অস্ত্র আবিষ্কারের কথা কেন যে প্রথম উঠিল তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। তোমরা জান যে সেই আদিকালে মানুষের ঘর বাড়ী ছিল না, বনে জঙ্গলে পর্ব্বতের গুহায় নানা প্রকার হিংস্র জন্তুগণেরই সহিত বাস করিতে হইত। অধিকাংশ সময়েই তাহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে অর্থাৎ হাতাহাতিতে মানুষদেরই পরাজয় হইত। ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে কেবল মানুষকে এমন বুদ্ধি দিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের এই বুদ্ধি নাই। এই বুদ্ধির বলেই মানুষ ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া হিংস্র জন্তুগণের হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবে। হাতের কাছে পাইল পাথর। পাথর ছুড়িয়া তাহারা মারিতে আরম্ভ করিল। এই পাথরই হইল মানুষের প্রথম অস্ত্র এবং মানুষ এই পাথর ব্যবহার আরম্ভ করিল বলিয়া সেই সময়কে আমরা পাথরের সময় বা প্রস্তর-যুগ বলি। সেই যুগ যে কতদিন ধরিয়া চলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। ইহার মধ্যেই যাহার ধারগুলি একটু পাতলা ও তীক্ষ্ণ সেইগুলিই ছিল অতি আদরের। প্রথম প্রথম এই প্রস্তরগুলি ভাঙ্গিয়া ঘসিয়া ধার করিয়া

লইতেও তাহারা জানিত না। ক্রমে ক্রমে বহুকাল পরে এই প্রস্তর হইতেই আদিম মানবগণ বর্শা তরবারী প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই যুগের প্রায় মধ্যভাগ হইতে মৃত পশুর হাড়দ্বারা সেই সময়ের অস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী চলিত হয়। এখন হইতেই ধনুর সাহায্যে দূর হইতেই মানবগণ পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেদের জীবন রক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কার করিল।

এবারে কিন্তু আরও একটি আশ্চর্য্য কথা বলিব যাহা শুনিয়া তোমরা একেবারে অবাক হইয়া যাইবে। যে আগুন না হইলে আমাদের এখন এক মুহূর্ত্তও চলে না—তখন সেই আগুনের কল্পনাও কেহ করিতে পারে নাই। অগ্নির পরিচয় যে মানবের নিকট কিরূপে জ্ঞাত হইল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে বন প্রভৃতি দগ্ধ হইতে দেখিয়া—সেই আগুনের আলোক ও উত্তাপে হয়ত তাহারা ভাবিয়াছিল ইহাদ্বারা তাহাদের উপকার হইতে পারে। অগ্নির দ্বারা রন্ধন করিয়া খাইবার কথা কাহার মনেও উদিত হয় নাই। রাত্রির গভীর অন্ধকার দূর করিবার জন্যই বোধ হয় প্রথমে তাহাদের অগ্নির প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহারা যখন দুইটি পাথরকে ঠোকাঠুকি করিয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত করিত তখনই হয়ত তাহারা বুঝিয়াছিল দুইটী জিনিষের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু পাথরত আর জ্বলিতে পারে না। চোখের সামনে বড় বড় বন পুড়িয়া যাইতে দেখিত। তাহারা ভাবিল, দুইটি কাঠের টুকরা ঘর্ষণ করিলে, আগুন পাওয়া যাইতে পারে। কাজে করিয়াও তাহারা মনের মত ফল লাভ করিল। সেই হইতেই মানবসমাজে অগ্নির প্রচলন হইয়াছে। একটী কাষ্ঠখণ্ডের উপর ছোট একটি গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর অন্য একটি সরু লম্বা কাষ্ঠখণ্ড দিয়া অতি জোরে দুই হাতের দ্বারা বা দড়ি দিয়া ঘুরাইলেই অতি দ্রুত ঘর্ষণের ফলে অগ্নিকণা সকল বাহির হইত। তখন যে দ্রব্যে শীঘ্র আগুন ধরিতে পারে গাছের শুকনো পাতা প্রভৃতি তাহা নীচে রাখিলেই পুড়িয়া গিয়া আগুন হইত। এই ব্যাপার কষ্টকর বলিয়া সকলে সকল সময় আগুনে কাঠ দিয়া সকল সময়েই সেই আগুন জ্বালাইয়া রাখিত। অনেক সময় কাহারও আগুন নিবিয়া গেলে অপরের নিকট হইতে লইয়া আসিত। এইরূপে আগুন জ্বালার প্রণালী ছোটনাগপুর প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার হাজার হাজার বৎসর পরে মানুষ যখন লোহার ব্যবহার জানিতে পারিল—তখন চক্‌মকি নামক একরকম পাথরে তাহা দিয়া আঘাত করিয়া আরও সহজে আগুন পাইতে লাগিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের বাংলাদেশে এই প্রণালীর প্রবল প্রচলন ছিল। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিতে, ঘরের অন্ধকার দূর করিতে, বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না।

আগুনের এক প্রধান প্রয়োজন রন্ধন কার্য্যে। কিন্তু রাঁধিয়া খাইবার কথা সেই আদিম মানবগণের মনে আসিয়াছিল আগুন পাইবার বহুকাল পরে। আর তখনও রাঁধিবার কোন পাত্র ছিল না। মাটীর হাঁড়ী, কলস প্রভৃতি আমাদের নিত্য-ব্যবহারের জিনিষগুলি অতি সামান্য মনে করি বটে; কিন্তু যিনি বা যাঁহারা ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারা কিছু কম বুদ্ধিমান বা বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। এই পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যে মানবসমাজকে কতখানি উন্নত, সভ্য করিয়া দিয়াছেন তাহার সীমা নাই। প্রথম প্রথম; অবশ্য

তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় নাই অর্থাৎ গাছের পাতাতেই ভোজন হইত। এখনও এ প্রথা আমাদের দেশে বহু পরিমাণে প্রচলিত। এমন কি দাক্ষিণাত্যে বড় বড় ভোজের ব্যাপারে কলা-পাতার ঘটী, বাটী, গেলাস, রেকাব ব্যবহার করিবারই রীতি আছে। কিন্তু, রাঁধিবার উপায় দরকার প্রভৃতি না জানায় প্রথম প্রথম মাংস আগুনে পোড়াইয়া বা সাঁকিয়াই খাইত। কখনও বা একটি ইগল বা শূকরশিশু আগুনের উপর রাখিয়া অত্যন্ত গরম পাথর দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিত। তাহার মাংস অল্প মাত্র পুড়িলে বা সিদ্ধ হইলেই অতি আনন্দের সহিত ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইত। মাংস হইতে চর্ম্ম পৃথক করিয়া খাইবার জ্ঞান তখন ছিল না।

প্রথম মাংস সিদ্ধ করিবার প্রণালী মাটিতে গর্ত্ত করিয়া। সেই গর্ত্তের মধ্যে নিহিত পশুর চামড়া এমনভাবে রাখা হইত যে তাহা দেখিতে ঠিক বড় একটি বাটীর মত হইত। সেই বাটী জলে পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে মাংস রাখা হইত। কতকগুলি পাথর অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া সেই জলে ফেলিয়া দিলে জল গরম হইয়া মাংস সিদ্ধ হইত। বোধ হয় এই গর্ত্তের আকৃতি হইতে পাত্রের কল্পনা তাহাদের মনে প্রথম জাগিয়া ওঠে। তাহার পর ধীরে ধীরে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই এ সকলের উন্নতি হইতে লাগিল। কোনও জিনিষই এমন ভাবে মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে না যাহাতে আর উন্নতি করিবার কিছু থাকে না। সকলই উন্নতির পথে চলিবে ইহাই নিয়ম। সে নিয়ম সেই আদি কালেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে।

বিচিত্র-সংবাদ

"জলের গাছ"— শুনিয়া হয়ত তোমরা হাসিবে। সত্যিই কিন্তু জলের গাছ আছে। অবশ্য ঐ গাছটি জলের নয়, মেঘে যেমন জল হয় তাহা হইতেও সেইরকম জল হয় বলিয়া উহার নাম জলের গাছ। এই প্রকার গাছ পেরু প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। গাছটি যেমন লম্বা তাহার পাতাও সেই রকম খুব বড়। বাড়েও তাড়াতাড়ি। গাছটির জন্য যত্নও করিতে হয় অতি অল্প। গাছগুলির জল দিবার ক্ষমতাও কম নহে। এক একটি গাছ হইতে প্রায় এক গ্যালন জল পাওয়া যায়। বাড়ীর কাছে এ গাছ থাকিলে গরমে মরিতে হইবে না, জমীতে থাকিলে ফসল মরিবে না। ভগবানের কি দয়া!

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাক টিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার:—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫॥৹ ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

১৩৩৬ — দ্বিতীয় বর্ষ … সংখ্যা

মুকুল

(নব পর্য্যায়)

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ সম্পাদিত

বঙ্গের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বালকবালিকাগণের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

দোল খাওয়া

মুকুল

স্বর্গ-সুখ

ভাল মা আর
ভাল ছেলে ;
স্বর্গ-সুখ আর
কাকে বলে ?

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দুই বন্ধু।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পুরাণো ঝি।

নলিন গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র ঝি বলিয়া উঠিল—"তোমার কি আক্কেল বল দেখি, বাবু? তুমি আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া, বৌমা কেঁদে কেটে জ্বর ক'রে বসেছে, আমরা ভাবনায় ছট ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছি, দিন কাটে ত রাত কাটে না, রাত কাটে ত দিন কাটে না। পুলিশ আদালত থেকে বেরিয়ে তুমি আবার কোথায় চ'লে গেলে বল দিকিন্?"

"জ্বর হয়েছে নাকি?" বলিতে বলিতে নলিন দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। ঝি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

শোবার ঘরে গিয়া নলিন দেখিল, তাহার স্ত্রী খোকাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, খুকী বসিয়া একটা বাটিতে করিয়া মুড়কি খাইতেছে।

নলিন বলিল,—"তোমার জ্বর হয়েছে?"

হেমাঙ্গিনী কিছুই বলিতে পারিল না। নীরবে খোকাকে স্বামীর কোলে দিয়া, চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খুকী মুড়কি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া, ছলছল নেত্রে পিতার পানে চাহিয়া রহিল।

নলিন স্ত্রীর চক্ষু হইতে অঞ্চল সরাইয়া দিয়া বলিল—"কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কর। জ্বর কি এখনও রয়েছে, হিমু?"—সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিয়া দেখিল।

হেমাঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—"জ্বর নাই।"

নলিন গিয়া বিছানায় বসিল। ঝির তখন আবার মুখ খুলিল। সে বলিতে লাগিল—"জ্বর হবে না? এসে যে দেখ্‌ছে পেয়েছ, এই ঢের। পরশু শনিবার তুমি সকালবেলা বেরিয়ে গেলে, সমস্ত দিন এলে না, আমরা কোনও খবরই পেলাম না। সমস্ত দিন বউমা নাইলে না, খেলে না। সাড়ে চার আনা পয়সা টেরাম ভাড়া দিয়ে আমার ভাসুর-পোকে তোমায় খুঁজতে ভবানীপুরে পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বল্লে, তুমি দশটার সময়ই বিপিনবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ। এই না শুনে কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যেবেলা বউমার জ্বর এল! উঃ কি জ্বরের ধূম, কি কাঁপুনি! গা যেন আগুন। কেঁপে কেঁপে শেষে জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তার পর আমি উনুন জ্বেলে দুটো আলুভাতে ভাত রেঁধে ছেলেটাকে মেয়েটাকে খাওয়াই। আহা সারাদিন বাছারা কিছু খায়নি—"

খুকী বাধা দিয়া বলিল—"কেন ঝি, তুই ত আমাদের মুড়্‌কি কিনে এনে দিয়েছিলি, আমরা ত খেয়েছিলাম।"

নলিন বলিল—"তুমি দাঁড়িয়ে থেক না হিমু, দুর্ব্বল শরীর, বিছানায় এসে বস।"

হেমাঙ্গিনী খোকাকে কোলে লইয়া মেঝেতেই বসিল।

নলিন বলিল.—"আমি পুলিশ আদালতে গিয়েছিলাম, সে খবর কি ক'রে পেলে, ঝি ?"

ঝি নিজের সব বর্ণনা সাঙ্গ না করিয়া সে কথার উত্তর দিবে না। সে ব'লিতে লাগিল—"তার পর বলি, শোন না। রবিবার ভোর বেলায় বৌমার জ্বরটা ছেড়ে গেল। বেলা ৮টার সময় আমি বোসেদের বাড়ী গিয়ে মেঝবাবুকে বল্লাম,– 'বাবু, আমাদের ত এইরকম বিপদ, বৌমা ত কেঁদে কেটে জ্বর ক'রে বসেছে, আমাদের বাবু কোথায় গেল, একবার খবর নিতে পার ?' মেঝবাবু ত কথাই কাণে তোলে না। শেষে বল্লে,—'কোথা মদ খেয়ে প'ড়ে আছে, আমি কোথা খুঁজব, বল।' অনেক বলা কওয়াতে শেষে বল্লে, 'ঝি, এ কল্‌কাতা সহর, কোথা তাকে খুঁজে পাব ? আচ্ছা, আমি লোক জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।' তিন চারবার গিয়ে মেঝবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'বাবু কোনও খবর পেলে ?' বল্লে,—'না ঝি, কোনও খবরই পাইনি।' সেই কথা এসে বউমাকে বল্লাম। বউমা ত আবার কান্না আরম্ভ কর্‌লে বল্লে, আমি বিষ খাব, আমি গলায় দড়ি দেব—"

বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—"হ্যাঁঃ—তুই আর জ্বালাস্‌নে, ঝি। যা, শীগ্‌গির উনুনটা ধরিয়ে দে। রান্না চড়াই।"

ঝি বলিল—"যাচ্ছি, মা, যাচ্ছি। তারপর জান, বাবু, আজ্‌কে সকালে ৮টার সময় মুড়ি মুড় কি কিনে এনে খোকাখুকীকে খাইয়ে, বউমাকে বল্লাম, বউমা, দু' আনার পয়সা দাও, বাজার থেকে চুনো মাছ কিনে আনি, মাছের ঝোল ভাত রেঁধে খোকাখুকীকে খাওয়াও। দু'দিন খাও নি, তুমিও দুটো খাও। বউমার চোখ দিয়ে টস্‌ টস্‌ ক'রে জল পড়্‌তে লাগল। বল্লে,—'ঝি, আমার মাছ খাওয়া ভগবান্‌ রেখেছেন কি না, তা ত জানিনে।' আমি বল্লাম, 'চুপ কর, চুপ কর, অমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে নেই।' তারপর পয়সা নিয়ে বাজারে গেলাম মাছ কিনতে। মাছ নিয়ে ফির্‌ছি, পথে দেখা হ'ল মুখুয্যেদের ছেলে বিজয়ের সঙ্গে। বিজয় বল্লে, 'জান ঝি, তোমাদের বাবু পরশু একটা সাহেবকে খুব মার দিয়েছে, বেদম মার!' এই ব'লে পোড়ারমুখো ছেলে হা হা ক'রে হাস্‌তে লাগল। আমি বল্লাম,—'ও বিজয়, আমাদের বাবু কোথায়, বিজয় ?' বিজয় বল্লে, 'তোমাদের বাবুকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে। জান ঝি, তোমাদের বাবু সাহেবটার নাকে এমন ঘুঁসি মেরেছিল যে তার নাক দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রক্ত প'ড়েছে।' বলে, আর পোড়ারমুখো ছেলে হা হা ক'রে হাসে। আমি বল্লাম,—'ও বিজয়, আমাদের বাবুকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেছে, বিজয় ?' সে বল্লে,—'তা কি জানি ? আজ লালবাজার পুলিশ আদালতে তোমাদের বাবুর মোকদ্দমা হবে। আমরা অনেক ছেলে দেখ্‌তে যাব, আজ আর স্কুলে যাচ্ছিনে।' ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল নয় বউমা, আমি এসে তোমাকে বলিনি ?"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"হাঁ ব'লেছিলে। সে সব কথা পরে হবে, ঝি। এখন তুমি কয়লায় আগুন দিয়ে বাজার গেকে দু' পয়সার চিনি আন। বাবুকে একটু সরবৎ করে দিই, জল খান।"

ঝি রান্নাঘরে চলিয়া গেল। নলিন বলিল, "জলখাবার আন্‌তে দিতে হবে না,—আমি এইমাত্র জলখাবার খেয়ে আস্‌ছি।"

নলিন তখন সংক্ষেপে, শনিবার হইতে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিল,—"বোধ হয় অনাহারে মর্‌তে হবে না। সেই বাবুটি বলেছেন, ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের একটি চাকরি তিনি আমায় জুটিয়ে দেবেন। দেখি, কি হয়।"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"নিশ্চয় হবে। ভগবান্ কখনই আমাদের ভুলবেন না। তুমি এখন স্নান ক'রে ফেল।"

স্নান করিতে করিতে ঝির নিকট তাহার বাকী বর্ণনাটুকুও নলিন শুনিয়া লইল। মোকদ্দমার কথা শুনিয়া ঝি বোসেদের মেঝবাবুর কাছে আবার গিয়াছিল। মেঝবাবু সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য মারপিটের মোকর্দ্দমা, বেশী কি আর হইবে, বড় জোর বিশ ত্রিশ টাকা জরিমানা হইতে পারে। তাই শুনিয়া ঝি নিজের পুরাতন বালা জোড়াটা বন্ধক রাখিয়া অনেক কষ্টে পঞ্চাশটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং অনেক কষ্টে রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পুলিশ আদালতের দিকে যাইতেছিল! কাছাকাছি পৌঁছিয়া ঝি দেখিল, বাবু একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আদালতের সিঁড়ি হইতে নামিয়া গাড়ী করিয়া কোথা চলিয়া গেলেন। তখন ঝি, "ও বাবু, ও বাবু," বলিয়া অনেকবার ডাকিয়াছিল, কিন্তু নলিন তাহা শুনিতে পান নাই।

ক্রমশঃ

রোগের কারণ

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এস-সি, এম্ বি, (গোল্ড মেডালিষ্ট)

কি করিলে শরীর ভাল থাকে, অসুখ বিসুখ হয় না, তাহা জানিতে হইলে শরীর খারাপ হয় কেন, রোগের কারণ কি তাহা জানা আগে দরকার।

পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়াছেন যে অধিকাংশ রোগই পোকা হইতে উৎপন্ন হয়। ভাল কথায় এই পোকাকে জীবাণু বলে। পোকা বলিলে সাধারণতঃ কীটজাতীয় জীব বুঝায়; অধিকাংশ রোগের জীবাণু কিন্তু কীট-জাতীয় নহে উদ্ভিদজাতীয়। কলেরা, নিউ-মোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের জীবাণু উদ্ভিদজাতীয়; কেবল ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের জীবাণু উদ্ভিদ জাতীয় নহে। তোমরা হয় ত ব্যাক্‌টিরিয়া (Bacteria ; singular Bacterium) এবং ব্যাসিলি (Bacilli ; singular-Bacillus) নামক রোগোৎপাদক জীবাণুর নাম শুনিয়া থাকিবে। ইহারাও এক প্রকার উদ্ভিদ। বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় পুরাতন হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি পড়িয়া থাকিলে তাহাদের গায়ে ছাতা পড়ে। এই ছাতা পড়া আর কিছুই নহে, তাহাদের গায়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উদ্ভিদ জন্মে। ব্যাক্‌টিরিয়া এবং ব্যাসিলি এই জাতীয় উদ্ভিদ।

এই সকল জীবাণু অতি ক্ষুদ্র। দিনের বেলায় যদি কোন ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, একটি মাত্র জানালা কিম্বা দরজা খুব অল্প ফাঁক করিয়া রাখা যায়, আর সেই ফাঁক দিয়া যদি সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে যেখান দিয়া সেই রৌদ্রের আলো ঘরের ভিতর গিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে শত শত অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রোগের জীবাণু সকল এই সকল

ধূলিকণা অপেক্ষাও ছোট। এক ইঞ্চিকে দশ হাজার ভাগে ভাগ করিলে যত ছোট হয়, রোগোৎপাদক অধিকাংশ জীবাণু তাহা অপেক্ষাও অনেক ছোট। এত ছোট জিনিস খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ নামক (microscope) এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহার সাহায্যে ইহাদিগকে দেখিতে হয়। এই যন্ত্রের গুণ এই যে ইহার ভিতর দিয়া দেখিলে খুব ছোট জিনিষও খুব বড় দেখায়। তোমরা যখন বড় হইবে, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজে পড়িতে যাইবে, তখন এই যন্ত্র সাহায্যে রোগের পোকা এবং আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবে।

চোখে দেখা যায় না এত ক্ষুদ্র এই যে সকল প্রাণী মানুষের তুলনায় তাহারা কিছুই নহে; কিন্তু যখন কোটী কোটী এই সকল প্রাণী একত্র দলবদ্ধ হইয়া মানুষকে আক্রমণ করে তখন মানুষের ন্যায় বলবান এবং বুদ্ধিমান জীবও তাহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়; মানুষ তখন পীড়িত হয় এবং কখন কখন মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। একতাই বল।

ভগবান্ এই সকল জীবাণু এত ক্ষুদ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সংখ্যায় অধিক না হইলে ইহারা কিছুই করিতে পারিত না; সেইজন্য ভগবান ইহাদিগকে খুব শীঘ্র সংখ্যাবৃদ্ধি করিবারও ক্ষমতা দিয়াছেন। তোমরা দেখিয়া থাকিবে কোন একটি জায়গায় একটি কলাগাছ পুঁতিয়া দিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার চারিদিকে আট দশটি ছোট ছোট চারা গাছ যদি তুলিয়া দশ জায়গায় বসান যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি গাছের গোড়া হইতে আবার দশটি করিয়া গাছ বাহির হইয়া থাকে। অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে একটি কলাগাছ হইতে এক শতটি কলাগাছ উৎপন্ন হইতে পারে। সেইরূপ এই সব রোগের একটি জীবাণু যদি কোন ভাল জায়গায় রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই একটি জীবাণু দুইটিতে পরিণত হয়। আর আধ ঘণ্টা পরে সেই দুইটি জীবাণু হইতে চারিটি জীবাণু উৎপন্ন হয়। দুই ঘণ্টা পরে উহাদের সংখ্যা ১৬ এবং তিন ঘণ্টা পরে ৬৪ হয়। এইরূপ প্রতি ঘণ্টায় তাহাদের সংখ্যা ৪গুণ বৃদ্ধি হয়। তোমরা হিসাব করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে এই একটি জীবাণু হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে দুই কোটীরও উপর জীবাণু উৎপন্ন হয়। ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি!

যেমন সব জমিতে সকল গাছ জন্মিতে পারে না, তেমনি মানুষের দেহেও সকল জীবাণু জন্মিতে পারে না। যে সকল জীবাণু মানুষের দেহে জন্মিতে পারে না, তাহারা কোন ক্রমে মানুষের দেহে প্রবেশ করিলেও, তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়; কাজেই তাহারা মানুষের কোনরূপ পীড়াও উৎপাদন করিতে পারে না। কেবল যে সকল জীবাণু মানুষের দেহে ভালরূপ জন্মিতে ও বাড়িতে পারে, তাহারাই মানুষের রোগ উৎপাদনে সমর্থ হয়।

গাছ সতেজ করিতে হইলে তাহার গোড়ায় জল দিতে হয়। এই সকল জীবাণুকেও সতেজ রাখিতে হইলে জল আবশ্যক। কিন্তু গাছের বীজ যেমন শুখাইয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না, জল পাইলেই তাহা হইতে চারা বাহির হয়, সেই রকম এই সকল জীবাণু জল না পাইলেও একেবারে মরিয়া যায় না; নিস্তেজ এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে। তখন তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কালে জল পাইলেই তাহারা সবল হইয়া উঠে এবং পুনরায় সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে।

খুব ঠাণ্ডাতেও এই সমস্ত জীবাণু মরে না। এক মাসের অধিক কাল বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলেও

তাহাদিগকে মারিতে পারা যায় না। কিন্তু বেশী গরম সহ্য করিতে পারে না, জলে ফেলিয়া কিছুক্ষণ ফুটাইলেই মরিয়া যায়।

বাতাস না পাইলে আমরা কেহই বাঁচিতে পারি নাই। কিন্তু জীবাণু সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। কতকগুলি জীবাণু আছে যাহারা হাওয়া না পাইলেও বেশ সুস্থ থাকে বরং হাওয়া লাগিলে তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। আবার অন্য কতক-গুলি জীবাণু আছে, তাহারা হাওয়া না পাইলে মোটেই বাঁচিতে পারে না। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি জীবাণু আছে, তাহারা হাওয়া পাইলেও বাঁচিয়া থাকে।

রৌদ্র লাগিলে অধিকাংশ জীবাণু মরিয়া যায়। আমরা যদি রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করি, এই সকল রোগের জীবাণু যাহাতে আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন এই সকল জীবাণু কোথায় থাকে? রোগীর শরীরে। যাহার জ্বর হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার দেহে জ্বররোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে, নহিলে তাহার জ্বর হইত না; যাহার কলেরা হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহার দেহে কলেরার জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে, নহিলে তাহার কলেরা হইত না। আমরা যদি এই সমস্ত রোগীর নিকটে না যাই, তবে আমাদের দেহে জীবাণু প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আমাদের অসুখও করিবে না।

কিন্তু অপরের রোগ হইলে আমরা যদি তাহাদের নিকট না যাই, আমাদের রোগ হইলে তাহারাই বা আসিবে কেন? রোগের যন্ত্রণায় যখন আমরা ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকি, পিপাসার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন যদি আমাদের নিকট কেহ না আসে, একটু শীতল জল দিয়া আমাদের পিপাসার শান্তি না করে, তাহা হইলে আমাদের কিরূপ কষ্ট হয় একবার ভাবিয়া দেখ। আমরা যদি পরস্পর বিপদে সাহায্য না করি, আমাদের সকলেরই কষ্ট হইবে, কাহারও সুখ হইবে না। অতএব আমাদিগকে রোগীর নিকট যাইতেই হইবে এবং রোগীর শুশ্রূষাও করিতে হইবে। আর আমরা ত নিত্য দেখিতেছি, যে ডাক্তার আসিয়া রোগীর পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে, আমাদের অসুখের সময় বাবা, মা, দাদা, দিদি প্রভৃতি সকলে আমাদের কাছে দিনরাত বসিয়া থাকিয়া রোগের উপশমের চেষ্টা করিতেছে। কই তাহাদের ত সকলের অসুখ করে না। কেন করে না? রোগের জীবাণুর নিকট বসিয়া থাকিলেও কেন তাহারা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রবেশ করিলেও কেন তাহারা সব সময়ে আমাদিগকে পীড়িত করিতে পারে না তাহা পরে তোমাদিগকে বলিব।

মণ্টি ক্রীষ্টো।

আশ্রয়ের সন্ধানে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদিও এডমণ্ডের মাথা ঘুরিতেছিল ও দম আটকাইয়া আসিতেছিল তবু সে উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নাই। তাহার ডান হাতে সেই ছুরিখানি ছিল। সে তাড়াতাড়ি থলিটা ছুরি দিয়া চিরিয়া ফেলিয়া নিজের শরীরকে মুক্ত করিল। কিন্তু পায়ের সঙ্গে বাঁধা সেই গোলাটা তাহাকে নীচের দিকে টানিতে লাগিল। জলের নীচে মানুষ কতক্ষণ থাকিতে পারে? নিশ্বাস ফেলা যায় না। তখন সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া, নিজের শরীরকে ধনুকের মত নোয়াইয়া ফেলিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধা গোলাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিল। নিমেষের মধ্যে থলিটা গোলাশুদ্ধ নীচের দিকে চলিয়া গেল; আর সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল।

একটু দম লইয়াই এডমণ্ড আবার ডুবসাঁতার দিতে আরম্ভ করিল—উদ্দেশ্য কেউ যেন দেখিতে না পায়।

দ্বিতীয়বার যখন ভাসিল, তখন সে প্রথমে যেখানে ডুবিয়াছিল সেখান থেকে প্রায় ৫০ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপর কালো কালো মেঘ জমাট বাঁধিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল—খুব ঝড় হইবে। সম্মুখে বিস্তৃত সমুদ্র—গর্জ্জন করিতেছে। পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউগুলি ছুটিয়া আসিতে আসিতে—মাঝপথে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অসীম সাগরে মিশিয়া যাইতেছে। অন্ধকার রাত্রিতে ঢেউয়ের মাথায় শাদা ফেণার মালা ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। পিছন দিকে কালো পাহাড়ের উপরে সেই জেলখানা—যেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে—এখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

এখন এডমণ্ড ভাবিল কোথায় যাওয়া যায়? চারিদিকে ছোট ছোট দ্বীপ, কিন্তু সবখানেই মানুষের বাস। সেখানে যাইলে তারা নানাপ্রকার প্রশ্ন করিবে—হয়ত বা আবার ধরিয়ে দিবে। সব চেয়ে নিরাপদ যেখানে কোন লোকের বসবাস নাই সেই দ্বীপে যাওয়া। অনেক ভাবিয়া ঠিক করিল—টি্বোলেঁ দ্বীপে যাওয়াই একমাত্র উপায়। সেখানে সামুদ্রিক পাখী ছাড়া আর কোন জীবের বাস নাই। কিন্তু সে স্থান থেকে দ্বীপটি প্রায় তিন মাইল দূরে। অন্ধকারে কি করিয়া দিক্ই বা ঠিক করা যায়? যাহা হউক সে সেখানেই যাওয়া স্থির করিল।

ঠিক সেই সময়ে দূরে একটি উজ্জ্বল তারার মত আলো দেখা দিল। আলো দেখিয়া সে বুঝিল উহা প্লেনার আলোকস্তম্ভ হইতে আসিতেছে। জাহাজে কাজ করিবার সময় ঐ পথে সে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। সে জানিত ঐ আলোকগৃহের দিকে সোজা যাইলে টি্বোলেঁ দ্বীপ বাঁ দিকে থাকিবে—যদি সে বাঁ দিকে যায় তবে ঐ দ্বীপে পৌঁছিবে। এই ভাবিয়া মনে খুব বলের সঞ্চার করিয়া সে সেই দিকে সাঁতরাইতে আরম্ভ করিল।

জেলে যখন অলসভাবে সময় কাটাইত তখন ফ্যারিয়া তাকে বলিত, "ড্যাণ্টি, এমন কুঁড়ের মত

সময় কাটিও না ; যদি কখন পালাবার চেষ্টা কর তবে সমুদ্র পার হবার সময়ই ডুবে মরবে। নিজের শরীরটা যাতে ঠিক থাকে সেই রকম ব্যায়াম কর।”
সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে ড্যাণ্টির কাণে ফ্যারিয়ার কথাগুলি বাজিতে লাগিল। সুখের বিষয় এডমণ্ডের ছেলেবেলায় যেরূপ সাঁতার দিবার ক্ষমতা ছিল এখনও তাহা অটুট আছে।

প্রায় একঘণ্টা সাঁতার দিবার পর এডমণ্ডের মনে হইল সে দিক ভুল করিয়াছে। ঘন অন্ধকার রাত্রি। চঞ্চল সমুদ্র। পথ ভুল হইলে আর কি রক্ষা পাইবার আশা আছে ? ভয়ে তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। আবার নূতন বিপদ। অনেকক্ষণ একভাবে সাঁতরাইয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হাত আর চলে না। নিজেকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য, চিৎ-সাঁতার কাটিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহা বৃথা। সমুদ্র বড় অস্থির। ওরূপভাবে বিশ্রাম করা চলে না। তখন আবার আশায় বুক বাঁধিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিল—কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সমুদ্রের কোথাও শেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। ক্রমেই সে নিরাশ হইতে লাগিল। চারি পাশের আঁধার যেন আরও জমাট হইয়া আসিল। মনে হইল কে যেন একখানি কালো মেঘ তার সামনে নামিয়ে দিল। সাঁতার দিতে দিতে হঠাৎ তাহার হাঁটুতে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে ভাবিল হয়ত তাহার পায়ে কেউ গুলি করিয়াছে—কিন্তু কোন শব্দ তাহার কাণে আসিল না। তখন নীচের দিকে পা চালাইতেই মাটিতে পা ঠেকিল। বুঝিল তীরে পৌঁছিয়াছে।

সামনে যে কালো মেঘের মত দেখাইতেছিল—এখন তাহার ভুল ভাঙ্গিল—সেটা যে পাহাড় তাহা বুঝিতে পারিল। সম্মুখেই টিবোলে দ্বীপ।

এডমণ্ড সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক পা হাঁটিয়া গিয়া দ্বীপে উঠিল ; তারপর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, শক্ত পাথরের উপর শুইয়া পড়িল। মনে হইল এত আরামে সে বুঝি আর কখন শুইতে পায় নাই। সমুদ্রের সঙ্গে যুঝিয়া সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল —যে ঝড়বৃষ্টি ও সমুদ্র গর্জ্জনের মধ্যেও তাহার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইল না।

হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া চারিদিক আলোকিত করিতেছে। সেই পাহাড়ে দ্বীপের উপর আশ্রয় পাওয়া অসম্ভব। অনেক খুঁজিয়া একটা ঝুলিয়া পড়া পাথরের নীচে সে আশ্রয় লইল। এত জোরে ঝড় বহিতেছিল ও সমুদ্রের ঢেউ এত জোরে তীরের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছিল—মনে হইতেছিল যেন সমস্ত দ্বীপটি কাঁপিতেছে।

মনে করিয়া দেখিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে কিছুই খায় নাই। হাত দুখানি বাড়িয়ে, সামনেই একটা পাথরের ফাটলে যে বৃষ্টির জল জমিয়াছিল—তাহাই প্রাণ ভরিয়া পান করিল।

একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া চারিদিক আলোকিত করিল। সেই আলোয় এডমণ্ড দেখিল একটা মাছ ধরিবার জাহাজকে ঝড়ে আর ঢেউয়ে দ্বীপের দিকে ঠেলিয়া আনিতেছে। তাহাদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য সে একবার খুব জোরে চীৎকার করিল—কিন্তু আর্ত্তনাদ শুনিয়া বুঝিল বিপদ তাহারা জানিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়বার যখন বিদ্যুৎ চমকাইল তখন দেখিতে পাইল কয়েকজন নাবিক মাস্তুলটাকে জড়িয়ে আছে—আর একজন হাল ধরিয়া ঝুলিতেছে। পর মুহূর্ত্তেই বিকট শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসিয়া বাজিল, অসহায়

নাবিকদের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ। আবার চারিদিক আলো করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইল। এডমণ্ড দেখিল, কতকগুলি তক্তা, পাল, মাস্তুল,আর মানুষ সমুদ্রের বুকে ভাসিতেছে। তারপর আবার চারিদিক অন্ধকার।

সে ছুটিয়া সমুদ্রের ধারে গেল। খুব মন দিয়া শুনিতে লাগিল—যদি কোন হতভাগ্য নাবিকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পায়, তবে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে কিছুই শুনিতে বা দেখিতে পাইল না। মানুষের কান্না থামিয়া গিয়াছে—ঝড় পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে ঝড় কমিয়া আসিল, কালো মেঘের দল পশ্চিম দিকে উড়িয়া গেল। তারায় ভরা নীল আকাশ দেখা দিল। তারপরে দূরে পূর্ব্বদিকে—আকাশ ও সমুদ্রের যেখানে মিলন হইয়াছে সেখানে একটা লাল রেখা ফুটিয়া উঠিল। আলোর ছটায় আকাশ আর সমুদ্র ভরিয়া গেল। ঢেউয়ের মাথায় শাদা ফেণার মালায় সোণালী রং ধরিল। রাত পোহাইল।

ড্যাণ্টি নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক হইয়া এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিল। শ্যাটো-ডি-ইফের কুঠরীতে যেদিন থেকে সে বন্দী হইয়াছিল, তখন থেকে এদৃশ্য দেখিবার ভাগ্য তাহার আর হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

চয়ন

পূজার ছুটী

১ম বালক

আবার বছর পরে এসেছে পূজার ছুটী
গাড়ী চড়ে তাড়াতাড়ী,
কাল ভাই যাব বাড়ী।
নাহিরে পড়ার চাপ,
দাও দৌড় মার লাফ।
হাতে ধরে নাচি আয়,
বসে কিরে থাকা যায় ?
তাধিন তাধিন ধেই, আয় মজা লুটি।
আবার বছর পরে এসেছে পূজার ছুটী!

২য় বালক—

এসেছে পূজার ছুটী বছরের পরে!
পিতা মাতা ভাই বোন,
সবে উচাটন মন,
চেয়ে আছে পথ পানে আমাদের তরে,
মায়ের আদর পাব কতদিন পরে।

৩য় বালক—

বাড়ী গিয়ে কি করিবে বল দেখি ভাই ?

২য় বালক—

বাড়ীতে বড়ই মজা, কিল চড় নাই;
ডালি ভরা ভাজা চিড়া
নারিকেল জোড়া জোড়া,
ঘন দুধ বাটি ভরা,
তাতে মজা পাকা কলা
হাপুস হুপুস হুস যত পারি খাই,
খাওয়া দাওয়া খেলা বেড়া আর কিরে ভাই ?

৩য় বালক—

শুধুই কি খাওয়া দাওয়া পড়াও কি নাই ?
ছুটী যবে ফুরাইবে,

পরীক্ষা তো দিতে হবে,
কি হবে উপায় যদি সব ভুলে যাই ?

১ম বালক—

হাঁ ভাই বলেছ ঠিক আগে পড়া শিখিব ;
খাওয়া দাওয়া খেলাধূলা তারপর করিব।
ছুটী যবে ফুরাইবে,
হাসিব হাসাব সবে,
পরীক্ষাতে পাশ করি পুরস্কার লইব

দেবতার দান

চাইনি—তবুতো দেছ
যা আছে অভাব, তাই
তোমা কাছে কি চাহিব
কিছুই না ভেবে পাই।

পিতা মাতা ভাই বোন
আর যত পরিজন,
সবইতো দিয়াছ তুমি
নাহি চাই অন্য ধন।
ছোট ছোট সাথী সনে,
সদাই আমোদে থাকি
এর চেয়ে বেশী সুখ
দিতে কি গো আছে বাকি ?

আকাশের ছোট তারা
কাননের ফুলরাশি
পাখীর মধুর গান
আমি কত ভালবাসি।

মার প্রাণে ভালবাসা
তাও তো তোমারি দান
নতুবা শৈশবে মোর
কেমনে বাঁচিত প্রাণ ?

অতি ক্ষুদ্র শিশু আমি
তব পদে এ মিনতি
আশীষ করগো মোরে
থাকে যেন ও পদে মতি।

সবই ত দিয়াছ তুমি
ফিরে কি চাহিব আর ?
করুণার কথা স্মরি
নমি পদে শতবার।

বরফের তলা দিয়া ডুবো-জাহাজের যাতায়াত।

তোমরা উত্তর মেরু আবিষ্কারের কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ। কত কষ্ট করিয়া ১৩১৬ সালে কাপ্তেন পিয়ারী সাহেব উত্তর মেরুর জমাট বরফে ঢাকা জমির উপরে প্রথম পদার্পণ করেন, তারপর অনেকে উত্তর মেরুর উপর দিয়া এয়ারোপ্লেনে (Aeroplane) উড়িয়া পার হইয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর আগে এই চেষ্টাতে কয়েক জন প্রসিদ্ধ বিমানযাত্রী প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহা তোমরা খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবে। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে দুইশতের অধিক জাহাজ উত্তর মেরুর বরফের চাপের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে অথবা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নাবিকেরা আর ফিরিয়া আসে নাই। হয় জাহাজের সঙ্গে চূর্ণ হইয়া মারা পড়িয়াছে, নয় তো আটকানো জাহাজে করিয়া খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গিয়া শীতে জমিয়া মারা গিয়াছে।

তোমরা ভাবিতে পার যে উত্তর মেরু দিয়া জাহাজে করিয়া যাইবার দরকার কি ? মিছামিছি লোকেরা কেন প্রাণ হারাইতেছে ? তোমরা একটি গ্লোব (Globe) লইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে,

ইংলণ্ড হইতে জাপানে যাইবার সময় যদি সাইবীরিয়ার উত্তর দিয়া যাওয়া যাইত তাহা হইলে পথ কত অল্প দূর হইত। এখন ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিয়া ও চীনসমুদ্র দিয়া যাইতে হয়। ইহাতে অনেক অধিক ঘুরিতে হয়। উত্তর মেরুর কাছ দিয়া যাইতে পারিলে ইংলণ্ড হইতে জাপানে যাওয়া যেমন সহজ হইত, তেমনি মার্কিনদেশের পূর্ব্বদিককার কোন বন্দর হইতে ঐ দেশেরই পশ্চিম দিককার কোন বন্দরে যাওয়াও অনেক সহজ হইত। তাহাতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইতে পারিত।

তোমরা হয়ত আজকালকার খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতে পরিতেছে যে এয়ারোপ্লেনে উড়িয়া এখন লোকেরা কত অল্প সময়ে কত দূর দূর দেশে যাইতেছে। আমাদের শুনিলে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু সাহসী বিমানযাত্রীরা বলেন, যে এসিয়া বা ইউরোপের উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়া যেমন সহজ উত্তর মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়াও তেমনি সহজ ; একটুও বেশী ভয়ের কারণ নাই।

আবার শুনিতে পাইতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মেরু প্রদেশের বায়ু এমন বিশুদ্ধ যে সেখানে জ্বর, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি কোন রোগের বীজাণু নাই ; এবং ঐ সকল রোগের বীজাণু সেখানে লইয়া গেলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে, হয়ত কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকেরা স্বাস্থ্যের জন্য দলে দলে মেরুর উপর দিয়া এয়ারোপ্লেনে উড়িয়া বেড়াইবে।

যাহা হউক এয়ারোপ্লেনের এত উন্নতি হইলেও তাহাতে মাল বহনের বিশেষ কিছু সুবিধা এখনও হয় নাই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা কিরূপ উদ্যোগী ও সাহসী তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা এখন স্থির করিয়াছে যে ডুবো জাহাজের (Submarine) কিছু উন্নতি সাধন করিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া বণিজ্যের মাল বরফের তলা দিয়াই মেরুসাগর পার হইয়া চলিয়া যাইবে। মেরুসাগরে যে আগা গোড়াই বরফ, তাহা নহে। কিন্তু জাহাজের প্রধান বিপদ এই যে হঠাৎ ভাসমান পর্ব্বতাকার বরফের চাপ মালের স্রোতে ছুটিয়া আসিয়া ধাক্কা দিয়া জাহাজ ভাঙ্গিয়া দেয়—যেমন করিয়া টাইট্যানিক জাহাজ ১৯১২ সালে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। টাইট্যানিক জাহাজে একটি বরফের পাহাড়ের ধাক্কা লাগিয়াছিল। মেরু প্রদেশে দুই দিক হইতে ঐরূপ দুই পর্ব্বতাকৃতি বরফের চাপ একসঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্তেই জাহাজ চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। আরও বিপদ এই যে, যে স্থান দিয়া একবার নাবিকেরা গিয়া দেখিয়া আসিলেন যে বরফ নাই, জাহাজের পথ বেশ মুক্ত, হয়ত দুইদিন পরেই আর একখানি জাহাজ সেই ভরসায় সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিল যে দুই তীরের বরফ অনেক কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, রাস্তা নাই, এবং চারিদিক হইতে অজস্র বরফের চাপ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া জাহাজখানিকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল, জাহাজ আট্‌কা পড়িল।

গত এক শতাব্দীতে এইরূপে যে দুই শতের অধিক জাহাজ মারা গিয়াছে, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। এখন লোকেরা বলিতেছেন,, দূর হউক, যদি জলের উপর দিয়া যাইতে হইলে বরফের জন্য এত বিপদে পড়িতে হয়, তবে জলের উপর দিয়া গিয়া কাজ কি ? আমরা জলে ডুবিয়া বরফের তলা দিয়াই মেরুসাগর পার হইয়া যাইব। কারণ, বরফ খুব বেশী গভীর হয় না। একটু বেশী

নীচে দিয়া ডুবিয়া চলিলেই আর ডুবো-জাহাজকে বরফের ধাক্কা খাইতে হয় না।

মেরুসাগর পার হইবার জন্য যে নূতন ডুবো-জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে, তাহার ছাদের উপরে একটা স্প্রিঙ্গের মাস্তুলের মতন থাকিবে। তার সঙ্গে জাহাজের কলের সঙ্গে যোগ থাকিবে, যেন বরফের তলাতে ঐ মাস্তুল ঠেকিলেই জাহাজ আরও গভীর জলে ডুব দিতে পারে। এ ছাড়া ছাদের উপরে স্প্রিঙ্গের খড়মের মতন লাগানো থাকিবে, যেন জাহাজ হঠাৎ জোরে ভাসিয়া উঠিয়া বরফের তলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিলেও সহজে পিছলাইয়া চলিয়া যায় ও জাহাজের কোন ক্ষতি না হয়।

যখন ক্রমাগত অনেকক্ষণ এইরূপে বরফের তলায় চলিতে হইবে তখন ডুবো-জাহাজে মানুষের জন্য এবং এঞ্জিনের জন্য বায়ু বদলাইবার প্রয়োজন হইবে। তখন এক স্থানে জাহাজ থামাইয়া উপরে বরফ ছিদ্র করিয়া বায়ু গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ডুবো জাহাজের সম্মুখে এবং পিছনে দুই স্থান হইতে দুইটি নল উপরের দিকে আস্তে আস্তে গড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। এই নলের ভিতর বরফ ছিদ্র করিবার জন্য ড্রিলযন্ত্র থাকিবে। তাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বরফ ছিদ্র করিবে। ছিদ্র যত অগ্রসর হইতে থাকিবে এই নল এবং ড্রিলযন্ত্র ততই আপনা আপনি উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। এইরূপে ২০ফুট বরফের স্তরও ফুটো করিতে পারিবে। ফুটো করা শেষ হইলে ড্রিলযন্ত্র ভিতরে টানিয়া লওয়া যাইবে, শুধু নল দুটি উপরে বায়ু পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিবে। এই দুই নলের মধ্য দিয়া নূতন বায়ু লইয়া এবং পুরাতন অবিশুদ্ধ বায়ু বাহির করিয়া দিয়া তারপর জাহাজ আবার চলিতে থাকিবে।

এই সকল আয়োজন যদি বিনা বাধায় সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তবে তোমরা হয়ত ১৯৩০ সালের গ্রীষ্ম-কালেই শুনিতে পাইবে যে মেরুসাগরের তলা দিয়া মাল হইয়া ডুবো জাহাজ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের কাছে সকল বাধাই কেমন পরাস্ত হইয়া যায়!

আমার-জন্মভূমি

সমস্ত জগত একসময় অন্ধকারের মত ছিল। লোকের ঘরবাড়ী ত ছিলই না, থাকা যে দরকার তাহাও জানিত না। রাঁধিয়া খাইবার জ্ঞান ছিল না। গুহার মধ্যে বনের পশুদের সঙ্গে তাদের মতই জীবনযাপন করিত। লেখাপড়া জানা দূরে থাক, কথা বলিয়া মনের ভাবই প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এখন বলত সে সময় কি রাত্রির অন্ধকারের মত ভীষণ ছিল না?

কিন্তু আমাদের এই দেশে,—এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ জগৎ ছাড়া না হইলেও—ইহার সকলই সেই আদিকাল হইতে জগতছাড়া। সেই আদি-কালে যে সময়ের কথা সম্পূর্ণ কেহ জানিতে পারে না, ইতিহাসেও যাহার বিষয় লেখা হয় নাই—পৃথিবীর অন্যান্য স্থান যখন জ্ঞানের আলোক পায় নাই তখনও যে আমাদের প্রিয়-মাতৃ-ভূমি, এই পবিত্র ভারতবর্ষ সভ্য ছিল, উন্নত

ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরে গ্রীস, রোম প্রভৃতি যখনই যে দেশ উন্নত হইয়াছে, যাহাদের কথা পড়িতে পড়িতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া যায়—সেই সকল দেশের এত নাম, এত উন্নতি কেবল ভারতবর্ষেরই জন্য। কিন্তু হায়! ভারতবর্ষের সেই গৌরবময় যুগের কথা, সেই উজ্জ্বল দিনের কথা অতি অল্পই জানা যায়। তাহা এত পুরাতন—এত প্রাচীন যে অন্য দেশের সহিত তুলনায় তাহার বিবরণ ঠিক ঠিক লেখা যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অতি-পুরাতন সময়কে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রস্তর যুগ, অর্থাৎ যে সময় মানুষ তাহার দরকারী জিনিষগুলি পাথর দিয়াই করিয়া লইত। ইহার পর পাথর ছাড়াইয়া ধাতুর ব্যবহার করিতে শেখে। প্রথমে তামার দ্বারা সকল অস্ত্র, শস্ত্র প্রভৃতি মানুষের ব্যবহারের জিনিষগুলি প্রস্তুত হইল। যতদিন তামার ব্যবহার চলিত ছিল সেই সময়কে বলে তামার সময় বা তাম্র যুগ। কিন্তু তামা বড় নরম। সে কালের যে প্রধান দরকারী জিনিস ছিল তাহা তামা দিয়া তৈয়ারী করায় ভাল হইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে টিন্ পাওয়া গেল। নয় ভাগ তামার সহিত এক ভাগ টিন মিশাইয়া বেশ কাজ চলিতে লাগিল। এই মিশ্রিত ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ। ইহাই ব্রোঞ্জ-যুগ। কিন্তু হইলে কি হয়। ব্রোঞ্জ বড় যেখানে সেখানে মিলিত না। কাজেই অন্য কোন কিছুর দরকার হইল যাহা দ্বারা তাহাদের কাজ চলিয়া যায়। এবার লোহার আবিষ্কার হইল। লৌহা-যেমন অনেক পরিমাণে পাওয়া গেল—তেমনি ব্যবহারেও কাজের বেশ সুবিধা হইল। এখন সাধারণ সকল কাজে লোহার প্রচলন হইল। কেবল গহনা প্রভৃতি সৌখীন জিনিষগুলি তামা বা ব্রোঞ্জ দিয়া প্রস্তুত হইত। এই সময়কেই লৌহ-যুগ বলা হয়।

এই এক একটি যুগ কত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল তাহা ঠিকভাবে জানা যায় না। এক একটি ধাতুর আবিষ্কার করিতে তাহাকে কাজে লাগাইতে শত শত বৎসর কাটিয়া যাইত। আবার পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময় একই আচার ব্যবহার ছিল তাহাও নহে। একস্থানে হয়ত লোহা চলিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর অপর এক দেশে পাথরের ব্যবহার চলিতেছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় যে এই সভ্যতা ও উন্নতির যুগেও এমন দেশ আছে যথায় ধাতুর ব্যবহার কেহ জানে না বলিলেই হয়। তাহারা এখনও সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তর-যুগেই বাস করিতেছে। এইরূপ একটি জাতি আফ্রিকা দেশের আলজিরিয়া প্রদেশে বাস করে। ইহারা প্রাচীন আরব জাতির বংশধর। ইহাদের গায়ের রং শ্বেত, চোখ নীল, এবং চুল লোহিতাভ। ইহাদের সকল ব্যবহারই সেই আদি-যুগের। ইহাদের জ্ঞান এত অল্প যে, তাহাদের সেই পাহাড়ের গণ্ডীটুকুর বাহিরে যে অন্য দেশ থাকিতে পারে তাহা জানেই না।

তাহারা যে পর্ব্বতমালার উপর বাস করে তাহার নাম আরেস মাসিক। তাহা এত উচ্চ এবং দুর্গম যে কেহ সহজে সেখানে যাইতে পারে না। এই স্থান হইতে ৪০ মাইল দূরে বিখ্যাত রোম রাজ্যের রাজধানী প্রসিদ্ধ টিমগড় নগর স্থাপিত ছিল। এই নগর দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এত উন্নত এবং সভ্য ছিল যে, তাহার পাথর বাঁধান বড় বড় রাজপথ, অতি বৃহৎ অট্টালিকা, বড় বড় দোকান ঘর, মন্দির, স্নানের ঘর প্রভৃতি অনেক কিছু মাটীর নীচে চাপা পড়িয়াছিল আজকাল লোকে

খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আদর্শ সভ্য নগরের নিকট বাস করিয়াও ঐ সায়িয়া জাতি সভ্যতার কোন ধার ধারিত না এবং এখনও সেইরূপই আছে। সেই অতি প্রাচীন কালের মত তাহারা গুহায় বাস করে। গুহার যে দিকটি খোলা সেই দিকে পাথরের উপর পাথর দিয়া ঘরের মত করিয়া লয়। কিন্তু ইহার জন্য চুণ, বালি প্রভৃতি ব্যবহার করা দূরে থাক কাদা মাটি ব্যবহার করিতেই জানে না। ইহারা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহার প্রায় সবগুলিই পাথরের তৈয়ারী। তবে ইহারা চাষ করিতে জানে। পাথরের জাঁতায় গম, ছোলা ভাঙ্গে, পাথরের হাঁড়িতে রাঁধিয়া খায়। ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি ইহাদের গৃহপালিত পশু, এবং ঐ অন্ধকার গুহাতেই সকলে একসঙ্গে বাস করে। এই জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার যুগে পৃথিবীরই একস্থানে এইরূপ এক আদিম জাতির বাস!

এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, পৃথিবীর সকল স্থান এককালেই সমান সভ্য হইয়া উঠে নাই বা হইতেও পারে না। সেই প্রাচীন যুগে জগতে যে কত দেশ ছিল এবং এখনকার কত দেশ ছিল না তাহা ঠিক ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে সেই হাজার হাজার বৎসর আগের যে সকল কথা জানা যায়—তাহাতে ভারত, উত্তরকুরু, পারস্য, মহাচীন, মিশর, ফিনিশিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, ইথিয়োপিয়া, চাল্‌ডিয়া, সিথিয়া, স্কন্দনবীয়া, গ্রীস, রোম, কার্থেজ, মেক্‌সিকো এবং পেরু এই সতেরটি রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটি বা এককালেই, কোনগুলি বা পরপর সভ্যতার সোপানে উঠিয়াছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ভারত, পারস্য, মহাচীন, স্কন্দনবীয়া, গ্রীক, রোম-মেক্‌সিকো, ও পেরুর নাম এখন পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যায়। বাকী দেশগুলি যে কোথায় ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

আবার এই সতেরটি দেশের মধ্যে ভারতই সকলের প্রধান। এমন যে রোম রাজ্য, সে দেশেরই একজন পণ্ডিত নিজ দেশের উন্নতির সময় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন— রোমক সাম্রাজ্য প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্য কিনিয়া প্রতিবৎসর তাহাকে অকাতরে অর্থদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কেবল রোম নয় গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন সাম্রাজ্যের অসাধারণ উন্নতি কেবল ভারতেরই জন্য। ভারতেও এককালে প্রস্তর-যুগ ছিল সত্য, কিন্তু অন্যান্য দেশ যখন পাথরের মধ্যেই জীবন কাটাইতেছিল তখন ভারত ধাতুর আবিষ্কার করিয়া তাম্র-যুগের আরম্ভ করে। তামা ছাড়াইয়া ভারত একবার লোহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতে ব্রোঞ্জযুগ একেবারেই ছিল না। মিশরে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে লোহার আবিষ্কার হয়। ব্যাবিলনে তাহারও বহু শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার চলন ছিল। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বেই ভারতবাসী লোহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। পণ্ডিতগণ বলেন লোহার ব্যবহারের সময় হইতেই ধরিতে গেলে জগতে সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ত বুঝিতেই পারিতেছ যে এই ভারতবর্ষই সভ্যতার আদি জন্মভূমি।

মানুষ কত উন্নত হইলে যে বাণিজ্য করিতে পারে তাহা বড় হইলে বুঝিবে। বিশেষ সেই হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রে গিয়া নানাদেশ বিদেশে ব্যবসা করা কতই না আশ্চর্য্যের বিষয়। লোহা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই নৌকায় করিয়া ভারতবাসী নানারকম শিল্পাদি লইয়া দেশ বিদেশ হইতে কত অর্থ আনিয়া ভারতকে জগতের

শ্রেষ্ঠ করিয়াছিল। জগতে যখন আর কোন জাতি কোনরকম লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তখন ভারত ভাষা ও বর্ণের সৃষ্টি করে। জগতের সকল লোক যখন উলঙ্গ ছিল তখন ভারতই সর্ব্বপ্রথম কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে। ভারতের রাজ্য ছিল, রাজা ছিল, রাজধানী ছিল; সব ছিল। মধ্যে মধ্যে ভারতের রাজারা অন্য দেশে রাজ্য স্থাপন ও শাসন করিতেন। বলিতে কি জগৎ যখন সভ্যতাবিহীন জ্ঞান-বিজ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থায় ছিল—তখনও ভারতে সভ্যতা, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু উন্নতি হইয়াছিল।

মৃতদেহের সৎকার সভ্যতার একটি অঙ্গ। কোন জাতি কি ভাবে এই কাজ করে তাহার দ্বারা সেই জাতির সভ্যতা অনেক পরিমাণে জানা যায়। সেই অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ মৃত ব্যক্তিকে এখনকার মতই আগুনে পোড়াইতেন। তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। মাদ্রাজের বেলারী জেলায় অনেক স্থানে পাহাড়ের মত ছাইয়ের গাদা আছে। প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে আছে। মৃত ব্যক্তির দাহের পর যে ভস্ম তাহাই সেই পাষাণ যুগ হইতে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এত বড় স্তূপ হইয়াছে! জগতের আদি সভ্যতার কেন্দ্র ভারতের পুরাতন নগরগুলি অনুসন্ধান করিলে কত তথ্যই না জানিতে পারা যাইবে! একদিন অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাঞ্চী, কর্ণাট, অবন্তী, পাটলীপুত্র, তক্ষশীলা, নলান্দা, ওদন্তপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কতই না গৌরবের স্থল ছিল!

প্রকৃতির দানের কথা আর কি বলিব? হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় পর্ব্বত। পৃথিবীতে আর কোথায় এত নদ নদী জমিকে উর্ব্বরা করিয়া শস্যে ভরিয়া দেয়! "এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!" এমন যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাহাও এত সুন্দর কোথায়? কোন দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ঋতু পর পর আসিয়া দেশকে মুগ্ধ করে!

যে ধর্ম্ম মানুষকে উন্নত করে, পবিত্র করে, সেই ধর্ম্মের বিকাশ ভারতে যেমন হইয়াছে সেই অন্ধকার যুগও—তাহাও কত আশ্চর্য্য! যে দিক দিয়া তুলনা করিলে বলিতে পারা যায়,

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

এত সব দেখিয়া শুনিয়াই ভারতের সাধক, ভারতের সেবক, ভরতের কবি, ভারতের সকল লোক আশা করেন—"আবার ভারত জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!"

বন্য হাতীর শিক্ষা

বন হইতে হাতী ধরিবার কৌশল গত মাসের মুকুলে তোমরা এক রকম জানিতে পারিয়াছ। কিন্তু আমরা যে হাতীগুলিকে এত শান্ত, শিষ্ট দেখি তখন কিন্তু তাহারা এরূপ থাকে না। তখন তাহারা মানুষের ভাব ত বুঝিতে পারেই না; তাহা ছাড়া তাহাদের স্বভাবও থাকে অন্য রকম। তাহাকে নানারকমে শিক্ষা দিয়া তবে আমাদের কাজে লাগান হয়। এজন্য প্রায় এক মাস সময় লাগে।

কুনকী দিয়া হাতী ধরা হইলেই তাহাকে প্রথমে আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়, এবং খাওয়াইবার পর বেশ করিয়া গলায় ও পায়ে মোটা দড়ি দিয়া খোঁটার সহিত বাঁধা হয়। পরদিন আর হাতীটিকে সেখানে রাখা হয় না। প্রধান আড্ডাতে লইয়া যাওয়া হয়। এইগুলি গড় হইতে প্রায় ৮।১০ মাইল দূর। যেখানে বন ও নদী আছে এবং সহজেই হাতীর খাবার বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। সেইখানেই প্রধান আড্ডা করা হয়। শিক্ষিত হাতী বন্য হাতীগুলিকে তথায় লইয়া যায়। হাতী এইস্থানে আসিলেই তাহাকে নিলাম করা হয়। লোকে এই সকল হাতী কিনিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া পুনরায় বিক্রয় করে।

গড় হইতে হাতী বাহিরা হইতেছে

ক্রেতা হাতীটি কিনিয়া পরদিন হইতেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এত বড় একটি বন্য পশুকে শিক্ষা দেওয়া কত কষ্টকর এবং ভয়ের, কারণ বুঝিতেই পারিতেছ। সেই জন্য কত সাবধান হইতে হয়। মালিক প্রথমে তাহাকে সামনের পা এবং পিছনের পাগুলি ফাঁক করিয়া খোঁটায় বাঁধে। প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে বাঁধন খুলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং পরে আবার ঐ ভাবে বাঁধিয়া রাখে

ক্রেতা হাতী বাঁধিয়াছে

প্রথম ৪।৫ দিন একটি বন্য হাতীর দুই পাশে শিক্ষিত হাতী রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার পর একটি কুন্‌কিতেই কাজ চলে। মাহুত বা কোন

হাতীর শিক্ষা

কোন একটি লোক যে ভালভাবে শিখাইতে পারে সে প্রথম কতকগুলি দরকারী কথা শিক্ষা দেয়।

হাতীর শিক্ষা

কুন্‌কিগুলি তাহার কথা মত কাজ ক'রে এবং তাহা দেখিয়া দেখিয়া বন্য হাতীটিও একটু একটু শিখিতে থাকে। কথাগুলির সঙ্কেত বলা হয় মাত্র। যেমন বসা—বইট্‌, আগে চলা—আগেৎ, থামা—ধ্যেৎ, প্রহার করা—মার্‌, পার হইয়া যাওয়া—ডেগ্‌, ধরা—ধর্‌, ইত্যাদি

শিক্ষার পর খাওয়াইয়া এবং গা ধোয়াইয়া আবার বাঁধিয়া রাখা হয়। কখনও কখনও রাত্রেও এই শিক্ষার কাজ চলে। বন্য হাতীগুলির গায় খুব সুড় সুড়ি লাগে। তাহা দূর করিবার জন্য তাহার গায়ে হাত বুলাইতে হয়।

তোমরা অনেকেই সার্কাসে পশুর খেলা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাও। তাহারা কেমন প্রভুর আদেশ পালন করে! সকল পশুকেই এইরূপ বহু পরিশ্রমে বহু উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এত বড় যে হাতী তাহাকেও মানুষ বশে আনিয়া নিজের কাজ করাইয়া লয়। বড় হইয়া তোমরা আরও কত আশ্চর্য্য কথা জানিতে পারিবে।

সোণার খনির সন্ধানে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুরেশ খুব ভোরবেলায় উঠিয়াই ছোট বোন সরযূর খোঁজ করিতে বাহির হইল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, হয়রাণ হইয়া, অবশেষে শুনিতে পাইল, বলাইবাবু সরযূকে লইয়া ষ্টীমার-ঘাটে চলিয়া গিয়াছেন। সুরেশ তখনি সহরের সব চেয়ে ভাল ঘোড়ার গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া ষ্টীমার ঘাটে রওনা হইল। গাড়ীর প্রকাণ্ড দুই কালো ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। গাড়ী আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে ষ্টীমারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ইহার একটু আগেই বলাইবাবু তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ষ্টীমারে উঠিয়াছেন। কিন্তু সরযূ প্রকাণ্ড এক কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে লইয়া, যখন সিঁড়ির তিনখানা কাঠের তক্তার উপর দিয়া ষ্টীমারে উঠিতেছিল তখন তক্তা নড়িয়া যাওয়ায় সে নদীর জলের ভিতরে পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টীমারের নিকটেই

পড়িয়াছিল, কিন্তু জলের এমন ভয়ানক স্রোত যে, দেখিতে দেখিতে সরযূ অনেক দূরে ভাসিয়া গেল। তাহাকে উঠাইবার জন্য খালাসীরা ছোট একখানি বোট ষ্টীমার হইতে জলে নামাইতে লাগিল, কিন্তু বোট তাহার কাছে যাইবার আগেই সুরেশ নদীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সরযূকে লইয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলাইবাবুর কাপড়ের বোঝাটি জলের স্রোতে ভাসিয়াই চলিল। তাই তিনি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং সরযূর গালে প্রকাণ্ড এক চড় মারিয়া কহিলেন। "হতভাগা মেয়ে, তুমি একথালা করে ভাত খাও, আর কাপড়ের বোঝাটা নিয়ে ষ্টীমারে উঠ্‌তে পার্‌লে না? আমার দশ টাকার কাপড় জলে ভেসে গেল; এস একবার ষ্টীমারে, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব না?"

বলাইবাবু মুখের কথা শেষ করিয়াই সরযূকে টানিয়া ষ্টীমারে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিলেন। কিন্তু সুরেশ আর সহিতে পারিল না, সে বলাইবাবুকে ধাক্কা মারিয়া পাঁচ হাত দূরে ঠেলিয়া দিল। তাহার পরে সরযূকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। বলাইবাবু গাড়ীর সামনে গিয়া যেমনি সুরেশকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া, অমনি তাহার পিঠে শপাং শপাং চাবুক। সুরেশ গাড়োয়ানের হাতের চাবুক কাড়িয়া লইয়া বলাইবাবুকে মারিল। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার চা-বাগান নয়, এখানে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দেওয়া চলিবে না। তাই তিনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন—"ও সারেং, তুমি চেয়ে দেখ, কোথাকার এক দস্যু আমাকে মেরে, আমার চাকরাণীর মেয়েকে জোর করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।"

ষ্টীমারের সারেং কহিল—"ষ্টীমারের ভিতরেই আমার অধিকার, বাহিরে নদীর তীরে কে কাকে মারে, কে কার মেয়ে কেড়ে নেয়, সে সব দেখ্‌বার ভার পুলিসের উপরে। আপনি থানায় গিয়ে পুলিসে খবর দিন, আমি এখনি জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

সুরেশ গাড়ী হাঁকাইয়া সহরে চলিল। বলাইবাবু ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলেন। ষ্টীমারের লোকেরা তাঁহাকে কহিল—"সে কি মশাই, আপনার কাপড়ের পুঁটুলীটিও ভেসে গেল, মেয়েটিকেও দিনেদুপুরে দস্যুতে কেড়ে নিল? দস্যু কি কখনো দিনের বেলায় গাড়ী হাঁকিয়ে ষ্টীমার-ঘাটে আসে? আসল ব্যাপারটা কি বলুন ত আমরা শুনি?"

বলাইবাবু। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঐ জোচ্চোর—যে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে গেল, সে বলে মেয়েটি ওর ছোট বোন।

ষ্টীমারের লোকেরা কহিল—"তা হলে ওটি আপনার চাকরাণীর মেয়ে নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে?"

বলাইবাবুকে মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বলিতে হইল। ষ্টীমারের বাবুরা বলিলেন—"মশাই, আর আপনি বামুন বলে পরিচয় দিবেন না, মেয়েটির উপরে মুচির মতন ব্যবহার করেছেন। তা, ঐ মেয়েটি আপনার হাত ছাড়া হয়ে রক্ষা পেয়েছে।"

গাড়ীর ভিতরে সরযূ অবাক্ হইয়া সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল! সুরেশের প্রাণ স্নেহে ভরিয়া উঠিল। সে সরযূর দুটি গালে হাত বুলাইয়া কহিল, "আমার প্রাণের বোন, আমিই যে তোমার দাদা, আমার নামই যে সুরেশ। আমার কথা ত তোমাদের সরলা দিদির কাছে শুনেছ। এখন আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, তা জান? তোমার নির্ম্মলা দিদির কাছে।"

সরযূ সুরেশের মুখের পানেই চাহিয়া রহিল। তাহার পরে কাঁদিয়া ফেলিল। একটু শান্ত হইয়া

কহিল—"দিদি যে বাঘের মুখে পড়ে মারা গিয়েছে।"

সুরেশ। কে বল্লে মারা গিয়েছে? তোমার দিদিকে কি বাঘে মারতে পারে? ঈশ্বরই যে দয়া করে তাকে রক্ষা করেছেন। নির্ম্মলা বাঘের মুখ থেকে আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে। আর একটু পরেই নির্ম্মলা দিদিকে দেখ্‌তে পাবে।

সরযূ। দিদিকে দেখ্‌তে পাব এ কথা কি সত্য?

সুরেশ। সত্যিই তাকে দেখ্‌তে পাবে। আমি যে তারও দাদা। সে বেঁচে না থাকলে আমি কি হাসিমুখে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারতুম্? আমি ত সরলার কাছে শুনেছি, দিদিকে না দেখ্‌লে তোমার মোটেই চলে না। কেমন করেই বা চলবে? দিদিই ত তোমাকে এত বড়টি করে তুলেছে। তা, শুধু দিদিকে নয়, সেখানে আর একটি আশ্চর্য্য মানুষকে দেখ্‌তে পাবে। তাঁর ভালবাসা পেয়ে তুমি নির্ম্মলার চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাস্‌বে।

সরযূ। দিদির চেয়ে আমি কাকে বেশি ভালবাস্‌ব? তিনি কে? তিনি কি সরলা দিদি?

সুরেশ। সরলা ত কল্‌কাতায়। আচ্ছা সরযূ, আমরা যদি আমাদের মাকে দেখ্‌তে পেতুম, তা হলে কেমন হত?

সরযূ আবার অবাক্ হইয়া সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে যেন কি রকম মনে হইতে লাগিল। সে কহিল, মাকে কি আর দেখ্‌তে পাব? তবে দিদি যখন মাকে মনে করে কাঁদতেন, তখন সরলা দিদি বল্‌তেন, তোমরা ঈশ্বরের কাছে বল, হে ঈশ্বর, আমাদের মাকে, দাদাকে আর সুহাসিনী দিদিকে যেন দেখতে পাই। তা হলেই ঈশ্বরের করুণায় সবাইকেই দেখ্‌তে পাব।"

সুরেশ। সে ত ঠিক্ কথা। সবাইকেই দেখ্‌তে পাবে।

গাড়ী সহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সুরেশ এক দোকানের কাছে গাড়ী থামাইয়া সরযূর জন্য খুব সুন্দর কাপড় আর জামা কিনিল। এতক্ষণ সরযূ ভিজা কাপড় পরিয়াই গাড়ীতে বসিয়াছিল। বৃষ্টিতে কাপড় ভিজিলে এমন ত সে অনেকদিনই ভিজা কাপড় পরিয়া থাকে। তাই তাহার বেশি কষ্ট হয় নাই, কিন্তু সুরেশের বড় কষ্ট হইতেছিল। এইবার যখন সরযূ নূতন কাপড় পড়িল এবং জামা জ্যাকেট গায় দিল, তখন তাহার সুন্দর চেহারা বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুরেশ কহিল, "সরযূ, তুমি ত আমাকে কখনো দেখ নি, কেমন করে বুঝ্‌লে আমি তোমার দাদা?"

সরযূ। আপনি যে বল্‌ছেন, আমার দাদা।

সুরেশ। তোমাকে ভুলায়ে কোথাও নেবার জন্য যদি মিছে কথা বলে থাকি?

সরযূ। আপনি যে খুব ভাল। যারা ভাল, তারা ত মিছে কথা বলে না।

সুরেশ। কেমন করে বুঝ্‌লে আমি খুব ভাল?

সরযূ। আপনাকে দেখ্‌লেই যে বেশ ভাল লাগে।

সুরেশ সরযূকে নানা কথায় ভুলাইয়া বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। নির্ম্মলা সরযূকে দেখিয়াই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে কহিল —"সরযূ, আমার লক্ষ্মী বোন, তোমাকে যে আবার দেখ্‌তে পাব, তা ত মনেই হয় নি। বল ত দুদিন আমায় না দেখে কেমন করে থাক্‌লে? খুব বুঝি কেঁদেছ?"

সরযূ আর কিছুই বলিতে পারিল না, সে দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সুরেশের মাতা ধীরে ধীরে কন্যার কাছে আসিলেন।

নির্ম্মলা কহিল, 'সরযূ, চেয়ে দেখ, এই যে আমাদের মা। মাকে কি চিন্‌তে পার? আগে মাকে প্রণাম কর, তার পরে তাঁর কোলে যাও।"

সরযূ কিছুক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পরে মাকে প্রণাম করিল। মা তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের ভিতরে গেলেন। প্রথমে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দয়াময় ঈশ্বর, আজ তোমাকে কি বলে আমি ধন্যবাদ করব? এই দুঃখিনীকেও তুমি যে এত ভালবাস, তা ত আমি ভাব্‌তেই পারি নি। তুমি কি আশ্চর্য্যভাবে আমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে মিলন করে দিলে! আমি যেন চিরদিনই তোমার এই দয়া মনে রেখে তোমাকে ভক্তি অর্পণ কর্‌তে পারি।"

মায়ের ভালবাসার মতন আর কি কিছু আছে? এই জগতে এমন আর কিছুই নাই। সরযূ নির্ম্মলার ও সরলার কাছে কতই ত ভালবাসা পেয়েছিল, কিন্তু সে আজ মায়ের ভালবাসায়, মায়ের স্নেহভরা কথায়, মায়ের অঙ্গের সুবিমল স্পর্শে যাহা পাইল, ছোট মেয়ে বলিয়া তাহা সে ভাল করিয়া বুঝতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে সুখও যে আর ধরিতেছে না। এমন সুখ সে ত আর কিছুতেই পায় নাই।

নির্ম্মলা কহিল, "সরযূ, আমি যখন বল্‌তুম, মাকে দেখ্‌তে পেলে, আর কিছুই পেতে চাই নে তখন ত তুমি বল্‌তে আমারও মাকে দেখতেই বড় ইচ্ছা হয়। এখন তুমি মার কোলেই বসে আছ, মা তোমাকে কত ভালবাসা দিচ্ছেন। কই? তুমি ত মাকে একবার মা বলেও ডাক্‌তে পারলে না। মাকে মা বলে ডাক না, তা হলে মা বড়ই খুসী হবেন।"

সরযূ। মা, আপনি কার কাছে আমাদের কথা শুন্‌লেন? কেমন করে এখানে এলেন?

মা। মনে কর ঈশ্বরের কাছেই তোমাদের কথা শুনেছি, তাঁর করুণায়ই এখানে এসেছি। ঐ যে খাবার আস্‌ছে। লক্ষ্মী মা, এখন ত তুমি কিছু খাও নি, আজ আমিই এই লুচি, বেগুনভাজা মিষ্টান্ন তোমাদের মুখে তুলে দেব। কেমন, তাতে তোমার এই খাবারগুলি খুব ভাল লাগ্‌বে না?

নির্ম্মলা। বল না, মার হাতে খেলে তা আবার ভাল লাগবে না?

সুরেশ কহিল, "মা, আজ এই মিলনের, এই সুখের দিনে, আমি নিজেই বাজারে যাব। ভাল ভাল ভাল জিনিষ কিন্‌ব, তার পরে নিজের হাতেই নানা রকম রান্না করে সবাইকে খাওয়াবো। আমি যে ছেলেবেলা থেকে বামুন ঠাকুরের কাজ করে করে চমৎকার রান্না কর্‌তে শিখেছি।"

মা। তুমি যে দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়া চলে এসেছ, আজ এই সুখের দিনে সেই দৃশ্য আর দেখতে চাই নে। না সুরেশ, আমি নিজেই আজ রান্না করব। তুমি কোন্ জিনিষ খেতে ভালবাস, বল ত?

সুরেশ। মা, দুঃখের ভিতর দিয়ে আমার দিন কেটে গিয়েছে, আমি যা পাই, তা খাই, সব জিনিষই আমার ভাল লাগে।

মা। সরযূ, তোমার কি খেতে ভাল লাগে?

নির্ম্মলা। মানুষের গালাগালি ছাড়া ভাল জিনিষ ত বেশি খাই নি, তাই সরযূ কোন জিনিষেরই নাম কর্‌তে পারবে না। ওকে তুমি যা রান্না করে দেবে তাই ওর ভাল লাগ্‌বে।

সুরেশের মা ছেলেমেয়েদের লইয়া যে বাসায় ছিলেন সেই বাসার মেয়েরাই তাহাদের রান্নার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু সুরেশের মার

নিজের হাতে রান্না করিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়া-ইতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তিনি স্বহস্তে ডাল, আলু-পটলের ডাল্না, মাছের ঝোল, কিসমিসের চাট্নি ও মিষ্টান্ন রান্না করিলেন। সুরেশ খাইতে বসিয়া কহিল, 'মা, তুমি প্রত্যেক জিনিষটির ভিতর তোমার ভালবাসা দিয়া রান্না করেছ, তাই আজ মনে হচ্ছে এমন চমৎকার রান্না আর কখনো খাই নি।"

মায়ের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আজ যদি সুহাসিনীও এই সঙ্গে থাক্ত, তবে এই সুখের মিলন আরো কতই সুখের হত।"

নির্ম্মলা। মা, দিদি কি সত্যই মারা গিয়াছেন? একদিন তোমার মতন তাঁকেও কি দেখ্তে পাব না?

সুরেশ। সেই যে তোমাকে একটা আশ্চর্য্য কথা বল্‌ব বলেছিলুম, এইবার তা বলি। বল্‌বার আগে জিজ্ঞাসা করি? তোমাদের সরলা দিদিই যদি সুহাসিনী অর্থাৎ তোমাদের আপনার দিদি হন তা হলে কি খুব খুসী হও?

সরযূ। তিনি যদি আপনার দিদি হন, আর আমাদের সঙ্গেই থাকেন, তা হলে খুব মজা হয়। মা, আপনি ত সরলা দিদিকে দেখেন নাই, তিনি যে কি ভাল, তা আর আমি বল্‌তে পারি নে।

নির্ম্মলা। দাদা, তবে কি সরলা দিদিই আমাদের আপনার বোন? তাঁর নামই কি সুহাসিনী ছিল? তাই হো'ক, তাই হো'ক। মেয়েরা ত দেখে বল্‌ত, সরলা দিদির চেহারা অনেকটা আমাদেরই মতন। দাদা, কি আশ্চর্য্য কথা বল্‌বেন, শীঘ্র বলুন, আমার যে শুনতে বড়ই ইচ্ছা

মা। সরলাই সুহাসিনী। সে তোমাদের আপনার দিদি।

নির্ম্মলা। মা, আপনি ত তাঁকে দেখেন নি, কি করে বল্‌ছেন, তিনিই আমার দিদি?

সুরেশ। সুহাসিনীর নাম এখন সরলা। আমাদের নৌকাডুবি হবার পরে জেলেরা তাকে নদীর তীরে পেয়েছিল। নগেনবাবু জেলেদের কাছ থেকে নিয়ে তাকে মানুষ করেছিলেন। সরলা আগে সে সব কথা জান্‌ত না। অল্পদিন হয় সবই জান্‌তে পেরেছে।

নির্ম্মলা। শুনে আমার কি সুখই হচ্ছে! এখনি যদি তাঁকে একবার দেখ্তে পেতুম! সরযূ, লক্ষ্মী বোন, শুন্‌লে ত আমরা সরলা দিদিরই ছোট বোন।

সরযূ। দাদা, আমরা সরলা দিদির কাছে কবে যাব?

মা। সুরেশ, কি বল্‌ব? মনের আনন্দে আজ যেন আমিও ছেলেমানুষের মতন হয়েছি। মনে হচ্ছে, পাখী হতে পার্‌লে এখনি উড়ে সুহাসিনীর কাছে যেতুম।

বর্ষাকালে জলে যেমন পুকুর ও খাল বিল ভরিয়া যায়, তেমনি সুখে সুরেশের মাতার ও সন্তানদের মন ভরিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহারা অনেক সময় বসিয়া বসিয়া শুধু আপনাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীই বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরেশের মাতা মনোরমা দেবী কহিলেন, "দেখ সুরেশ, তোমার বাবা যখন সোণার খনির সন্ধানে যাত্রা করেন, তখন এই সহরে বড়ই চোরের ভয় ছিল। তাই তিনি আমার এবং সুহাসিনীর অনেক টাকা দামের গহনা, মূল্যবান বস্ত্র এবং টাকাকড়ির হিসাব,—তাহা ছাড়া তোমার দাদামহাশয়ের সময়ের অনেক সোণার মোহর লোহার সিন্ধুকে ভরে মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছিলেন। মাটি খুঁড়্‌লে হয় ত সে সিন্ধুক পাওয়া যাবে।"

সুরেশ। এখনি মাটি খুঁড়ে দেখা যাক না কেন।

সেই বাড়ীতে যিনি ছিলেন, তাঁর অনুমতি লইয়া সুরেশ নিজের হাতেই মাটি খুঁড়িল। কয়েক হাত মাটির নীচে সিন্ধুকটি পাওয়ায় তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখনি তালা ভাঙ্গিয়া সিন্ধুকটি খোলা হইল। কি আশ্চর্য্য! সোণার গহনা, রত্নহার, টাকা ও সোণার মোহর সবই ত রহিয়াছে, শুধুই মূল্যবান কাপড়গুলি খারাপ হইয়াছে। গহনা ও মোহরগুলি সিন্ধুকের মধ্যে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল। দেখিয়া আর সকলের আনন্দ হইল, কিন্তু মনোরমা দেবীর, সুরেশের বাবার কথা মনে পড়ায় চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হিসাবের খাতাখানিতে দেখা গেল, সুরেশের পিতার ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকা ছিল। তাহা ছাড়া তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। নগদও প্রায় দশ হাজার টাকার সোনার মোহর আছে। সুরেশ মনে ভাবিল, পিতার জীবনবীমার ও ব্যাঙ্কের টাকা হাতে আসিলে আর নগেনবাবুর টাকা গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকই হইবে না।

সুরেশের পিতা নামজাদা বিলাত-ফেরত ডাক্তার ছিলেন। সহরের বিস্তর লোক তাহার কাছে নানারকমে উপকার পাইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায়, সুরেশদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। আজ যখন সহরের লোক শুনিল, তাহাদের পরম উপকারী ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণ এখনো জীবিত, তাহারা এই সহরে আসিয়া তাহাদের আগের বাসাতেই বাস করিতেছে; তখন দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়া সুরেশের মাতা এবং তাহার ছেলেমেয়েদের দেখিতে আসিল। সুরেশ করুণ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় আপনাদের জীবনের সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিল। শুনিয়া সকলেরই বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সহরের অনেক সাহেব মেমও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জনের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেখিতে আসিলেন।

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

আবিষ্কার

এ জগতে যা' দেখি তার অনেক জিনিষ সত্য নয়,
বলি যদি সে সব কথা ঘটবে ভীষণ বিপর্য্যয়।
পূবে বুঝি সূর্য্য ওঠে অস্ত নামে পশ্চিমে?
চন্দ্র বুঝি সারা রাতি আকাশ পরে রয় হীমে!
জানি আমি সত্যি যা,' আর জানে শনির বয়স্য,
তোমরা কি ভাই বুঝ্‌লে কিছু এ সব জটিল রহস্য।
সেদিন মোরে বল্‌লে ডেকে ডারুইনের নাত জামাই
সকল জীবের আকার একই, বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই,
বাহির দেখেই প্রভেদ গোণ' সে সব প্রভেদ মিথ্যা যে,
অজ্ঞতাতেই ডুবে থেকে উল্টা বোঝ সব কাজে।
যদি কভু খোলে আঁখি আসে নেমে দিব্যজ্ঞান,
দেখবে প্রভেদ বাঘে, মেষে নাইরে কিছু সব সমান।
তোমরা বুঝি ভাব্‌ছ এ সব মিথ্যা নিছক কল্পনা,
বাদলা দিনে বসে বসে ফাঁকা কথার জাল বোনা।
কিম্বা আমার মাথার ভিতর সূক্ষ্ম কোন যন্তরে,
সৃষ্টি হল এ সব কথা, তৈলাভাবে জং ধরে।

প্রমাণ ইহার হাতে হাতেই সে দিন দিল ছোট্
শ্যালক,
অবিশ্বাসী ? তাহলেও সে মোটের উপর সাচ্চালোক।
চর্‌তেছিল মহিষগুলো ধরে তাহার একটিকে,
অশ্ব ভেবে চড়্‌লে পিঠে, তারস্বরে মেষ ডাকে।
তার পরে সে চললে ছুটে পশ্চিমে কি উত্তরে,
কেউ জানে না ; সেই অবধি ফেরেনি সে আর ঘরে।
আজ্‌কে আমি হেথায় বসে সেই জয়েরই গৌরবে,
এ কাহিনী ছন্দে লিখি শোন অজ্ঞ জন সবে।:

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি

আশালতা একটী ছোট মেয়ে। মাত্র তের বৎসর বয়স। হাওড়ায় বাড়ী। সংসারের কলুষ কালিমা এখনো হয়ত তাহার সরল মনটিকে বিদ্ধ করে নাই। এই অল্প বয়সেই আশালতা নিজে ইচ্ছা করিয়া মাত্র কিছুদিন হইল মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। কেন ? ভালবাসার জন্য। প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বাবার কখনো কোন কিছু হইলে সেই সরল প্রেমিক প্রাণে কিছুতেই সহ্য হইত না। ভালবাসায় ছিল তাহার সরল হৃদয়টি একেবারে ভরপুর।

কিছুদিন হইল তাহাদের বাড়ীর মোটর-চালক তাহার বাবার নামে এই বলিয়া আদালতে অভিযোগ করে যে, তিনি তাহার কিছু টাকা ফাঁকি দিয়াছেন। আশালতা সরলা বালিকা। বিচারে কি হইবে জানে না। নানা কারণে লোকের জেল হয় শুনিয়াছে। জেল যে কি সে হয়ত তাহা জানিত না। এইটুকু মাত্র জানিত, তাহার বাবা তাহার কাছে থাকিবেন না, বাবাকে কতদিন সে দেখিতে পাইবে না। এই বেদনা শেলের মত তাহার প্রাণে লাগিল। আশালতা জানিত ভগবান সরল মনের প্রার্থনা শোনেন। বিচারের দিন সরলা বালিকা সরল মনে ভগবানের নিকট বাবার মুক্তির জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে সারাদিন উপবাস করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রায় তিনটার সময় তাহাদের পাড়ার একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বলিলেন, তাহার বাবার জেল হইয়াছে। ছোট মেয়ে, যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই হইল। ইহা তাহার সহ্য হইল না। বাবাকে না দেখিয়া সে ত বাঁচিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে পিতার এই অপমান সহ্য করিতে পারিবে না। আশালতা জানিত আফিং খাইলে মানুষ মরিয়া যায়। সেও মরিবার জন্য আফিং খাইল

বিচারে কিন্তু পিতা মুক্তি পাইলেন। তাড়াতাড়ি তিনি বাড়ী ফিরিলেন। আদরের কন্যা তাঁহার কতই না ভাবিতেছে, ভীত চিত্তে কতই না বেদনা পাইতেছে। কিন্তু হায়! তিনি গৃহে ফিরিয়া কি দেখিলেন ? স্নেহের কন্যা আর এ পৃথিবীতে নাই! আশালতা আজ পরলোকে !

বহুরূপী

ধর্ম্মকুণ্ড গ্রামটী ছোট নয়। গ্রামে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বাসিন্দাও কম নয়। এসময় জমিদার বিপ্রদাস বসু বাড়ীতেই অনেক সময় থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন ব্যাপারী বেশ দুপয়সা জমাইয়াছেন। খৃষ্টানদের মেয়েরা কেহ কেহ চাকুরী করেন, তাদের অবস্থা এক সময় মন্দই ছিল। আজকাল অনেকটা ভাল। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই পাশাপাশি বাস করিলেও এখানে কোন গোলযোগ বাধে নাই। বাবুরা হিন্দু হইলেও মসজিদ ও গির্জ্জার জন্য দুই খণ্ড ভূমি নিষ্কর তাঁরাই দিয়াছেন। এমনকি নিজ তহবিল হইতে ও প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

আশ্বিন মাস। বাঙ্গালাদেশে পূজার সাড়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি যেন মায়ের পূজার জন্য রাশি রাশি ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্থলে জলে পদ্ম। শেফালি তাঁহারি চরণে আপনাকে লুটাইয়া দিয়া যেন কৃতার্থ। সুনীল আকাশ।

বিপ্রদাস বসুর বাড়ীতে পূজার মহা আয়োজন। পুরাতন পন্থী বসু মহাশয় পূজার সময় নিজে মন্দিরে উপস্থিত থাকেন। ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে তিনি পুরোহিতের সহিত চণ্ডী পাঠ করেন। মহা অষ্টমী—আজ পূজার বিশেষ দিন। প্রশস্ত সামিয়ানা প্রাঙ্গনে খাটাইয়া রাখা হইয়াছে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সেখানে আসিয়া প্রতিমা দর্শন করেন। পূজার আনন্দে সকলেই একটু অসতর্ক। ছিন্নবেশা একটি দরিদ্রা বৃদ্ধা সামিয়ানার তলে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবুর নিকট কি যেন প্রার্থনা করিল। নীচজাতির স্ত্রীলোক। সকলে ভয়ে জড়সড় হইলেন, পূজায় বুঝি অমঙ্গল হয়। দারোয়ান আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

*　　*　　*

মহরম :—গোলামরসুল মিঞার বাড়ীতে মহা আয়োজন। তাজিয়া বাহির হইবে। দলে দলে দলে লোক লাঠি খেলিতেছে। কিরূপে তাহাদের শোভাযাত্রা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহার নানা আয়োজন। রসুল মিঞা ভাল মানুষ। তিনি উপবাস করিয়া আছেন। রোজা রাখিয়া আল্লার দয়া ভিক্ষা করিতেছেন। একটি দরিদ্র বালক পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গ্লাস সরবৎ চাহিল। বালক যে মুসলমান তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। গোলমালে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

*　　*

মিঃ পল গির্জ্জায় যাইতেছেন। পূজার সময় হিন্দুর বাড়ীতে খৃষ্টানপল্লীর ছেলেমেয়েরা তামাসা দেখিতে যায়, তাই তাহাদের পল্লীতে বিশেষ উপাসনার আয়োজন রহিয়াছে। পল গির্জ্জায় নিয়মিত উপাসক। গির্জ্জার পথে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ। কে ও, পাগল ? সে আশ্রয় চাহিল। পাগল মনে করিয়া পল গির্জ্জায় চলিয়া গেলেন।

*　　*　　*

একই রাত্রিতে বিপ্রদাস বসু, রসুল মিঞা ও মিঃ পল স্বপ্ন দেখিলেন কে যেন বিষণ্ণবদনে বলিতেছে,—"আমি তোমাদের গ্রামে প্রত্যেক পূজাপ্রাঙ্গনে গিয়াছিলাম তোমরা আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলে না। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলাম।" সকলের চক্ষু আর্দ্র হইল।

*　　*　　*

সোনার বাঙলার ভাইবোন, তোমরা এই বহুরূপীকে চিনিলে তো ?

শ্রীসুখময় দাশগুপ্ত।

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাক টিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার :—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫॥০, ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৷৵০

মুকুল

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

দ্বিতীয় বর্ষ ৮ম সংখ্যা

বালকবালিকাদিগের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম, এ

সম্পাদিত

সূচী পত্র

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মুল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদকার নামে পাঠাইতে হইবে ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাক টিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার :—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠ পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫॥০ ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

১১৭।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেসহইতে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

২য় বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ [৮ম সংখ্যা

খেলার সাথী

ওরে আমার খেলার সাথী,
দেখ্‌না কেমন ভালবাসি !
হই যে খুসী, যখন দাঁড়াস্
নেচে নেচে কাছে আসি।
বল্‌না আমার কোলে এসে,
কেমন ভাল লাগে তোর ?
লেজটি নেড়ে খাবার খেতে,
স্নেহমাখা হাতে মোর ?
দেখ্‌লে তোরে জুড়িয়ে যায়,
আমার যে এই দুটি আঁখি।
বল্‌না ওরে লক্ষীটি মোর,
বুঝতে তুই পারিস্ তাকি ?
দুষ্টুমি তুই করিস্ না আর,
খেলিস্ শুধু সঙ্গে মোর।
আদর করে খাবার দেব,
সুখেই দিন কাটবে তোর।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী

ইতিপূর্ব্বে দুই সংখ্যায় তোমাদিগকে ইংলণ্ডের পারলিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রীসভার কথা বলিয়াছি। দেশের সমুদয় লোক বাছিয়া পারলিয়ামেণ্ট গঠন করা হয়। পারলিয়ামেণ্টের সভ্যগণের মধ্য হইতে বাছা বাছা লোক লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রীসভার প্রধান পুরুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।
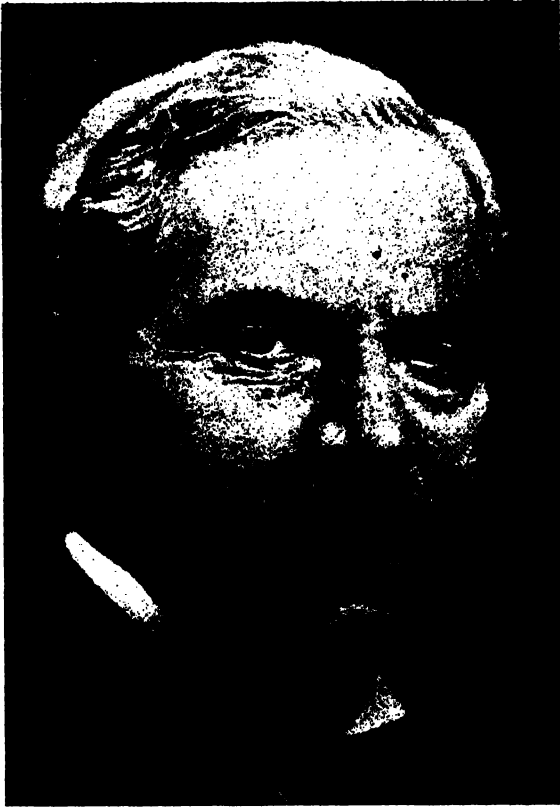
তাঁহার হস্তে অনেক শক্তি। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনের ভার তাঁহার উপর। তিনি মন্ত্রীসভার সভ্য বাছিয়া লন। এবং কোন মন্ত্রীর সঙ্গে মত-ভেদ হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তনের শক্তিও তাঁহার আছে। মোটের উপর বলিতে পারা যায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালক। রাজা নামমাত্র কর্ত্তা। তিনি নিজে কিছুই করেন না। প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা যেরূপ উপদেশ দেন তাঁহার নামে সেইরূপ কার্য্য হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় প্রধান মন্ত্রীর এই অসাধারণ ক্ষমতা কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধীরে ধীরে ঘটনা-পরম্পরায় এই নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব। পারলিয়ামেণ্টও বহুশত বৎসরে এই প্রকারে গঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা আইন অপেক্ষা প্রচলিত পদ্ধতির উপরে অধিক আস্থা রাখে। অতীতকালে অনেক রাজনীতিকগণ ও শক্তিশালী লোক প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই বিচক্ষণতায় প্রধান মন্ত্রীর পদের এত গৌরব হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। ইনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি একজন সংবাদপত্রের লেখক ছিলেন! অর্থনীতি বিষয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্ল্যাডষ্টোন পরিবারে ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু এখন ইনি বিপত্নীক। ১৯১১ সালে ইঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স ৪৪ বৎসর। কিন্তু তৎপরে তিনি আর বিবাহ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আর একবার কিছুকালের জন্য (জানুয়ারী ১৯২২—নভেম্বর ১৯২৪) তিনি আর একবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই তিনি শ্রমজীবী-সঙ্ঘের সহিত যুক্ত আছেন। তখন এই দল নগণ্য ছিল। শ্রমজীবী

দলের বর্ত্তমান অবস্থা ও শক্তি অনেক পরিমাণে মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বিচক্ষণতার ফল। মিঃ বোয়ার হার্ডির মৃত্যুর পর হইতে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড শ্রমজীবী-দলের নেতা হইয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে 'মুকুলে' মিঃ বোয়ার হার্ডির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একবার আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। মিঃ বোয়ার হার্ডিকে শ্রমজীবী-দলের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে শ্রমজীবী-দলের তেমন সম্মান ছিল না। এখনও ইংলণ্ডের ধনীরা শ্রমজীবী-দলের খুব বিরোধী। অনেকেই ইঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। মিঃ রামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার কার্য্যের উপর শ্রমজীবী-দলের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি সাম্রাজ্য সুশাসন করিতে পারেন তাহা হইলে শ্রমজীবীদল দেশের লোকের বিশ্বাস ও সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আনন্দের বিষয় বিগত কয়েক মাসে মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও তাঁহারা মন্ত্রীসভা বেশ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তাঁহার দেশ বিদেশে শান্তি সংস্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। পরাজিত জার্ম্মাণীর সহিত সহানুভূতি ও সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণীর কোন কোন অংশে এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি বিজেতা জাতির সৈন্য আছে। শ্রমজীবী-দল সে সকল সৈন্য উঠাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। রুশিয়ার সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হইয়াই দেশের সামরিক বিভাগের ব্যয়ভার কমাইবার আয়োজন করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে নৌবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের নিয়ম ছিল অন্য কোনও জাতি একখানি রণপোত নির্ম্মাণ করিলে ইংলণ্ড দু'খানি করিবে। এইপ্রকারে ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের ব্যয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই ব্যয় কমাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি আমেরিকা গিয়াছেন। মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড জাতীয় শান্তি-সঙ্ঘের (League of Nations) খুব পক্ষপাতী। তোমরা এই সঙ্ঘের বিষয় জান কি না জানি না। সময়ান্তরে তোমাদিগকে এ বিষয় বলিব। আজ মোটামুটি এইটুকু জানিয়া রাখ যে বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর জাতি সকলের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য জাতীয় শান্তি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ইহার শক্তি ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ মনোযোগী। পূর্ব্বে যখন অল্পদিনের জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন তখনই তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। এবারেও এই কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন।

অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু'ক্ত জাতি সকলের সহিত শান্তি ও সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য মিঃ র‍্যামসে ও তাঁহার মন্ত্রীসভা আগ্রহান্বিত। অনেক দিন হইতে মিশর দেশের সহিত ইংলণ্ডের সংঘর্ষ চলিতেছে। ইংলণ্ড মিশর দেশে আপনাদের সৈন্য রাখিয়া নানাপ্রকারে আধিপত্য করিতেছে। মিশরের লোকেরা স্বভাবতঃ তাহা পছন্দ করেন না। কিছু দিন হইতে এই বিবাদ ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রমজীবীদল শাসনভার গ্রহণ করিয়াই এই বিবাদের মীমাংসার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। লর্ড লয়েড মিশর দেশের হাই কমিশনার অর্থাৎ ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি মিশরের স্বাধীনতা

বৃদ্ধির অনুকূল ছিলেন না। শ্রমজীবী মন্ত্রীসভা তাঁহাকে অপসারিত করিয়া নূতন সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবাসীরাও স্বাধীনতার জন্য ব্যাগ্র। ইংলণ্ডের সহিত ইহা লইয়া ভারতবাসীদের মনোমালিন্য চলিতেছে। আশা করা যায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁহার মন্ত্রীরাও ভারতের স্বাধীনতা লাভের অনুকূল হইবেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া উদারভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায় তাঁহার কার্য্যকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হইবে।

দুই বন্ধু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চাকরী পাওয়া।

পরদিন বেলা ৮টার সময় নলিন বেলিয়াঘাটায় গিয়া ভুবনেশ্বরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ভুবনেশ্বরবাবু নলিনকে দেখিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"আসুন, বসুন। বাড়ী গিয়ে কাল কি রকম দেখ্‌লেন? তাঁরা খুবই উতলা হয়েছিলেন বোধ হয়?"

"খুব উতলা হয়েছিলেন। তবে, কাল ৮টা থেকে আমার খবরটা তাঁরা পেয়েছিলেন, প্রাণে বেঁচে আছি, এটুকু জানতে পেরেছিলেন।" বলিয়া তাহার বাড়ীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই নলিন বর্ণনা করিল। তাহার এই পারিবারিক করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভুবনবাবুর চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল।

নলিনের কথা শেষ হইলে ভুবনবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নলিন তখন বলিল—"আমার সে বিষয়টা—"

ভুবনবাবু বলিলেন—"চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন? কাল সন্ধ্যার পর ঐজন্যেই আমি বেরিয়েছিলাম। শ্যামবাজারে যোগীনবাবু ব'লে আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি "ব্রাউন জোন্স" কোম্পানির হেড্‌ ক্লার্ক। ঐ কোম্পানীর আপিসে তাঁর ভারি খাতির, সাহেবরা একেবারে তাঁর হাতধরা। আপিস খুব ভাল, উন্নতিও শীগ্‌গির শীগ্‌গির হয়। যোগীনবাবু বল্লেন, এ সময়ে কোনও চাকরীই খালি নেই। তবে কাজ অনেক বেড়েছে, তাই সাহেবদের ব'লে ক'য়ে আপনাকে 'পেড্‌ এপ্রেন্টিস্' (অর্থাৎ পরীক্ষাধীন সাময়িক কর্ম্মচারী) ক'রে ঢুকিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এরকম এপ্রেন্টিসের মাইনে মোটে পঁচিশটি টাকা।"

শুনিয়া নলিন বড় বিমর্ষ হইল। বলিল—"পঁচিশ টাকায় কি ক'রে চলবে?"

"তাই ত ভাবছি। আজকাল ভাল চাকরি পাওয়া যে কত শক্ত, তা আর বল্‌বার নয়! তবে যোগীনবাবু বল্লেন—এক বছর ঐ পঁচিশ টাকা মাইনেতে এপ্রেণ্টিস ক'রে, আপনি যখন পাকা হবেন, তখন আপনার মাইনে হবে পঞ্চাশ। তার

পর থেকে বছরে পাঁচ টাকা করে বেড়ে বেড়ে পাঁচ বছরে হ'বে পঁচাত্তর টাকা। এইটিই ওদের সব চেয়ে নীচু গ্রেড্। ফার্ষ্ট গ্রেডের মাইনে তিনশো টাকা পর্য্যন্ত উঠে। আপিসটি খুবই ভাল, অনেক গভর্ণমেণ্ট আপিসের চেয়ে ভাল। কিন্তু প্রথম বছরটা কিছু কষ্ট। আমি ত বলি, আপনি ঢুকে পড়ুন—ভবিষ্যতে আপনার ভাল হবে।"

নলিন বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"একবেলা মাত্র আহার করলে, পঁচিশ টাকা মাইনেতে কোনও ক্রমে কুলোতে পারে।"

"দৈনিক আপনার বাসা-খরচ কত হ'লে নির্ব্বাহ হ'তে পারে?"

"একটা টাকা প্রায়।"

"মাসে ত্রিশ টাকা। তা ছাড়া ধোপা আছে, নাপিত আছে, কাপড়টা জামাটা আছে।"

এই বলিয়া ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ছেলে পড়াবেন? যাদের অল্প আয়, তারা অনেকেই প্রাইভেট্ টিউসন করে সংসার চালায়।"

"পেলে করি।"

"তবে এই বাড়ীতেই করতে পারেন। আমার ভাগ্‌নেটি এখানে থাকে, স্কুলে পড়ে। সকালবেলা ইংরাজি পড়াবার, অঙ্ক কষাবার একজন মাষ্টার আছে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে বাঙ্গালা পড়াবার জন্য একজন মাষ্টার খুঁজছিলাম। দশ টাকা মাইনে। এই, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত আর কি। আপনি যদি স্বীকার করেন তা হ'লে—"

নলিন বলিল—"অবশ্যই স্বীকার করব। আপনি আমার যে রকম উপকার করেছেন—আপনার ভাগ্‌নেকে আমার টাকা নেওয়াই উচিত নয়। কিন্তু উপায় কি? আর আমাকে নিরুপায় দেখেই, ভাগ্‌নেকে পড়াবার নাম ক'রে, আপনি যে আমায় সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাহা আমি বুঝতে পারছি। আমি আর আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব? ঈশ্বর আপনার ভাল করুন।"

ভুবনবাবু বলিলেন "না না উপকার নয়। একজন লোক আমার দরকার, যে কায করবে তাকেই ত টাকা দিতে হবে। অন্যকে না দিয়ে না হয় আপনাকেই দিলাম।"

উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নলিন অবগত হইল, এ বাড়ীখানি ভুবনেশ্বরবাবুর বিধবা ভগ্নীর। তিনিই ইহাদের অভিভাবক। মাঝে মাঝে আসিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া যান। ভুবনবাবু আর দুই তিন দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া বন্দীপুরে ফিরিয়া যাইবেন। আবার চৈত্র মাসে আসিবেন।

আগামী পরশ্ব ইংরাজী মাসের ১লা তারিখ। স্থির হইল, পরশ্ব হইতেই নলিন উভয় কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। অদ্য বিকালে ভুবনবাবু নলিনকে লইয়া হেড্ক্লার্ক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন।

উঠিবার সময় ভুবনবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, ওবেলা পাঁচটার সময় তা হ'লে আস্‌বেন। হাঁ—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। আপনার বর্ত্তমান অবস্থার কথা ত সমস্তই খোলাখুলি আমায় বলেছেন। আপনি মাইনে যা পাবেন, আপিসের পঁচিশ টাকা আর আমার দশ টাকা, সে ত মাস শেষ হলে পাবেন। সে পর্য্যন্ত এই একমাস কি ক'রে চালাবেন?"

নলিন মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"আর অন্য উপায় কি আছে? ভাবছি ঝির ধার করা সেই টাকা থেকে কিছু কিছু ধার নিয়ে এ মাসটা চালাই।"

ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমার পরামর্শ শুন্‌বেন ?"

"বলুন। আপনি যা বলবেন তাই আমার শিরোধার্য্য।"

"স্থির ধার করা টাকা নিয়ে কায নেই। পরশু সন্ধ্যাবেলা আমার ভাগ্‌নেকে পড়িয়ে, আপনি একটি টাকা নিয়ে যাবেন। এই রকম রোজ সন্ধ্যা-বেলা, একটি ক'রে টাকা নিয়ে যাবেন। ত্রিশ দিনে আমার কাছে আপনার ত্রিশ টাকা ধার হবে। মাস পূর্ণ হ'লে তার মধ্যে দশটি টাকা আপনার মাইনে ব'লে আপনার পাওনা হবে, তখন কুড়িটি টাকা মাত্র ঋণ থাক্‌বে। আপনি আপিস থেকে এ মাসের মাইনে হ'লে যে পঁচিশটি টাকা পাবেন, তা থেকে ঐ কুড়ি টাকা ঋণ শোধ করবেন। তখন আপনার নিজস্ব পাঁচটি টাকা আপনার হাতে থাক্‌বে, তাতে আপনার পাঁচ দিনের বাসা-খরচ চলবে। ষষ্ঠ দিন থেকে, আপনি আবার রোজ আমার বাড়ী থেকে একটি ক'রে টাকা নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় মাসের শেষে, আমার কাছে আপনার পনেরোটি টাকা মাত্র ঋণ থাকবে, আপি-সের মাইনে পেয়ে তা আপনি পরিশোধ করবেন। বুঝেছেন ত? ছমাস এই রকম চল্লে, আপনার আপিসের মাইনে পঁচিশ, আর এখানকার মাইনে দশ, এই পঁয়ত্রিশটি টাকাই আপনি ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন।"

নলিন বলিল—"বেশ, তাই করব।"

"আপনার একমাসের বাসা-খরচ ত্রিশটি টাকা আমি আপনাকে একবারে ধার না দিয়ে, রোজ একটি করে টাকা দেবার প্রস্তাব করছি। এথেকে আপনি বোধ হয় মনে ভাবছেন, আপনাকে অবিশ্বাস করেই সবটা একবারে আপনাকে ধার দিচ্ছিনে?"

নলিন ব্যগ্রস্বরে বলিল—"আমি এত অধম অকৃতজ্ঞ নই। তা আমি মনে করিনি। আপনি আমার ভালর জন্যেই এ রকম বন্দোবস্ত কর্‌ছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

"আপনার অবস্থা চিরদিনই ভাল ছিল। এখনই আপনি এই দুরবস্থায় পড়েছেন। হাতে এক সঙ্গে টাকা পেলে, বুঝে সুঝে খরচ করা আপ-নার পক্ষে শক্ত হবে—শেষে হয়তো ঋণে জড়িয়ে পড়বেন। সেইটি যাতে এড়াতে পারেন, এমন বন্দোবস্ত হওয়া চাই। আপনি মনোক্ষুণ্ণ হবেন না—হতাশ হবেন না। হিন্দুস্থানীরা বলে—ছোড়িওনা হিম্মৎ, বিসরিও না হরিনাম অর্থাৎ সাহস হারাবেন না, আর ভগবানকে ভুলবেন না—আপনার ভাল হবে।"

নলিন তখন ভুবনেশ্বরবাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

ক্রমশঃ

অতীতের প্রতিধ্বনি

মেজ মামা

আশ্বিন মাস, পূজা আসিয়াছে। গ্রামে তিন চারি বাড়ীতে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঢাকের বাজনাতে গ্রামখানি মাতাইয়া তুলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ত একমাস ধরিরা পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন দেশের বাড়ীতে কুমার আসিয়া বাঁশ ও খড় দিয়া প্রতিমার কাঠাম বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেদিন গ্রামের সব ছেলে মেয়ে সেখানে জড় হইয়াছিল; তাহার পর হইতে প্রতিদিন ছুটীতে চারিটিতে মিলিয়া এবাড়ী ওবাড়ী প্রতিমা কতদূর হইল দেখিতে যাওয়া তাহাদের একটি নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ কাঠাম শেষ হইয়াছে। আজ সরকারদের বাড়ীতে পায়ে মাটী দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে; কাল মিত্রদের বাড়ীতে দোমেটে আরম্ভ হইবে, ছেলেদের মহলে ক্রমাগত এই সব সংবাদ আসিতেছে, যাইতেছে। আজকালকার সহরের ছেলেমেয়েরা এ সব কথার বোধ হয় মানেই বোঝে না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় পল্লী-গ্রামে এই সকল খবর এখানকার ছেলেদের কাছে বুয়ার যুদ্ধ বা রুষ-জাপান যুদ্ধের খবর যেমন তেমনি ছিল। পূজার দিনের এক মাস দেড় মাস আগে কুম্ভকার আসিয়া বাঁশের গায়ে খড় বাঁধিয়া প্রতিমা তৈয়ার করে। তাহার পরে তাহাতে কাদা মাখিয়া প্রথমে প্রতিমার মাথা গড়ায় না, পালিশও করে না, কেবল শরীরটা হাত পাগুলি এক রকম করিয়া খাড়া করে। ইহাকেই বলে এক মেটে করা। এই পর্য্যন্ত হইলে নির্ম্মাণকার্য্য কিছুদিন বন্ধ থাকে; কাদা শুকাইলে কিছুদিন পরে আবার সেই কারিকর আসিয়া প্রতিমা দোমেটে করিতে আরম্ভ করে। তখন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী অসুর প্রভৃতি সকলের মাথা লাগান হয়। উপরে ভাল কাদা দিয়া তাহাদের গা বেশ পালিশ করা হয়। তখন প্রতিমা দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর হয়। এই সময় হইতেই ছেলেমেয়েদের জনতা আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ অসুর আর সিংহই তাহাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে; সিংহ অসুরের বাম হস্তের কনুইএর কাছে কামড়াইয়া ধরিয়াছে, দুর্গা ঠাকুরাণী তাহার ঘাড়ে পা দিয়া চাপিতেছেন, বুকে এক বর্শা বসাইয়া দিয়াছেন; অসুর তথাপি না দমিয়া ডান হাতের তলোয়ার দিয়া সিংহকে কাটিতে যাইতেছে, এ-দৃশ্য ছেলেরা শতবার দেখিয়াও তৃপ্ত হয় না। সেকালে ত আর এত ছবির বই ও কাগজ ছিল না, বৎসরান্তে এক দুর্গা পূজার প্রতিমাই তাহাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা তৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় ছিল। তাই যে কয় দিন পারে, তাহারা প্রাণ ভরিয়া প্রতিমা দেখিয়া লইত। বিশেষতঃ যখন রং দেওয়া আরম্ভ হইত, তখন হইতে আর তাহাদের আহার নিদ্রা থাকিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসিয়া তাহারা তাই দেখিত। প্রথমে সকল প্রতিমার গায়ে এক পোঁচ, দুই পোঁচ সাদা রং মাখান হইত। দুর্গা ও লক্ষ্মীর গায়ে হলদে রং দিত, সরস্বতীকে সফেদা মাখাইয়া সাদা ধবধবে করিয়া তুলিত; গণেশকে লাল রঙে, অসুরকে সবুজ রঙে ভূষিত করা হইত। ছেলেমেয়ে-

দের মধ্যে এক এক জনের এক একটী প্রিয় ঠাকুর থাকে ; কেহ লক্ষ্মীকে ভালবাসে, কেহ সরস্বতীর বিশেষ ভক্ত, কেহ কেহ বা বেচারী অসুরের দুঃখে তাহার পক্ষপাতী, এই সকল লইয়া তাহাদের মধ্যে কখন কখন ঝগড়াও হয়। ঠাকুরের গায়ে রঙ দেওয়া হইলে জলচিত্র করা আরম্ভ হয়। প্রতিমার উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একটা অংশ থাকে তাহাতে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, রামরাবণের যুদ্ধ, বৈকুণ্ঠ কৈলাস প্রভৃতি চিত্র করা হয়। চিত্রকর যখন একটির পর একটি ছবি ফুটাইয়া তুলিতে থাকে তখন ছেলেমেয়েদের আনন্দ ধরে না। কাহাকেও কাহাকেও দাদা বা কাকা বা আর কেহ আসিয়া কান ধরিয়া খাইতে লইয়া যাইতে হয়। প্রতিমা নির্ম্মাণের শেষ অঙ্ক যখন মালাকর আসিয়া প্রতিমার গা রাংতা লাগায়, পূজার দুই একদিন পূর্ব্বে আসিয়া মালাকর ডাকের গহনা দিয়া লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে সুন্দর করিয়া সাজায়। এই সময়ে বুড়োরা পর্য্যন্ত আসিতে আরম্ভ করেন ; কাহাদের বাড়ীর ঠাকুর ভাল সাজান হইবে তাহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ; যাহারা যত বেশী টাকা খরচ করিবে, তাহাদের ঠাকুরের তত ভাল সাজ হইবে ; সেকালে ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা পর্য্যন্ত সাজে ব্যয় হইত। কাহা-দেরও ঠাকুরের সাজ রূপালী রাংতার, যারা বেশী টাকা খরচ করিতে পারে, তারা সোণালি দিয়া সাজায়। কবে মালাকর আসিয়া ঠাকুর সাজাইতে আরম্ভ করিবে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে। কখনও কখনও পূজার দিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সাজ চলে। তাহার পরে যখন ঢুলিরা আসিয়া ঢাকে বাড়ী দেয়, তখন তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। সে কি আনন্দ !

ইতিমধ্যে বাড়ীতে আর এক আনন্দের ঢেউ উঠিয়াছে। সকল বাড়ীতেই পূজার জন্য কিছু না কিছু আয়োজন আছে। গৃহিণীরা দশ পনর দিন পূর্ব্ব হইতে সকল ঘরের ঝুল ঝাড়িয়া নূতন করিয়া লেপিতেছেন, কোন বাড়ীতে বা নারিকেল কুরিয়া নারিকেলের সন্দেশের তৈয়ারির আয়োজন হইতেছে, কোথাও বা ঝরির নাড়ু, কোথাও বা তিলের নাড়ু, সকলেই এক উৎসাহ ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ব্যস্ত। কর্ত্তারা পূজার কাপড়ের ভাবনায় অস্থির। যাহাদের টাকা নাই, তাহারা কি করিয়া সকলের কাপড় হইবে, সেই ভাবনায় অস্থির। আর যাহাদের টাকার ভাবনা নাই তাহারা কাপড় পছন্দ লইয়া ব্যস্ত। দোকানে যাওয়া আসা পড়িয়া গিয়াছে, প্রথমে যে কাপড় আনিলেন তাহা হয়ত বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করিলেন না, তাহা ফিরাইয়া আবার অন্য রকম কাপড় আন ; তাহাও যদি পছন্দ না হয় তবে আবার অন্যত্র চেষ্টা। ছেলেমেয়েরা কাপড়ের জন্য ধূম লাগাইয়াছে। যাহাদের কাপড় আসিয়াছে তাহারা তাহা পাইবামাত্র সঙ্গীদিগকে দেখাইতে ছুটিতেছে। সঙ্গীদের কাপড় দেখিয়া যাহাদের তখনও কাপড় হয় নাই তাহারা স্বভাবতঃই অস্থির হইতেছে; কেহ বা মায়ের কাছে গিয়া নূতন কাপড়ের জন্য উৎপাত করিতেছে , কেহ বা বাবার সঙ্গে দোকানে যাইতেছে, কেহ কাঁদিতেছে আর যাহারা নিতান্ত শান্ত ছেলে তাহারা শুষ্ক মুখে চুপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই বিষণ্ণ মুখ কিন্তু দুষ্ট ছেলেদের উৎপাত অপেক্ষা মা বাপের হৃদয়কে অধিক ক্লিষ্ট করিতেছে।

সমগ্র গ্রামখানি এইরূপ পূজার আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা দুই ভাই সেবার মামার বাড়ীতে আছি। আমাদের বয়স তখন আট দশ বৎসরের বেশী ছিল না। আমাদের বাড়ীতে কোন

ধূমধাম নাই। বড় মামা বিদেশে কাজ করেন, সেবার পূজার ছুটী পান নাই। বাড়ীতে আসিবেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে পরিবারে একটি শোকের ঘটনাও হইয়াছিল। বাড়ীতে কেবল দাদামহাশয়, ছোট দুই মামা, তাঁহারা কোন কাজ কর্ম্ম করেন না। আর বড় মাসি, তিনি বিধবা। আমরা অনেক সময়েই মামার বাড়ীতেই থাকিতাম। আমাদের নিজেদের গ্রামে ভাল স্কুল ছিল না। মামার বাড়ী থাকিয়া সেখানকার স্কুলে পড়িতাম। আমার পিতার অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। আমাদের মা ছোট অনেকগুলি ভাই বোন ও গৃহকার্য্য লইয়া বিব্রত থাকিতেন। কতকটা বোধ হয় সেই জন্যও আমাদিগকে মামার বাড়ী রাখিয়াছিলেন।

সপ্তমী চলিয়া গেল। প্রথম পূজা হইয়া গেল। আমরা সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিতে গেলাম। সঙ্গীরা প্রায় সবাই নূতন কাপড় পরিয়া গিয়াছিল। আমাদের তখনও কাপড় আসে নাই। আমরা পুরাতন কাপড় পরিয়াই গেলাম। মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। পূজার মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ভিড় ঠেলিয়া সকলেই সম্মুখে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার এক এক দল এক বাড়ীতে ঠাকুর দেখিয়া অন্য বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছে, তখন তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য আর পাঁচ দল ছুটিতেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া কতজন পিষিয়া যাইবার মত হইতেছে। লোকের ভিড়, ঢাকের বাজনা, ধূপের গন্ধ, সে এক মহাব্যাপার। কোনও কোনও বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া লাল নীল আলো জ্বালানো হইতেছে। রাত্রি প্রায় একপ্রহর পর্য্যন্ত আমরা এ বাড়ী ওবাড়ী আরতি দেখিয়া ফিরিলাম।

পরের দিনও আমাদের কাপড় আসিল না। সঙ্গীদের মধ্যে যাহাদের কাপড় আগে আসে নাই, আজ তাহাদের প্রায় সকলেরই কাপড় আসিল আমাদের মুখ শুষ্ক হইল। দাদামহাশয়ের হাতে বোধ হয় টাকা ছিল না, অথবা মনে করিয়াছিলেন, বাবা আমাদের জন্য কাপড় পাঠাইবেন। যে কারণেই হউক আমাদের কাপড় আসিল না। নবমীর দিনও চলিয়া গেল। বিজয়া দশমীর দিন দুপুর বেলা পাড়ার সকল ছোট ছেলে-মেয়ে নূতন কাপড় পরিয়া সাজিতেছে। ছেলেরা ইহাকে উহাকে ধরিয়া আপনাদের কাপড় কোঁচাইয়া লইতেছে। আমরা দুইটী ভাই বিরসবদনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কাপড় পাই নাই বলিয়া কোন উপদ্রব করি নাই, কাঁদিও নাই। আমরা বুঝিয়া ছিলাম, এবার আমাদের কাপড় হইল না। দাদামহাশয়ও বোধহয় আমাদিগকে সেইরূপ কিছু বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। পাড়ার সকলে বিসর্জ্জন দেখিতে যাইতে বাহির হইতেছে। এমন সময়ে মেজমামা ছুটিতে ছুটিতে আমাদের জন্য সুন্দর কল্কাপেড়ে শান্তিপুরে কাপড় লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা ত কাপড় দেখিয়া আনন্দে আট-খানা হইয়া গেলাম। মেজমামার বয়স তখন বোধ হয়, কুড়ি বৎসর হইবে, তখন পর্য্যন্ত কোনও কাজকর্ম্ম করেন নাই। বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বোধ হয়, মনে খুব ব্যথা পাইয়া থাকিবেন। সেদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামে হাট ছিল। যখন দেখিলেন আমাদের কাপড় হইল না, জানি না কোথা হইতে টাকা যোগাড় করিয়া কাহাকেও না বলিয়া হাটে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই রৌদ্রে ছুটিতে ছুটিতে হাটে গিয়াছেন এবং আসিয়াছেন, পাছে সময়ে পৌঁছিতে না পারেন। বাড়ীর সকলেই আমাদের কাপড় দেখিয়া খুব খুসী

হইলেন। আমরা নূতন কাপড় পড়িয়া সকলের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেখিতে গেলাম। সে দিনকার সেই আনন্দ শৈশবের সকল স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পূজার কাপড় কতবার পাইয়াছি; কিন্তু কেবল সেবারকার সেই কল্কাপেড়ে কাপড়ের কথাই মনে আছে। এখনও যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।

ইহার অল্পদিন পরেই মেজমামার মৃত্যু হইল। মেজমামার কথা আর কিছুই মনে পড়ে না। তাঁহার চেহারাটাও ভাল মনে নাই। কিন্তু সেই যে বিজয়ার কাপড় দেওয়ার স্মৃতি, তাহা বুঝি কখনও ভুলিব না।

মণ্টি ক্রীষ্টো

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রক্ষা পাইল।

সূর্য্যোদয় দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল—দূরে পাহাড়ের উপরে শ্যাটো-ডি-ইফের জেলখানায়। মনে মনে ভাবিল, "এতক্ষণ বোধ হয় পাঁচটা বেজেছে। আর দু' তিন ঘণ্টা পরে জেল-বাবু আমার ঘরে ঢুকে ফ্যারিয়ার মৃতদেহ দেখ্‌তে পাবে। দেওয়ালের মাঝখানে সেই গর্ত্তটা বেরিয়ে পড়বে—আর আমাকে পাওয়া যাবে না। চারি-দিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। নানাদিকে জাহাজ-ভর্ত্তি সৈন্য পলাতক বন্দীকে ধরবার জন্য পাঠান হবে। পাহাড়ের উপর থেকে কামান দেগে জানিয়ে দেওয়া হবে—সেখান থেকে কয়দী পালি-য়েছে—কেউ যেন কাউকে আশ্রয় না দেয়। তখন আমার কি হবে? আমার সমস্ত জামা কাপড় ভিজে গিয়েছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত। ছুরীখানি হারিয়েছি, শরীর অবসন্ন। আমি কি জেলখানা থেকে পালিয়ে—শেষে এই জনহীন দ্বীপে মরিব?"

নিজের মনকে এই প্রশ্ন করিয়া সে সমুদ্রের দিকে তাকাইল—যেন সেখানে প্রশ্নের উত্তর আছে। সত্যই সেখানে উত্তর মিলিল। অনেক দূরে সে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইল—নিশান দেখিয়া বুঝিল তাহা জেনোয়া বন্দরের জাহাজ। মার্সেলস্ থেকে আসৃছে—যাবে দূরদেশে বাণিজ্য করতে।

এডমণ্ড মনে মনে আন্দাজ করিল, ঐ জাহাজের কাছে যাইতে ঘণ্টা খানিক সময় লাগিবে। ভাবিয়া দেখিল জনশূন্য দ্বীপটা থেকে পলায়নই শ্রেয়। আবার মনে হইল "এই সব নাবিকেরা চোরাই মালের ব্যবসা করে, আমাকে দেখিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিবে—টাকার লোভে হয়ত আমাকে ধরিয়ে দেবে। যাই হোক একটা উপায় ত ঠিক করতে হবে?

ওদিকে কয়েদী পালিয়েছে সে খবরও এতক্ষণে প্রায় সকলে জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় একটী ফন্দী আসিল—"আচ্ছা—কাল রাত্রিরে যে জাহাজখানা ডুবে গিয়েছে—আমি

তারই একজন হতভাগ্য নাবিক বলে এদের কাছে পরিচয় দিই না কেন ? ঠিক মতলব হয়েছে—এই বিপদকেই মাথা পেতে নেব।”

সমুদ্রে নামিবে বলিয়া পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দূরে চাহিয়া দেখিল, যে জাহাজখানি আগের দিন রাত্রিতে ডুবিয়াছে তাহার কয়েকখানি তক্তা আর নাবিকদের কয়েকটা টুপী তীরের উপর পড়িয়া আছে। ভাবিল, ভগবান্ এবার মুখ তুলে চেয়েছেন। সেখানে গিয়া একটী টুপী তুলিয়া মাথায় দিয়া একখানি তক্তা লইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার ইচ্ছা ছিল ঐ জাহাজখানি যখন দ্বীপের পাশ দিয়া যাইবে—তখন উহার সামনে সাঁতরাইয়া গিয়া গতিরোধ করিবে। ছোটবেলা থেকে ভূমধ্যসাগরে নাবিকের কাজ করিয়া—সে বুঝিতে পারিয়াছিল জাহাজখানি কোন দিকে যাইবে। তাহার মতলব ছিল সে সাঁতার দিয়া এমন একটী জায়গায় পৌঁছিবে—যেখান থেকে সে জাহাজের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। জাহাজের দিকে চোখ রাখিয়া সে খুব জোরে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ দেখা গেল জাহাজখানি যেন অন্য পথে চলিতেছে—তাহার মনে নিরাশার ছায়া পড়িল। সবই বুঝি পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু জাহাজের গতি আবার ফিরিল—তাহার প্রাণে আশা জাগিল। কিছুক্ষণ সাঁতরাইবার পর দেখিল তাহার আর জাহাজের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র আধ মাইল। মাথার টুপী খুলিয়া সে খুব জোরে নাড়িতে লাগিল—কিন্তু জাহাজের নাবিকেরা কেউ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। উপরন্তু জাহাজের মুখ আবার অন্যদিকে ফিরিল। অন্যদিকে জাহাজ ঘুরিতেই সে ভীষণ ভয় পাইল। একবার মনে করিল খুব জোরে চীৎকার করিবে—কিন্তু তাদের মধ্যে এত বেশী ব্যবধান যে চীৎকার করিয়া কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করা বৃথা, তাহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না।

জাহাজের এই তক্তাখানি থাকাতে তাহার খুব সুবিধা হইল। সেইখানিকে আশ্রয় করিয়াই সে এতক্ষণ জলে ভাসিতেছিল। ভাবিল যদি জাহাজের লোকেরা তাহাকে দেখিতে না পায়, তবে সেই তক্তার সাহায্যে আবার দ্বীপে ফিরিয়া যাইবে।

এডমণ্ড খুব আগ্রহের সঙ্গে জাহাজখানি দেখিতেছিল। যখন দেখিল জাহাজখানি আবার তাহার দিকেই আসিতেছে তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যতদূর সম্ভব জলের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া টুপীটা খুব জোরে নাড়িতে লাগিল ও বিপদের সময় নাবিকেরা যে সাঙ্কেতিক চীৎকার করে—যাহা আর কেউ জানে না—সেইরূপ চীৎকার খুব জোরে করিতে লাগিল। এইবার জাহাজের লোকেরা তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, ও তাড়াতাড়ি একখানি নৌকা জলে নামাইয়া দিল। এডমণ্ড যখন দেখিল জাহাজের লোকেরা তাহাকে দেখিয়াছে—সে তখন কাঠ ছাড়িয়া দিয়া খুব জোরে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল—যাহাতে শীঘ্র নৌকাখানির কাছে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু তার শক্তি কতখানি ছিল সে ধারণা ছিল না। তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হঠাৎ জমিয়া গেল—সে সহজভাবে আর হাত পা নাড়িতে পারিতেছিল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে অসাড় হাত পা লইয়া কতক্ষণ যুঝিতে পারা যায় ? সে খাবি খাইতে আরম্ভ করিল। নিরাশ হইয়া সে আর একবার চীৎকার করিল—নৌকার নাবিকেরা দ্বিগুণ জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল।

একজন তাহাকে ইটালীদেশের ভাষায় চেঁচিয়ে

বলিল, "সাহস কর বন্ধু!" এই কথাগুলি যখন কাণে আসিয়া পৌঁছিল—তখন একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। যখন আবার জলের উপর ভাসিল, তখন আর একবার চীৎকার করিল। এখন তাহার মনে হইল সেই লোহার গোলাটা যেন পায়ের সঙ্গে বাঁধা আছে ও তাহাকে নীচের দিকে টানিতেছে। আর একটী ঢেউ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—মনে হইল যেন সে পাতাল-পুরীতে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার। চেষ্টা করিয়া আর একবার জলের উপর আসিল। সেই সময় কে যেন তাহার চুল চাপিয়া ধরিল।—ইহার পর সে আর কিছুই জানে না—অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

এমেলিয়া জাহাজে।

জ্ঞান হইলে এডমণ্ড চোখ খুলিয়া, দেখিল সে জাহাজের ডেকে শুইয়া আছে—ও জাহাজখানি চলিতেছে। চোখ খুলিয়াই প্রথমে সে দেখিয়া লইল জাহাজখানি কোন দিকে যাইতেছে। যখন দেখিল জেলখানা থেকে অন্যদিকে যাইতেছে তখন নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু সে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার মনের আনন্দ দুঃখে মিলাইয়া গেল।

তাহার কাছে তিনজন নাবিক ছিল। একজন এক টুক্‌রা গরম কাপড় দিয়া তাহার শরীর মালিস করিয়া দিতেছিল। একজন তার মুখের কাছে পেয়ালায় চা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল; সেই ত তাহাকে সাহস করিতে বলিয়াছিল। তৃতীয় জনকে দেখিয়া মনে হইল তিনি জাহাজের ক্যাপটেন ও পাইলট দুইই—তাহার দিকে খুব দয়ার ভাবে চেয়ে আছে।

মালিশ করাতে ও গরম চা খাওয়াতে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। ক্যাপটেন তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিতে বেশী কষ্ট হইল না।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?'

এডমণ্ড ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালীয়ান ভাষায় উত্তর করিল, "আমি একজন নাবিক। আমার বাড়ী মাল্টায়। আমাদের জাহাজ সিরাকিউস থেকে মাল বোঝাই করে নিয়ে আসছিল—কিন্তু কাল রাত্তিরে হঠাৎ খুব ঝড় হয় তাতে জাহাজখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।"

"তুমি এখন কোথা থেকে আস্‌ছ?'

—"ঐ যে পাহাড় দেখছ ওখানে আমি কোন রকমে গিয়ে উঠেছিলাম—ওরই গায়ে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেয়েছিল। আমার বন্ধুরা সব ডুবে গিয়েছে—আমিই বোধ হয় একলা কোন রকমে বেঁচে আছি। পাছে ঐ দ্বীপে থাক্‌লে না খেতে পেয়ে মরি, এইভয়ে তোমাদের জাহাজখানা দেখবামাত্র একখানা তক্তার সাহায্য নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার দিতে আরম্ভ করি। তোমারাই আমাকে বাঁচিয়েছ—আমি ত ডুবে গিয়েছিলাম প্রায়—কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তোমাদের একজন লোক আমার চুল চেপে ধরেছিল।"

গাল ভরা কালো দাড়িওয়ালা নাবিকটী বলিল—"সে আমি, তুমি কি বল্লে আমি যখন তোমার চুল চেপে ধরি ঠিক সেই সময় তুমি ডুবেছিলে?"

এডমণ্ড তাহার হাত ধরিরা বলিল "হ্যাঁ—আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি ভাই—তোমার এ ঋণ আর ভুলবো না।"

নাবিকটী বলিল—"আমি কিন্তু প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম—কারণ তোমার লম্বা লম্বা চুল দাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল যেন তুমি ভাল লোক না—একজন দস্যু।"

তখন এডমণ্ডের মনে পড়িল—সে যতদিন বন্দী ছিল ততদিন দাড়ি গোঁফ কিছুই কামায় নাই—অতএব তাহাকে অদ্ভূত দেখিতে লাগিবারই কথা। পাছে নাবিকরা তাহাকে কোন রকম সন্দেহ করে সেজন্য সে তাহাদের বুঝিয়ে দিল যে দশ বৎসর চুল দাড়ি কাটিবে না সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; সম্প্রতি দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

ক্যাপটেন বলিলেন, "এখন কথা হচ্ছে—তোমাকে নিয়ে আমরা কি করব।"

এডমণ্ড উত্তর করিল—"যা ইচ্ছা—আমাদের জাহাজ ডুবে গিয়েছে—আমাদের ক্যাপটেন মারা গিয়েছে—আমি কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছি। প্রথমে যে বন্দরে তোমাদের জাহাজ লাগবে সেখানে আমাকে নামিয়ে দিও—আমি একজন ভাল নাবিক শীগ্‌গিরই কাজ জুটিয়ে নিতে পারব।"

তখন ক্যাপটেন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন সে ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে কি কি জানে, এবং কোথায় কোথায় নিরাপদে নঙ্গর করা যায়। এডমণ্ড উত্তর করিল, সে খুব ছোটবেলা থেকেই নাবিকের কাজ করিতেছে। আর এমন বন্দর খুব অল্পই আছে যেখানে সে চোখ না বুজিয়া যাওয়া আসা করিতে পারে। তখন সেই কালো দাড়িওয়ালা নাবিকটী, তার নাম ছিল জ্যাকোপো—ক্যাপটেনকে বলিল—"আচ্ছা তাই যদি হয়, সে কেন আমাদের জাহাজেই থাকুক না—আমাদেরই সাহায্য করবে এখন?"

ক্যাপটেন বিড় বিড় করিয়া বলিল—"এ ছোকরার এখন যে রকম অবস্থা তাতে আমাদের কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।"

এই কথা শুনিয়া এডমণ্ডের নিজের বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা হইল। সে তাহারা কোথায় যাইতেছে জানিতে চাহিল।

উত্তর হইল—"লেগহরণ"

এডমণ্ড বলিল—"যদি তাই হয়—তোমরা এই পথে গিয়ে মিছামিছি কতকটা সময় নষ্ট করছ। আমি একটা সোজা রাস্তা জানি—তোমরা যদি আমাকে জাহাজ চালাতে দাও তবে পথটা দেখাতে পারি।"

ক্যাপটেন খুব আশ্চর্য্য হইয়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। এডমণ্ডের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল সত্যই সে কিছু জানে, তাই তাহাকে হালে বসিয়ে দিল।

সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখিল সমুদ্র যেখানে সরু হইয়া দুটী পাহাড়ের মাঝখান দিয়া গিয়াছে এডমণ্ড তাহার ভিতর দিয়া জাহাজ চালাইতেছে। সেই জায়গাটাকে ক্যাপটেন বরাবর খুব বিপদসঙ্কুল মনে করিতেন। এডমণ্ডের কাজের তারিফ করিয়া ক্যাপটেন ও নাবিকরা তাকে তাদের দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। জ্যাকোপো তাহাকে কিছু জামা কাপড় দিয়া আর কিছু চায় কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

এডমণ্ডের মনে হইল, সে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু খায় নাই—বলিল, "আমায় কিছু খেতে দাও।" জ্যাকোপো তাকে খানিকটা রুটী আর চা আনিয়া দিল।

হঠাৎ ক্যাপটেন বলিয়া উঠিল "ওহে—শ্যাটো ডি-ইফে কি হোল?"

খানিকটা সাদা ধোয়া কালো পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল—কিছু পরে 'গুড়ুম' করিয়া একটী চাপা শব্দ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিল।

একটু সন্দেহের চক্ষে এডমণ্ডের দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন তাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এর মানে কি?"

এডমণ্ড শান্তভাবে বলিল, "বোধ হয় কাল রাত্রে

কোন কয়েদী পালিয়েছে তাই কামান দেগে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে।'

ক্যাপটেন খুব কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে যে রকম শান্তভাবে খাইতেছিল তাহাতে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। ক্যাপটেন ভাবিল—"যা হোক—ও পলাতক বন্দী হলেও একজন ওস্তাদ নাবিক—জেলখানার ক্ষতি হলেও আমার লাভ।"

এডমণ্ডকে আবার হালে বসিবার হুকুম দেওয়া হইল। জাহাজ চালাইতে চালাইতে সে জ্যাকোপোকে সেটা কোন বৎসরের কোন তারিখ জিজ্ঞাসা করিল। জ্যাকোপোকে দেখিয়া মনে হইল সে এই প্রশ্ন শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়াছে। তখন সে তাকে বুঝিয়ে বলিল—"কাল রাত্তিরে এমন ভীষণ অবস্থার মধ্যে ছিলাম যে আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে।"

জ্যাকোপো তাহাকে তারিখ বলিলে তাহার মনে পড়িল ঠিক চৌদ্দ বৎসর আগে ঐদিনে সে বন্দী হইয়াছিল। মার্সিডিসের কথা মনে করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ও এতদিনে তার কি হইয়াছে ভাবিতে লাগিল। ড্যাংলার ও ডিভিল ফোর্টের কথা ভাবিয়া তার চোখ দুটী ঘৃণায় ভরিয়া গেল—মনে মনে ঠিক করিল, ভয়ানক প্রতিশোধ লইবে। ইতিমধ্যে সুন্দর বাতাস বহিতে লাগিল। পালে ভর করিয়া জাহাজখানি তাড়াতাড়ি লেগহরণের দিকে চলিল।

ক্রমশঃ।

শ্রী বিমলেন্দু সরকার

বীর-বালক

ছোট্ট একটী ছেলে সে। গায়েও তার জোর ছিল না বেশী, দেখ্‌তেও বয়সের আন্দাজে ছোটো-খাটো। কিন্তু স্বভাবটী তার এম্নি মিষ্টি,—যে দেখ্‌তো সেই আদর কোর্‌তো, সেই ভালবাস্‌তো। মুখখানা সদা প্রফুল্ল, চোখ দুটী খুব উজ্জ্বল, সেই চোখের চাহনি দেখ্‌লেই সবাই বল্‌তো—এর মনটা তো ওর চেহারার মতন দুর্ব্বল বা ছোট্ট মনে হয় না, চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, কি যেন মস্ত বড় একটা কল্পনা তার মনে সদাই জাগছে, কি যেন একটা গভীর চিন্তায় সে বিভোর! তার বাপ, মা সহরবাসী, সে সহরে সবুজ মাঠ, গরুর পাল, গাছের ছায়া, পাখীর ডাক, নদীর কূলে কূলে ভরা জল, গাছভরা ফল কিছুই ছিল না—ছিল কেবল গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ, রাস্তার বালি কাঁকরের ধূলো, ব্যস্ত পথিকের পথ চলার ঠেলাঠেলি, ফিরিওয়ালার হাঁক্-ডাক্, পুলিশ পাহারাওয়ালার চোখ-রাঙানি, আর ছোট ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে মাষ্টারের ধম্‌কানি। ছোট্ট ছেলেটী রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় বসে বসে এই সব দেখ্‌তো, তার মনখানা কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে উধাও হোয়ে কোন্ কল্পনারাজ্যে ঘুরে বেড়াতো কে জানে, কেউ ডাক্‌লে চম্‌কে উঠে ফিরে চাইত। একদিন তার মা বল্লেন "বেড়াতে যাবি তোর ঠাকুমার বাড়ী? সেখানে তোকে পাঠিয়ে দি, তোর শরীর ভাল হবে।" তখনকার দিনে মোটরও ছিল না, ট্রেণও চল্‌ত না। ছিল কেবল বড় বড় ঘোড়ার গাড়ী, চার ঘোড়া, ছয়

ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেতো। সেইরকম একটা গাড়ীতে চড়ে সে চল্‌ল তার ঠাকুরমার কাছে। সারাদিন চল্‌বার পরে প্রায় সন্ধ্যেবেলা পৌঁছলো যেখানে, সে যেন ঠিক্ তার মনের মতন দেশ, তার কল্পনার রাজ্যি। চারিদিকে ধূধূ কোরছে খোলা মাঠ—দূরে দূরে এক একখানা ঘর ঠিক্ ছবির মতন দেখাচ্ছে, ঘরখানা ঘিরে ফুলের বাগান। পশ্চিমের আকাশ লাল আলোয় ভরে গেছে, পাখীগুলো উড়ে উড়ে বাসায় চলেছে, রাখাল ছেলেরা গরু চরিয়ে ঘরে ফিরছে, কেমন নিস্তব্ধ, নির্জ্জন জায়গাটী! ছেলেটী অবাক্ হোয়ে চারিদিক দেখ্‌ছে এমন সময় সুন্দর একখানা বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী থাম্‌লো, আর তার ঠাকুরমা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে কত চুমা দিলেন। সে কেবল ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে বল্‌লে- "ঠাকুরমা আমি এখানেই থাকবো।" ভোরের আলোয় আর পাখীর ডাকে তার ঘুম ভাঙ্‌লো, সে মনের আনন্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লো। রাখাল ছেলেদের দলে ভিড়ে, মাঠে মাঠে বাঁশী বাজিয়ে নেচে বেড়ালো। এতো বড় বড় মাঠ, সবুজ পাতায় ভরা এতো বড় বড় গাছ, তার ভেতরে পাখীর বাসা, মাথার ওপর নীল আকাশ, তার মনকে একেবারে জয় কোরে নিলে, সে ক্ষিদে, তেষ্টা ভুলে সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতো। তার ঠাকুরমা ভাব্‌লেন, "সহুরে ছেলে, কখনো এসব দেখেনি, আহা থাক্, বাধা দিয়ে কাজ নেই, একটু স্ফুর্ত্তি করুক।" একদিন বিকেলবেলায় সে বেরিয়েছে বেড়াতে, কোথায় গিয়েছিলো কে জানে সন্ধ্যে হোয়ে গেল, ঘরে ফিরলো না দেখে ঠাকুরমা তো ভেবেই অস্থির, চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন তাকে খুঁজে আন্‌তে, কত মাঠ, ময়দান পার হোয়ে, জঙ্গল ভেঙ্গে চাকরেরা তাকে বের কোরলে একটা ছোট নদীর ওপার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, বুনো জন্তুরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন যায়গায় একটা মস্ত বড় পাথরের উপর বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে। চাকরেরা ডাক্‌তেই চম্‌কে সে সাড়া দিলে, তারা জিজ্ঞেস্ কোরলো "এখানে বসে কি ভাবছ?" সে উত্তর কোরলো "কি কোরে নদীটা পার হব, তাই উপায় খুঁজছিলাম।" বাড়ী ফির্‌তে তার ঠাকুরমা বল্লেন "হ্যাঁরে তোর ভয় কোরলো না ওখানে বসে থাক্‌তে এই অন্ধকার রাতে?" সে অবাক্ হোয়ে ঠাকুমার মুখের পানে চেয়ে বল্লে— "ভয়? ভয় কি জিনিষ ঠাকুরমা? আমি তো কখনও ভয় দেখিনি?"

ঠাকুরমার বাড়ী কিছুদিন বেড়িয়ে সে যখন বাড়ী ফিরে গেল, তখন তার বাবা তাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি কোরে দিলেন। সে আর তার বড় ভাই দুজনে মিলে অনেক মাইল রাস্তা হেঁটে ইস্কুলে যেতো। তাদের দেশ বড্ড শীতের দেশ, শীতের সময় বরফ পড়ে। একদিন ভোরের বেলা উঠে সে দেখে রাস্তা একেবারে সাদা হোয়ে আছে, মানুষ জন চল্‌ছে না বেশী, যারা যাচ্ছে তারাও যেন সাদা তুলোর পোষাক পরে চলেছে মনে হোচ্ছে। দুই ভাইয়ে গরম পোষাক এঁটে চল্‌ল বই হাতে ইস্কুলের পথে—অর্দ্ধেক পথ যাবার পর তারা আর যেন এগোতে পারে না, বরফ পড়ে পড়ে এক এক জায়গা উঁচু পাহাড় হোয়ে গেছে। তার দাদা বল্‌লে—"চল্ আমরা আজ বাড়ী ফিরে যাই, অত কষ্ট কোরে আর যেতে পারি না।" বাড়ী যখন ফিরে এলো, তখন তাদের বাবা বল্লেন, "তোমরা আর একটু চেষ্টা কোরলে হয়ত ইস্কুল পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারতে —আচ্ছা আর একবার যাও চেষ্টা কর গিয়ে, আমি তোমাদের উপর বিশ্বাস রেখে ছেড়ে দিলুম, নিতান্তই যদি যাওয়া না যায়, তবেই ফিরবে। মিছামিছি

ইস্কুল কামাই করা ভাল না।” বড় ভাইটীর তত ইচ্ছে ছিল না সেদিন যাবার, কিন্তু ছোট শুন্‌লে না তার কথায়— দুজনে আবার চল্‌ল। এবারে সে একটা কুড়ুল হাতে নিলে—যেখানটায় রাস্তা বরফে বন্ধ হোয়ে গেছে, সেখানে কুড়াল দিয়ে বরফ কেটে রাস্তা বের কোরলে। যখন অনেক বেলায় তারা ইস্কুলে পৌঁছলো, তখন তাদের মাষ্টার অবাক্ হোয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—“এতটুকু ছেলে, তুমি এই দুর্য্যোগে কেন বেরিয়েছ? আহা শীতে তো জমে যাচ্ছ, এসো আগুনের পাশে বস, কি কোরে এলে এতো বরফ ভেঙ্গে?” সে বল্‌লে—“আমার বাবা যে বলে দিয়েছিলেন, তিনি আমায় বিশ্বাস করেন যে আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টা কোরব, তাই এত কষ্ট কোরেও আমি না এসে পারলুম না।” এর পর তার বাবা তাকে ইস্কুলের বোর্ডিংএ রেখে দিলেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সে সবাইয়ের প্রিয় হোলো। মাষ্টাররা তার নির্ভীক স্বভাবের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হোলেন। একদিন রাতের বেলা সব ছেলে শুয়ে পড়েছে, জান্‌লা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আস্‌ছে, তার সঙ্গে মিশে মিষ্টি ফলের গন্ধ এসে সব ছেলেদের মাতিয়ে তুল্‌লো। কয়েকটী ছেলে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালায় এসে দেখে—পাশের বাড়ীর বাগানে অ্যাপেল গাছে পাকা পাকা অ্যাপেল ঝুল্‌ছে। ফলের ভারে গাছটী নুয়ে পড়ে যেন বল্‌ছে,“আমার বোঝা হাল্‌কা কোরে দাও গো, আমি আর বইতে পারিনে।” ছেলেগুলো পরামর্শ আঁটলো “একজনের কোমরে কয়েকখানা বিছানার চাদর জোড়া দিয়ে দড়ির মতন পাকিয়ে বেঁধে জান্‌লা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া যাক্, সে কোঁচড় ভরে ফল পেড়ে আন্‌বে, সবাই মিলে ভাগ কোরে খাব।” কিন্তু সেই “বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার” পরামর্শের মতন এ পরামর্শও বৃথাই হোলো, কারও সাহস হয় না কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বার, ভয় হয়, যদি ছিঁড়ে পড়ে। এমন সময় সেই ছোট্ট ছেলেটী বল্‌লে “আমি পারি, আমার ভয় নেই।” তখন সবাই তার কোমরে চাদরের দড়ি বেঁধে দোতলা থেকে নামিয়ে দিলে, সে অনায়াসে নেমে গিয়ে অনেকগুলো অ্যাপেল এনে সঙ্গীদের দিলো, নিজে একটীও রাখ্‌লে না। তাকে সকলে আদর কোরে বেশী কোরে দিতে চাইলো কিন্তু সে বল্লে “আমি চুরী করা জিনিষের ভাগ নিই না। তোমরা বলছিলে ভয় করে নাম্‌তে, আমি তাই নেমে দেখিয়ে দিলুম, এতে ভয়ের কিছু নেই।” সবাই তার কথার লজ্জিত হোয়ে মাথা নীচু করে রইল।

তেরো বছর বয়সের সময় সে তার মামাকে লিখলো “মামা, আমি জাহাজের নাবিক হোতে চাই, তোমার জাহাজে আমাকে কাজ শেখাতে নিয়ে যাও।’ তার মামা একটা জাহাজের কাপ্তেন, তিনি জবাব দিলেন “এতোটুকু ছেলে তুমি এখনই নাবিক কি কোরে হবে? কত ঝড় তুফান কত বিপদের মধ্যে দিয়ে আমাদের জাহাজ নিয়ে যেতে হয়। কত যুদ্ধে কত নাবিককে প্রাণ হারাতে হয় এমন কাজ কি তোমার মতন কচি ছেলের সাজে?” সে কিন্তু নিরাশ হোলো না, সে জেদ্ ধরে বস্‌ল যাবেই জাহাজের কাজে। আরও কিছু-দিন অপেক্ষা কোরে আবার দরখাস্ত পাঠাল এক জাহাজে। সেখান থেকে জবাব এলো তাকে নাবিকের কাজে তারা নিতে রাজী। সে জাহাজ কিন্তু অনেক দূরে যাবে, সে জাহাজে তার মামাও কাপ্তেন নন। বাপ মা অনেক বোঝালেন, সে বাপ মাকে অনেক কষ্টে রাজী কোরে, দাদার কাছে থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে চল্‌লো। বুকখানা তার গর্ব্বে আনন্দে ভরে

উঠলো। কতদিনের মনের আকাঙ্ক্ষা আজ তার পূর্ণ হোলো!

জাহাজের কাপ্তেন বল্লেন, "আমরা উত্তর-মেরুর সন্ধানে যাবো, সে দেশ বরফে বরফময়, বড্ড ঠাণ্ডা, জমে যাবার মতন শীত, কত সময় হয়ত ভাল কোরে খেতেও পাবে না। কত বিপদ হোতে পারে, তুমি এখনও বড় ছোট, এত কষ্ট সইতে বোধ হয় পারবে না, হয়ত শীতে মরেই যাবে। আমি বলি, ২।৪ বছর অপেক্ষা কোরে অন্য জাহাজে ঢুকতে চেষ্টা কর।" ছেলেটী বল্লে, "আপনি দয়া কোরে আমায় নিয়ে চলুন, আমি পারব সব সইতে, যা বোলবেন তাই কোরবো, কোনো কাজে 'না' বোল্‌বো না, আমাকে ছেড়ে যাবেন না।" কাপ্তেন ছেলেটীর উজ্জ্বল চোখ দুটীর পানে চেয়ে, তার এতো আগ্রহ দেখে আর আপত্তি করতে পারলেন না। উঃ—কতদূর সে দেশ, একেবারে পৃথিবীর একপ্রান্তে কেবল অনন্ত সমুদ্র বেয়ে সে দেশের সন্ধান কোরতে হবে, তীর নেই, কূল নেই, এ যাত্রা কোনোদিন শেষ হবে বোলেও মনে হয় না। তবু বালকের আনন্দ দেখে কে? কোমর বেঁধে অন্য নাবিকদের সঙ্গে কাজে লেগে গেল। সাগরের ঢেউয়ের উপর জাহাজখানা যেমন নেচে নেচে এগোতে থাকে, তার মনটীও তেম্নি স্ফূর্ত্তিতে নেচে নেচে ওঠে, তার বুকের বল বেড়ে যায়।

জাহাজ একদিন হঠাৎ থেমে গেল—কি ব্যাপার? সকলের মুখে ত্রাসের চিহ্ন—নিরাশার ছায়া তার মুখের আনন্দের ছাপ কিন্তু একটুও মলিন হয়নি। সে যখন কাপ্তেনের কাছে শুন্‌লো বরফের পাহাড়ে এসে ঠেকেছে জাহাজ, যতদিন না—এ বরফ গলে, ততদিন এগোবার কোনো পথ নেই, তখন তার ভারী মজা লাগ্‌লো। সে কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি, চারিদিক বরফে ঘিরে ফেলেছে, সাদা ধব্‌ধবে পাহাড়—অনেক দূরে একটু একটু নীল জলের রেখা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর কি ভীষণ শীত! কত পশমের পোষাক পরে, আগুনের কাছে বসেও সে শীত কম্‌তে চায় না! তবু তার স্ফূর্ত্তির সীমা নেই। একদিন জাহাজের ওপর থেকে সে দেখ্‌তে পেলো মস্ত বড একটা ভালুক, তার সারা গা সাদা লোমে ঢাকা, কী সুন্দর, আর কী ভীষণ দেখতে! সে আর একজন তরুণ নাবিককে সঙ্গে নিয়ে, বন্দুকে গুলি ভরে কাঁধে চড়িয়ে, মারতে গেল সে জানোয়ারটাকে। বরফের পাহাড় ভেঙ্গে খানিক দূরে গিয়ে বন্দুকটী সোজা কোরে সেই না ছুড়তে যাবে, এমন সময় কাপ্তেনের গম্ভীর ডাক্ কাণে এলো—"শীগগির ফিরে এসো।" সে হুকুম অমান্য করবার সাহস হোল না তার সঙ্গীর, সে তাকে একা ফেলেই জাহাজে ফিরে এলো। কাপ্তেন দেখ্‌লেন সে ফিরলো না, অথচ ভালুকটা আর কয়েক পা এগোলেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। ঐ-টুকু ছেলেকে অমন ভীষণ হিংস্র জানোয়ারের মুখে দেখ্‌লে কার না আতঙ্ক হয়? কাপ্তেন ভালুকটাকে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুঁড়লেন, বন্দুকের গুলি জানোয়ারের গায়ে লাগ্‌লো না বটে; কিন্তু আওয়াজ শুনে সে ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন ছেলেটী মুখখানা ভারী কোরে জাহাজে ফিরে এলো।

কাপ্তেন বল্‌লেন "তোমার প্রাণের ভয়ও নেই, ভালুক তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে কি বাঁচতে? কেন গেলে ওখানে?" সে বল্‌লো, "আপনি কেন ভালুকটা আমায় মারতে দিলেন না? আমি ভেবে-ছিলুম বাবার জন্য ওর ছালটী নিয়ে যাব। ভালুক আমায় ধরতে পারত না, আমাদের দুজনের মাঝ-খানে একটী বড় গর্ত্ত ছিল জলে ভরা, ভালুক সেটা পার হোতে পারছিল না, আপনি গুলি না ছুঁড়লে

আমি ঠিক মারতে পারতুম।” তখন কাপ্তেন বল্লেন, “তুমি আমার হুকুম কেন অমান্য কোরলে? আর কোনো দিন এরকম অবাধ্যতা কোরলে তোমার কাজ যাবে। বাধ্যতাই নাবিকদিগের সব চেয়ে বড় শিক্ষা।” সে নিজের ত্রুটী বুঝতে পেরে মাথা নীচু কোরে ক্ষমা চাইলে

আর কোনদিন এমন ভুল তার হয়নি। কাপ্তেন তার সাহসের পরিচয় পেয়ে খুব খুসী হোয়ে তাকে আদর কোরলেন। সেবারে তাদের জাহাজ ৬ সপ্তাহ ঐ বরফে আট্‌কে ছিল। এম্নি কোরে একটার পর একটা জাহাজে অনেক কষ্ট স'য়ে, অনেক বীরত্ব দেখিয়ে ২১ বছর বয়সে সে একটা যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেন হোলো। জাহাজের সব লোকরাই তাকে খুব ভালবাস্‌তো, সবাইকে বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার ছিল। বড় বড় নৌ-যুদ্ধে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অনেকেই নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

একবার একটা যুদ্ধের সময় তার ডান চোখটা দৃষ্টিহীন হোয়ে গেল তবু যুদ্ধ-জাহাজ ছেড়ে যেতে তার মন সরল না।

এখন আর সে ছোট্ট ছেলে নয়, এখন একজন নাম-করা যোদ্ধা এবং বীরপুরুষ বোলে জগতময় পরিচিত হোয়ে পড়্‌ল। সকলেই সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে, সকলের মুখে তাঁর বীরত্বের কাহিনী। কত বড় বড় যুদ্ধের মুখে জাহাজ চালিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে এসেছেন। এবার তাঁর ডান হাতখানাও গেল। বন্ধুবান্ধবরা পরামর্শ দিলেন, “এবার প্রাণটুকু নিয়ে ঘরে ফিরে যাও।” কিন্তু বীরের মন কি আপনার প্রাণের মমতা করে? নিজের দেশকে যে ভালবাসে, সে দেশের মান রক্ষা করবার জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে নিজের প্রাণ হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে। দেশের গৌরব অটুট রাখবার জন্যেই এই বীরপুরুষ একদিন যুদ্ধ কোরতে কোরতে শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে এক বন্ধুর কোলে শুয়ে পড়্‌লেন। কথা বল্‌বার শক্তিটুকুও ছিল না তখন, বন্ধুর মুখে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যখন শুন্‌লেন সেদিনের যুদ্ধে তাঁদেরই জয় হোয়েছে, ম্লান পাণ্ডুর মুখখানিতে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠ্‌লো, ভাষা ফুটলো না—নীরব ভাষায় যেন বোলে গেলেন, “মাতৃভূমির জয়ের মালা প'রে মরণকে বরণ করার মতন জীবনের সার্থকতা এমন আর কোথায় আছে?”

* * *

সব বলা হোল কিন্তু এই বীরের নামটীই বলা হয়নি এখনো। এ শুধু গল্প নয়, কল্পনার ছবি নয়, এ একটী সত্যি জীবনের ছোট্ট ইতিহাস। ঐ ছোট্ট ছেলেটীর নাম ছিল, “হোরাসিয়ো নেল্‌সন্‌”—ইনিই বড় হোয়ে একটা খুব বড় যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে ভাইকাউণ্টের পদে উন্নীত হন এবং তখন থেকে জগতের লোকের কাছে “লর্ড নেল্‌সন্‌” নামেই পরিচিত ছিলেন। এই বীরপুরুষ ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফোক (Norfolk) দেশে বার্ণহ্যাম্‌থর্প (Burnhamthorpe) গ্রামে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে অক্টোবর ট্রাফালগারের যুদ্ধে (Battle of Trafalgar) প্রাণদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত ইংরেজ জাতি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিয়াছিল। যদিও সে আজ অনেক কালের কথা—অনেক পুরাণো ইতিহাস, তবু বীরজীবন যে অমর! যে জাতিই জগতে উন্নতির নিশান উড়িয়েছে, তারাই বীরের পূজা কোরেছে, বীরের জীবনকে চিরকাল আদর্শ রেখে চলেছে। এই বীরবালকের সমস্ত জীবনের বৃহৎ ইতিহাস পড়্‌লে প্রাণে নতুন বল, নতুন উৎসাহ জাগে—নতুন জীবন পাওয়া যায়।

শ্রীশান্তিময়ী দেবী

সোণার খনির সন্ধানে

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমরা অনেক দিন সরলার কথা কিছুই বলি নাই, আজ তাহার কথাই বলিব। সরলা তাহার বাবা ও মা—অর্থাৎ নগেনবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে কলিকাতায় ছিল। তাঁহারা এই দুই মাস কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। নগেনবাবুর কাছে হঠাৎ টেলিগ্রাম আসিল, বক্সারে তাঁহার ভাইয়ের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবীর কঠিন পীড়া, বাঁচিবার আর আশা নাই। সেই জন্য নগেনবাবু ও কমলাদেবী সরলাকে বামুন ঠাকুরাণীর কাছে রাখিয়া বক্সারে চলিয়া গেলেন।

সরলা বাপ মা ছাড়া হইয়া বোর্ডিংয়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু কলিকাতা সহরের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে আর কখনই থাকে নাই। বামুন ঠাকুরাণী তাহাকে মায়ের মতনই ভালবাসেন এবং যত্ন আদর করেন, কিন্তু তা হইলেও আজ বাবা মায়ের জন্য তাহার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। সরলাদের পাশের এক বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ ছিল, সেখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কত লোকের আসা-যাওয়া, কত গান, কত বাজনা, কত বাজি-পোড়ান, কত কোলাহল;—এই সকলের জন্য সরলার ভাল ঘুম হইল না। তাহার মনে কত চিন্তাই জাগিল, সে ভাবিতে লাগিল,

"আমার জীবনের কাহিনী ঠিক যেন একটা গল্পের মতন। শুন্‌তে পাই আমার প্রকৃত পিতা মাতা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নাকি মানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আজ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁরা বাপ মা না হয়েও কন্যার মতন আমাকে মানুষ কর্‌লেন, তাঁরা আমাকে সকল সুখেই সুখী করেছেন। দুঃখ কাকে বলে আমি ত তা জান্‌তেই পারি নি। হায়, তার পরে কোথা হতে আমার আপনার ভাইবোন এসে আমার মনের উপরে মায়া বিস্তার কর্‌ল? আজ যে তাদের জন্য আমি কোন সুখেই সুখী হতে পারি নে? হায়, আজ কোথায় সেই অনাথিনী চিরদুঃখিনী বালিকা দুটি? কোথায়ই বা আমার ভাই?"

সরলা একটু নীরব থাকিয়া আবার আপনমনে বলিতে লাগিল—"দাদা কি আর বেঁচে আছেন? সোনার খনির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে হয়ত বনের জানোয়ারের মুখে পড়েছেন, নয় ত রাক্ষসের মতন অসভ্য জাতির লোকেরাই তাঁকে হত্যা করেছে। নইলে এমনও ত হতে পারে যে, তিনি যথার্থই সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন, তার পরে গরুর গাড়ী বোঝাই করে যখন সোণা নিয়ে আস্‌লেন, তখন পাহাড়ী দস্যুরা তাঁকে কেটে কুটে সব সোণা লুটপাট করে নিয়েছে।"

সরলা বিস্তর গল্পের বই পড়িয়াছে। তাই সে মনে মনে তার দাদার বিষয়ে অনেক রকম কল্পনা করিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। অনেক রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকাল বেলায় বিয়ে বাড়ীর সানাইএর বাজনায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে আপনার ঘরে বসিয়া শুধুই দাদার আর দুটি

বোনের কথা ভাবিতে লাগিল। এই সময় বামুন ঠাকুরাণী ছুটিয়া সরলার কাছে আসিয়া কহিলেন, "সরলা, ঐ দেখ ত চেয়ে কে তোমার কাছে আস্‌ছেন ?"

সরলার বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না! সে চাহিয়া দেখিল, তাহারই দাদা সুরেশ। সরলা সুরেশকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদা, তুমি যে বেঁচে আছ, আমি ত তা মনে কর্‌তেই পারি নি। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ? কোন খবর না দিয়ে, এখন কোথা হতে এখানে এলে ?"

বামুন ঠাকুরাণী কহিলেন, "এই কয়মাস ধরে সরলা তোমার কোন খবর না পেয়ে নির্জ্জনে বসে শুধু চোখের জল ফেলেছে। তা আমি ছাড়া আর ত কেউ দেখতে পায় নি।

সুরেশ কহিল, "সরলা, তুমি যে আমাকে বড়ই ভালবাস, আমার কোন খবর না পেলে তোমার ত কষ্ট হবেই। কিন্তু কোন খবর পাঠাইনি বলে আমি কি তোমাকে খুব ভালবাসি নে ? লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি যে আমারই ছেলেবেলার সেই পরম আদরের সুহাসিনী, তা মনে কর্‌লেও মন আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। তবে দুঃখ পেয়ে পেয়ে আমার মনের একটা দিক যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে, তাই তোমাকে আমার কোন খবর পাঠাই নি ."

সরলা। দাদা, তুমি আমাকে ভালবাস না ত কে আমাকে ভালবাসে ?

সুরেশ। সরলা, ঐ চেয়ে দেখ না, তোমার অতি স্নেহের নির্ম্মলা ও সরযূকে যে নিয়ে এসেছি।

নির্ম্মলা ও সরযূ আসিয়া সরলাকে প্রণাম করিল। সরলা স্নেহের আবেগে দুটি বোনের হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া কহিল,—"এস, এস, তোমরা প্রাণের কাছে এস। তোমাদের দেখে আমার মন যে সুখে ভেসে যাচ্ছে। এতদিন ত জান্‌তুম না, তোমরা আমারই আপনার বোন। তোমরা কি দাদার কাছে শুনেছে, আমি তোমাদেরই আপনার দিদি ?"

নির্ম্মলা। শুনেছি বই কি ? দাদার কাছে যেদিন শুন্‌লুম, আপনি আমাদেরই দিদি, সেদিন থেকে শুধুই ভাবছি, কবে আপনার কাছে এসে আপনাকে দেখ্‌তে পাব ?

সরযূ। দিদি, আর ত আমরা কোথাও যাব না, এখন থেকে আপনার কাছেই থাক্‌ব।

সরলা। তা থাক্‌বে বই কি ? তুমি যে আমাদের সকলের চেয়ে ছোট। তোমার মতন আমাদের আদরের পাত্রী আর কে আছে ?

নির্ম্মলা। দিদি, আপনি ত জানেন না, সরযূ আবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল। ভাগ্যে দাদা তা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই নদীতে লাফিয়ে পড়ে সরযূকে উপরে তুলে এনেছেন।

সরলা। মাগো! তাই নাকি ? ব্রহ্মপুত্র নদীটার নামেই যে আমার শরীর শিউরে ওঠে।

সরযূ। দিদি, আপনি ত এখনো মাকে দেখ্‌তে পান নি, তিনিও যে আমাদের সঙ্গেই এসেছেন।

মনোরমা দেবী ধীরে ধীরে সরলার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘর যেন আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিল। সরলার মনে হইল, স্বর্গ হইতে যেন এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী নামিয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর সরলার মাতাকে এমনই দেবী প্রতিমা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ভক্তিতে সরলার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সুরেশ কহিল—"সরলা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে আমি সোণার খনির সন্ধানে গিয়েছিলুম। সোনা পাই নি বটে কিন্তু তুচ্ছ সোণার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ যে আমাদের মা, তাঁর দেখা পেয়েছি। বল ত এমন করে ঈশ্বরের অপার করুণা কয়জন মানুষ

পেয়ে থাকে ? আজ এই দেবীর মতন মাতার কাছে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমার জীবন সার্থক।"

মায়ের মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না, তিনি যত সহজে নির্ম্মলা ও সরযূকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সরলাকে সেরকম করিতে পারিলেন না। শুধুই পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়াইয়া সরলার সরলতামাখা সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সরলা মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। মনোরমা দেবী সরলাকে কহিলেন—

"সুরেশের কাছে তোমার দয়াধর্ম্মের অনেক কথা শুনেছি। যাঁরা তোমাকে পালন করেছেন, তাঁরা আশ্চর্য্যভাবে তোমাকে সকল রকম শিক্ষাই দিয়েছেন। আমি আজ আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর তোমাকে আরো ভাল করুন, তিনিই তোমাকে সুখে রাখুন।"

সরলা মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া একখানা বড় চৌকিতে বসিল। মায়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। সরযূ ধীরে ধীরে দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা দিদিকে আদর করুন, ভালবাসা দিন।"

সরযূ সকলের ছোট কি না, তাই এই কয়েকদিনের মধ্যেই মায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়াছে। মা সরযূকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সরলা মনে মনে কহিল—"হায় দুঃখিনী বালিকা, এতদিন লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে আজ মায়ের স্নেহে এ কি তোমার আনন্দ ? ঈশ্বর মাকে যে কি স্নেহময়ী করেছেন তা ভাব্‌লেও অবাক্ হয়ে যেতে হয়।"

সরযূ আবার কহিল, "মা আমি ত এই কয়দিনে আপনার কতই ভালবাসা পেয়েছি, আপনি দিদিকে আমারই মতন আদর করুন।"

মা এইবার সরলার খুব কাছে আসিয়া তাহার মুখে দুখানি হাত বুলাইতে লাগিলেন। সরলার প্রাণ যেন সুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে বামুন ঠাকুরাণী জলখাবার লইয়া সেই ঘরে আসিলেন। সরলা কহিল, "বামুনঠাকুরুণ, আপনি শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবেন, আমার সাম্‌নে আমারই মা। ঈশ্বর দয়া করে এতকাল পরে মায়ের সঙ্গে আমার মিলন করে দিলেন। এম্নি করে যদি বাবার সঙ্গেও দেখা হত ?"

বামুনঠাকুরাণী সরলার মাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনাকেই সরলার মা বলে মনে হয় বটে ; যেমন সরলার সুন্দর চেহারা তেম্‌নি আপনার।"

সরলার মা। আমাকে সরলার মা না বল্লেও হয়। শুনেছি আপনি ঠিক মায়ের মতনই সরলাকে ভালবাসেন।

বামুনঠাকুরাণী। সে আপনার মেয়ের স্বভাবের গুণে। শুধু কি আমি ? দার্জ্জিলিংএ আমাদের পাড়ার অনেক মেম সরলাকে মেয়ের মতন ভালবাসেন।

সরলার মা। সরলাকে যারা প্রতিপালন করেছেন, আজ যদি তাঁদের দেখ্‌তে পেতুম, তা হলে তাঁদের চরণে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে পড়্‌ত।

বামুনঠাকুরাণী জলখাবার লুচি বেগুণ ভাজা, সন্দেশ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সরলার মা কহিলেন "তোমাদের আজ আমিই জলখাবার পরিবেশন করব।"

সরলা। দাদার কাছে শুনলুম, কাল রাত্রে আপনি কিছুই খান-নি, আপনি এখন খান না, বামুনঠাকরুণ পরিবেশন কর্‌বেন।

মা। আমি স্নানের পরে ঈশ্বরের নাম না করে ত কিছুই খাইনে।

এই কথা শুনিয়া সরলার মার উপরে অতিশয় ভক্তি হইল। মা সবাইকেই জলখাবার পরিবেশন করিলেন। সরলা ও সুরেশ সেই খাবার সামগ্রীর মধ্যে মাতার অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া বড়ই সুখী হইল।

সমস্ত দিনটি মায়ের সঙ্গে সন্তানদের নানা কথায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশ এবং তাহার মা সরলার নিকট তাঁহাদের সকল কথা বলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাড়ীর ভিতরে যেন এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিল। এই আনন্দের মধ্যে বাহিরে কাহার সুমিষ্ট গান শুনা গেল। তাহা শুনিয়া সুরেশ চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহারই পরিচিত গলা। সুরেশ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, বক্সারের সেই ভিখারিণী। ভিখারিণীই মধুরকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

সুরেশ ভিখারিণীর কাছে গিয়া কহিল, "বা! এ যে তুমি! এই কলিকাতা সহরে আমাদের বাড়ীর কাছেই যে তোমায় দেখ্‌তে পাব, এ ত স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। এস তোমাকে আমাদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাই। তুমি দেখে অবাক হবে, আমার মা, আমার তিন বোন এই বাড়ীর ভিতরেই আছেন। এক বাবা ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই আমার মিলন হয়েছে।"

সুরেশ ভিখারিণীকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল এবং মাতাকে কহিল, "মা, যে ভিখারিণীর কথা তোমায় বলেছিলুম, এই দেখ সেই মেয়েটি।"

মা। এস এস, তুমিও যে আমার মেয়ে। তুমিই ত আমার সন্তানকে আশ্রয় দিয়ে বিপদ হ'তে রক্ষা করেছ।

সরলা উঠিয়া ভিখারিণীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে কহিল, "এ যে বেশ হল, তুমিও বোন হয়ে আমাদের কাছেই থাক্‌বে।"

সুরেশ একে এক বোনদের ভিখারিণীকে চেনাইয়া দিল এবং কহিল, "তুমি কেমন করে কলিকাতায় এলে? এখানে কোথায় আছ?"

ভিখারিণী। আমার বাবা ত আর বেঁচে নেই। তাঁর মরণের পরেই আমি কাশীতে গিয়ে এক মাতাজীর আশ্রয় নিয়েছিলুম। তিনি বাঙ্গালা দেশের এক জমিদারের বিধবা স্ত্রী। তাঁর কয়েক হাজার টাকা ছিল। তিনি সেই টাকা নিয়ে কাশীতে সন্ন্যাসিনীর মতনই দিন কাটাচ্ছিলেন। তার পরে তাঁর মনে হল, তিনি পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আশ্রম খুলবেন। তিনিই আমাকে নিয়ে কলিকাতায় এসে বালিগঞ্জে পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আশ্রম খুলেছেন। পঁচিশটি ছেলেমেয়ে সেখানে আছে। তাঁর টাকায় ত সব খরচ চলে না। তাই আমি লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে গান করে আশ্রমের জন্য টাকা সংগ্রহ করি।"

সরলা। সে ত বেশ ভাল কাজ। তা ভিখারিণী দিদি, তোমাকে আমাদের বোন হয়েই এখানে থাক্‌তে হবে। এখান হতে তোমাদের আশ্রমের জন্য যে টাকা আমরা দিতে পারি তা দেব। আর বাকী টাকা তুমি লোকের বাড়ীতে গান করে করেই সংগ্রহ করো।

ভিখারিণী। না বোন, তাকি আর হয়? আমি যে আশ্রমের অনেক কাজই করে থাকি। আর তাদের উপরে আমার এমনই একটা ভালবাসা জন্মেছে, একদিন সেই আশ্রমের ছেলেমেয়েদের না দেখ্‌লে আমার চলে না।

ভিখারিণীকে সরলা নানা রকম জলখাবার খাওয়াইল এবং আশ্রমের জন্য কুড়িটাকার একখানি নোট দিল। সুরেশের মা মনে ভাবিলেন, তাহার গয়নাগুলি তিনি আশ্রমের কাজেই দান করিবেন।

কয়েকদিন সকলেরই খুব আনন্দে কাটিয়া গেল। তাহার পরে নগেনবাবু ও কমলা দেবী কলিকাতা আসিলেন। তাঁহাদের সমাদরে সুরেশ মাতা চোখে আর জল রাখিতে পারিলেন না। কমলা দেবী তাঁহার দুটি ছোট মেয়েকেও আপনার কন্যার মতনই মনে করিতে লাগিলেন।

কয়েক মাস পরে সুরেশের মা একদিন ভিখারিণী-দের আশ্রম দেখিতে গেলেন। আশ্রমের মাতা-জীকে তাঁহার দেবী বলিয়া মনে হইল। তিনিও আশ্রমে থাকিয়া পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের সেবা করিবেন বলিয়াই সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কেহই তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে টলাইতে পারিল না। যে দিন তিনি আশ্রমে যাইবেন, সে দিন নগেন-বাবুর স্ত্রী কমলা দেবীকে কহিলেন,—

"আপনি কি শুধু সরলারই মা ? তা ত নয়। আপনি সুরেশ, নির্ম্মলা, সরযূ সকলেরই মা। আপনার উপরেই এই সন্তানদের সমস্ত ভার। আমি প্রতি সপ্তাহে এখানে এসে একদিন থেকে ছেলেমেয়েদের ভালবাসা দিয়ে যাব।"

সুরেশের মা যেদিন আশ্রমে যাইবেন, সেদিন সব ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদের টাকাকড়ির কোনই অভাব নেই, তোমরা ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌বে, আর সকল বিষয়ে ভাল হতে চেষ্টা করবে। তোমা-দের বাবাকে যে আর কখনো দেখ্‌তে পাবে, তার কোনই আশা নেই। আমি শুধু তাঁর একটি কথা তোমাদের বলছি, তোমরা সেই কথাটি সকল সময়ই মনে রেখ। তিনি বল্‌তেন—

"লেখাপড়া শেখাতেই মানুষের শক্তি, নির্ম্মল চরিত্রেই মানুষের সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরকে ভালবাসাতেই মানুষের প্রকৃত সুখ। আর নিঃস্বার্থভাবে দেশের এবং দশের উপকার করাতেই মানুষের মহত্ত্ব।"

সুরেশের মাতা আশ্রমেই বাস করিতে লাগি-লেন। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে যে দিন তিনি ছেলে-মেয়েদের কাছে আসিতেন, সে দিন কখন্ মা আসিবেন বলিয়া সকলেই পথের পানে চাহিয়া থাকিত। তার পরে মা আসিয়া যখন অতিশয় ভালবাসিয়া ছেলেমেয়েদের নানা কথা বলিতেন, তখন ছেলেমেয়েদের মনে হইত, এ জগতে মায়ের ভালবাসার মতন আর কিছুই নাই।

সমাপ্ত

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

* এই গল্পটির কোন কোন স্থানে সুরেশের মাতার নাম করুণা দেবী ছাপা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে মনোরমা দেবী হইবে।

কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তরণদক্ষ।

কিছুদিন হোল জলে কে কতক্ষণ থাকিতে পারে ও সাঁতার দিতে পারে তার কয়েকটা প্রতি-যোগিতা কলিকাতা সহরে হ'য়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে মিঃ শাফী আহমদ নামে একজন মুসলমান যুবক ওয়েলেশলী ট্যাঙ্কে ক্রমাগত ২৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া থাকেন। ইহার দুই সপ্তাহ পরে হেদুয়া দীঘিতে সেণ্ট্রাল ক্লাবের শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ ক্রমাগত ২৮ ঘণ্টা সাঁতার দেন। এই আটাশ ঘণ্টায় তিনি ২৫ মাইল ৪৮০ গজ সাঁতার দিয়াছিলেন। তিনি যখন সাঁতার শেষ করিয়া ডাঙ্গায় উঠিলেন, তখন বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাই।

ইঁহাদের পরে মিঃ রবীন চ্যাটার্জ্জী হেদুয়া দীঘিতে ৫৪॥ ঘণ্টা জলের উপর ভাসিয়া থাকেন। তার পরেই শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ গোলদীঘিতে ৪৫ ঘণ্টা সাঁতার কাটেন। তিনি যখন প্রতিযোগিতায় নামেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি ৭২ ঘণ্টারও বেশী সাঁতার কাটিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তরণদক্ষ হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৪৫ ঘণ্টা সাঁতার দিবার পরেই তিনি ডাক্তারের অনুরোধে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হন। কারণ মাথার টুপী খুব কষিয়া গিয়া, রক্ত চলাচলের অসুবিধা হওয়ায় তিনি খুব কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। দিনটাও ছিল অতিশয় খারাপ—সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি হয়েছিল। এই ৪৫ ঘণ্টায় তিনি ২৮ মাইলের কিছু বেশী সাঁতার দিয়াছিলেন। মতি বাবুই এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে—কেননা, যদিও মিঃ রবীন চ্যাটার্জ্জী ৫৭॥ ঘণ্টা জলে ছিলেন, কিন্তু তিনি সাঁতার দেন নাই—শুধু ভাসিয়া ছিলেন।

পৃথিবীর মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তিনি একজন মার্কিন মহিলা—তাঁর নাম মিসেস লর্টি স্কোমেল—নিউ ইয়র্ক সহরে বাস করেন। তিনি ১৯২৮ সালের ১৫ই, ১৬ই, ও ১৭ই অক্টোবর তারিখে ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড সাঁতার দিয়াছিলেন।

১৮৭৯ সালে ক্যাপ্‌টেন ওয়েব নামে এক ভদ্রলোক ৮৪ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি দিনে গড় পড়তা ১৪ ঘণ্টা সাঁতার দিতেন আর বাকী সময় শুধু ভাসিয়া থাকিতেন। সেজন্য তাঁর কৃতিত্বকে সকলে স্বীকার করিয়া লয় নাই।

ওয়েব সাহেব ১৮৮৩ সালে নায়েগ্রাতে আর একবার সাঁতার কাটিতে গিয়া ২৪ জুলাই তারিখে ক্রমাগত ৫০ ঘণ্টা সাঁতার দিবার পর ডুবিয়া মারা যান। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ক্যাপ্‌টেন ওয়েবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাঁতার দেনেওয়ালা ছিলেন—কিন্তু ঐ সময়ে বার্ণিস ও ফিলিস জিটেনফিল্ড নামে ১৩ বৎসরের দুই যমজ ভগ্নী ৫২ ঘণ্টা ২০ মিনিট সাঁতার দিয়া ওয়েব সাহেবকে হারিয়ে দেয়।

এই দুই যমজ-ভগ্নীর কৃতিত্ব দেখে চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। নানা দেশে সাঁতার কাটিবার একটা হুজুক পড়ে যায়। ১৯২৮ সালে সাত জন এইরূপ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। প্রথমেই বার্লিন সহরের একটা পুকুরে—অটো ক্যামেরিশ নামে একজন সাঁতার দেন। একটা শিক্ষিত সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে তিনি সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। সিন্ধুঘোটকটী ৪২ ঘণ্টা সাঁতার দিবার পর হাঁফাইয়া পড়ে—কিন্তু ক্যামেরিন ৪৬ ঘণ্টা জলে ছিল। ইহার পরে মিসেস লি ফোরিয়ার আগষ্ট মাসে কালিফোর্নিয়াতে কোণ্টন সহরের এক পুকুরে ৫৬ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড সাঁতার দিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইহার আর একমাস পরে মাণ্টা সহরে—আর্থার রিজো নামে একজন ৫৯ ঘণ্টা ১২ মিঃ সাঁতার দেন। কিন্তু তিনি এই সম্মানের অধিকারী বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। এক সপ্তাহ পরেই নিউ ইয়র্কের মিসেস মার্টেল হাডেলষ্টন ৬০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। মিসেস হাডেলষ্টনের দশাও ঐরূপ হইল। বারদিন যাইতে না যাইতে পেনসিলভেনিয়ার ১৮ বৎসরের বালিকা মিস্ মার্থাহিল ৬১ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া নিজের কৃতিত্ব জাহির করেন। ইহার পরে ১৯২৮ সালের ১২ই অক্টোবর মিস্ হিলকে—যুক্তরাজ্যে নৌবিভাগের—জিমি চেরী—লস এঞ্জেলের কাছে এক হ্রদে ৬৫ঘঃ ১২মিঃ সাঁতার দিয়ে হারিয়ে দেয়। তার এক সপ্তাহ পরেই মিসেস লার্ট মুর ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড সাঁতার দিয়া এখন পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ সন্তরণদক্ষা বলিয়া পরিচিত। মিঃ শাফী আহমদ ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার দিবার জন্য যাবেন।

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

নীতি কথা

৺লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। মূল্য ।৵০

ভবিষ্যত জীবনে যাঁহারা স্বীয় জীবনকে মহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, য তাঁহাদের চরিত্রের ভবিষ্যৎমহত্বের বীজ বাল্যের ক্রীড়ার মধ্যে প্রথিত হইয়াছিল। বাল্যকালে যাহা একবার শুনি বা শিখি, তাহা জীবনের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির হইয়া অচল ও অটল থাকে অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে। সেই জন্য নীতির আদর্শ বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকখানি সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। সরল ভাষা এবং লিপিকুশলতায় বইখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দৈনিক

৺লাবণপ্রভা সরকার প্রণীত

মূল্য ৲

দৈনিক ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থে বিবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ শবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

"দৈনিক জীবনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় মনকে উপাসনার অনুকূল অবস্থাতে আনিবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অপরাপর সহায্যের মধ্যে সাধুজনের চরিত বা ভক্তির আলোচনা একটী প্রধান সহায়। সুতরাং আমার আশা হয় গ্রন্থখানির দ্বারা অনেকের দৈনিক ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেই বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার অনেক বচন পাঠ করিয়া আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি বলিয়া এরূপ আশা করিতেছি।"

"দৈনিক সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পাঠের যোগ্য, ইহাতে কোন সম্প্রদায়িক ভাব নাই। ইহা ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী রচনায় লালিত্য ও ভাষার মাধুর্য্যে প্রচারগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

ভাই বোন

শিশুদিগের পাঠোপযোগী গল্পের বই ইহাতে ভাই বোনের যে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র স্নেহের ধারায় সংসার শিক্ত আমাদের প্রত্যেকের শৈশব মধুময় হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকায় বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন। শিশুমহলে বইখানি অত্যন্ত আদরণীয়।

মাতা ও পুত্র

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত মূল্য ।৵০

বালকবালিকাদিগের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক গল্পের বই। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি এত করুণ যে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয় অশ্রুজলে সিক্ত করে। যাঁহারা এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে ইহা সুকুমার হৃদয় বালিকাদিগের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে মাতার উচ্চ আদর্শ, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের অতুলনী চরিত্র বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সকল নীতি গল্পচ্ছলে দেখান হইয়াছে।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

দ্বিতীয় বর্ষ] পৌষ ও মাঘ ১৩৩৬ [৯ম ও ১০ম সংখ্যা

বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম-এ

সম্পাদিত।

বিষয়-সূচী

পৌষ—১৩৩৬

মাঘ—১৩৩৬

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাকটিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার ঃ—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা; সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৷০; ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

সন্ধ্যারাগ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

২য় বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৬ [৯ম সংখ্যা

প্রশ্ন

ঘরের দ্বারে প্রদীপ জ্বালা
কিসের প্রয়োজন ?
বল্‌না ওমা, আজকে রাতে
কিসের আয়োজন ?
আঁধার রাতে দেবতা বুঝি,
আঁধারে পথ পান না খুঁজি,
তাঁহার তরে প্রাচীর 'পরে
প্রদীপ অগণন ?

পান্থ জনে পথের কথা
বলিয়া দিবে তাই,
ইহার লাগি সকল দ্বারে
প্রদীপ জ্বালা চাই ?
নাইকো কেন চাঁদের বাতি ?
তাহার ছুটী আজের রাতি
তাইতো দেখি আঁধার আজি
আকাশ-গৃহটাই।

কালীর পূজা, কাঁসর বাজে
আরতি তাঁর হয় ?
রক্ষাকালী, পূজার পরে
দিবেন্ বরাভয় ?
তিনিই যদি রক্ষাকালি,
শুধুই কেন প্রদীপ জ্বালি ?
পূজার আগে বাঁচান্ তিনি
ঘুচান্ যত ভয় !

ফাঁকির কথা কহিস্ কেন,
করিস্ কেন ছল !
নয়গো ওমা ওসব কিছু,
আসল কথা বল্ !
আকাশ বুকে তারার মেলা
ওদের সাথে মোদের খেলা,
তাই না গাঁথে দীপের মালা
ধরার শিশু দল ?

শ্রীরথীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

সত্যব্রত

এক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া, সেখানে কয়েকটি ছাত্রকে রাখিয়া পড়াইতেন। অন্যান্য বিদ্যার সহিত তিনি তাহাদিগকে চরিত্রগঠনের সঙ্কেত এবং ঈশ্বরতত্ত্বও শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরের কথা তিনি এমন সোজা করিয়া বলিতেন যে, ছাত্রেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিত। তিনি ছাত্রদিগকে খুব ভাল বাসিতেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। স্নান, আহার, পড়া, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া দিতেন, ছাত্রেরা তাহা মান্য করিয়া চলিত।

ছাত্রদের মধ্যে সত্যব্রত নামে একটি বালক ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাঠে অনুরাগ ও উত্তম স্বভাবের গুণে সে গুরুদেবের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। গুরুদেব তাহাকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, ক্রমে অপর ছাত্রেরা মনে করিতে লাগিল, তিনি তাহার প্রতি পক্ষপাতী। সত্যব্রতর প্রতি তাহাদের হিংসা হইতে লাগিল।

গুরুদেব ছাত্রদের মনের এই মলিন ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং এই ভাব পোষণ করাতে তাহাদের অনিষ্ট হইতেছে ভাবিয়া, তাহাদিগকে সত্যব্রতর গুণ বুঝাইয়া দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন লোক কতকগুলি বড় বড় সুপক্ক আতা ফল আনিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনার আশ্রমের ছাত্রেরা বড় সচ্চরিত্র ও মিষ্টভাষী। তাহারা যখন রাস্তা দিয়া যায় বা মাঠে খেলা করে, তখন আমি তাহাদের পরস্পরের প্রতি কোমল ও সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার প্রতি তাহাদের ভক্তিও অসীম। এই সব দেখিয়া আমার অনেক সময় ইহাদিগকে কিছু খাইতে দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সম্প্রতি আমার বাগানে অনেক বড় বড় আতা ফলিয়াছে। তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া এই এক ঝুড়ি উৎকৃষ্ট আতা আনিয়াছি। এই আতা বড় মিষ্ট। আপনি বালকদিগকে ডাকিয়া এগুলি খাইতে দিন।" এই বলিয়া ঝুড়িশুদ্ধ ফলগুলি রাখিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

গুরুদেব বালকদিগকে ডাকিয়া, প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া আতা দিলেন; এবং বলিলেন, "দেখ, বৎসগণ! এক ব্যক্তি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া এই সকল সুমিষ্ট আতা দিয়াছেন। তোমরাও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই আতা ভক্ষণ করিবে; এবং ভগবানের নিকট দাতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। আর দেখ, আমার আর একটি কথা রাখিতে হইবে। আতাটি প্রত্যেকে এমন স্থানে গিয়া খাইবে, যেন কেহ দেখিতে না পায়।"

এই শেষ কথাটি কেন বলিলেন, ছেলেরা তাহা বুঝিল না। গোপনে খাইতে বলিলেন কেন? যাহা হউক, তাহারা গুরুর বাক্য পালন করিল। সকলে আপন আপন আতা হাতে লইয়া এক একটি গোপন স্থান খুঁজিয়া লইল; এবং আতাটি খাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সত্যব্রতর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে আসিল, সকলে দেখিল, আতাটি তাহার

হাতেই রহিয়াছে; এবং তাহার মুখ বিষণ্ণ। ইহা দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল; কেহ কেহ আস্তে আস্তে বলিল, "কি বোকা! গুরুদেবের উপদেশ বুঝিতে পারে নাই।"

গুরুদেব তখন সত্যব্রতকে আদর করিয়া কাছে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বাছা! আতাটি ফিরাইয়া আনিলে কেন?" সত্যব্রত কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি বলিয়াছেন, এমন স্থানে খাইতে হইবে, যেখানে কেহ দেখিতে না পায়। আমি এরূপ স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। যেখানে যাই, মনে হয়, পরমেশ্বর আছেন; তিনি দেখিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া বালকদের হাসিমুখ একসঙ্গে গম্ভীর হইয়া গেল। তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপেক্ষা করিতে লাগিল, তিনি কি বলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গুরুদেব বলিলেন, "প্রিয় বৎসগণ! তোমাদের কি স্মরণ আছে, আমি তোমাদিগকে সকাল সন্ধ্যায় কি করিতে বলিয়াছিলাম? তোমরা কি তা' কর? আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, পরমেশ্বর জগতের রাজা এবং আমাদের জীবনের মালিক। আমাদের পক্ষে তিনি পিতামাতার অপেক্ষাও অধিক। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিবে; আর যখনই স্মরণ হয়, ভাবিবে, তিনি আমাকে দেখিতেছেন। তোমরা কি এরূপ ভাব? সত্যব্রত নিশ্চয়ই আমার এই উপদেশটি পালন করিয়াছে। এখন তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সে ঈশ্বর-শূন্য স্থান দেখিতে পায় না। সত্যব্রতকে ভাল-বাসিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না?"

বালকেরা তখন বুঝিতে পারিল, সত্যব্রতর সহিত তাহাদের প্রভেদ কোথায়। সত্যব্রত যে উপদেশ শুনে, তাহাই কাজে করে; তাহারা শুনে ও শিখিয়া রাখে, কিন্তু সকলগুলি কাজে করে না। হায়! যে শিক্ষা কাজে লাগান হইল না, তাহা পাওয়ায় ফল কি?

ব্যর্থ সেই টাকা-কড়ি, হাটে যা না চলে;
ব্যর্থ সেই বিদ্যা, যাহা জীবনে না ফলে।

সত্যব্রতর জীবন ধন্য। সে গুরুর উপদেশ কাজে লাগাইয়া অল্প বয়সেই এমন জ্ঞান লাভ করিয়াছে, যাহা বড় হইয়াও অনেকে পায় না।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দুইবন্ধু

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চাকরীর দশমাস

ব্রাউন জোন্স কোম্পানীর আপিসের বড়বাবু যোগীন্দ্রনাথ দত্তের বয়স আটচল্লিশ বৎসর। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। কালো সার্জ্জের ইজার চাপকান পরিয়া ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে শ্যামবাজার হইতে আপিসে আসেন।

আপিসে আসিয়া পকেট হইতে বাহির করিয়া দাগ-কাটা লেবেল-আঁটা একটি ছয় আউন্স ঔষধের শিশি ডেস্কে রাখিয়া দেন। মাঝে মাঝে সেই ঔষধ দুই এক দাগ পান করেন। ঔষধটা নিশ্চয়ই খুব তীব্র—কারণ পান করিয়াই মুখটা বিকৃত করেন; তখন রুমাল দিয়া ওষ্ঠ যুগল উত্তমরূপে মুছিয়া পকেট হইতে গোটা দুই ছোট-এলাচ বাহির করিয়া তাহার দানাগুলি চর্ব্বণ করিতে থাকেন।

আপিসে বড়বাবুর বড়ই প্রতাপ। বড় সাহেব একেবারে তাঁহার হাতধরা—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এমন ক্ষমতা না থাকিলে কি এককথায় নলিনীর চাকরী করিয়া দিতে পারিতেন? বড়-বাবু যাহা বলেন, বড়সাহেব তাহাই বিশ্বাস করেন। এই কারণে তাঁহার অধীন কেরাণীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার খোসামোদ করিয়া থাকে।

পয়লা তারিখে বেলা দশটার সময় আসিয়া নলিন নূতন কার্য্যে ভর্ত্তি হইল। পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিস করিয়া, বাড়ী গিয়া হাতমুখ ধুইয়া, আবার ছয়টার পর ছেলে পড়াইতে বাহির হইল। দৈনিক খরচের জন্য ভুবনবাবুর বাড়ী হইতে একটি টাকা লইয়া রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। এত পরিশ্রম করা কোনও কালে তাহার অভ্যাস ছিল না। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হইত। ক্রমে সহিয়া যাইতে লাগিল। নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন স্মরণ হইলেই তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। কিন্তু বসিয়া বসিয়া সেকথা ভাবিবার সময় সে বড় পাইত না।

আপিসে সারাদিন কাজের ভীড়, সন্ধ্যার পরেও তাহাই, রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিবামাত্র শ্রান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িত, এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া যাইত। সুতরাং এক হিসাবে এই পরিশ্রম যেন তাহার মনের কষ্টের ঔষধ হইল।

এইরূপে একমাস গেল, দুইমাস গেল, ছয়টি মাস অতীত হইল। এই ছয়মাসে একদিনও সে মদ স্পর্শ করে নাই। চাকরী করিবার সময়

প্রথম প্রথম মদের দোকানের সম্মুখ দিয়া গেলেই তাহার মনে প্রলোভন উপস্থিত হইত,—ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু তখনই পকেটে হাত দিয়া দেখিত, পকেট শূন্য। গৃহে দুই চারি আনা থাকিত বটে, কিন্তু পুত্রকন্যার শুষ্ক মুখ ও জীর্ণ বস্ত্র স্মরণ করিয়া সে দুই চারি আনা আনিয়া আর ঐ কার্য্যে অপব্যয় করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। এই-রূপে ক্রমে তাহার মনের শক্তি বাড়িতে লাগিল, প্রলোভনের শক্তি কমিতে লাগিল। এখন পথ চলিতে চলিতে অন্যমনে কখন সে মদের দোকান পার হইয়া আসে, তাহা জানিতেও পারে না।

সপ্তম মাসের প্রথমে তাহার উপার্জ্জনের পঁয়ত্রিশটি টাকা সম্পূর্ণ তাহার হাতে আসিল। সে মাসের প্রথম রবিবারেই সে মাছ তরকারী ছাড়া, একমাসের খরচের উপযোগী অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে ভুবনবাবু তিন চারিবার আসিয়া-ছিলেন, দুইএকদিন করিয়া থাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

পূজার পর কার্ত্তিক মাসের শেষে ভুবনেশ্বরবাবু আবার কলিকাতায়। নলিনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এপ্রেন্টিসের এক বছর পূরতে আর দেরি কত?"

নলিন বলিল—"দশমাস হল প্রায়—আর দুই মাস।" "দুইমাস পরে আপনার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হবে ত?" "এক মাস পরে বড়বাবু আমার সম্বন্ধে এক রিপোর্ট লিখবেন, আমি কার্য্যক্ষম কি না। যদি কার্য্যক্ষম বলে লেখেন তবে আর একমাস পরে আমার পদ পাকা হবে, মাইনেও পঞ্চাশ টাকা হবে।" "আর যদি তা না লেখেন?" "যদি না লেখেন, তাহলে বছর পূর্ণ হলেই আমার চাকরী শেষ হয়ে যাবে।"

"আপনার কাজকর্ম্মে বড়বাবু সন্তুষ্ট আছেন ত?" "এখন পর্য্যন্ত অসন্তোষের কোন লক্ষণ ত দেখিনি।" "বেশ বেশ। উনি রিপোর্ট ভালই লিখবেন বোধ হয়। লোকটি ভাল।"

পরদিন রবিবার ছিল, নলিনকে ভুবনবাবু আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। নলিন স্নানাদি করিয়া নয়টার সময়ই উপস্থিত হইল। আহারাদি করিতে বেলা বারোটা হইল। ইতিমধ্যে দুইজনে বসিয়া অনেক গল্প হইল—আপিসের কথা, বড়বাবুর কথা, নলিনের সংসারিক অবস্থার কথা। নলিন তাহাকে জানাইল যে, বিপিনবাবুর অনুমতিক্রমে সে একবৎসর মাত্র তাঁহার বাটীতে বাস করিতে পাইবে, সে একবৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ভুবনবাবু বলিলেন—"তা হ'লে ওবাড়ীতে আপনি তো আর দুই মাস আছেন। তারপর একটা ভাড়াটে বাড়ী খুঁজতে হবে ত?"

"তা হবে বৈ কি।"

এই বেলেঘাটাতেই আমি একটা ছোট বাড়ী দেখে রেখেছি। এখন সেটি খালি নেই—মাস দেড়েক পরে খালি হবে। সেইটিই নেব স্থির করেছি।

"কোন্‌খানে?"

"আপনার বাড়ীর খুব কাছেই একটা গলির মধ্যে ছোট বাড়ী, উপরে দুখানি নীচে দুইখানি ঘর, নীচে একটি কল আছে।"

"কত ভাড়া?"

"পনেরো টাকা।"

"দুইমাস পরে আপনার উপার্জ্জন যেমন

পঁচিশ টাকা বাড়িবে তেমনি খরচও পনেরোটি টাকা বেড়ে গেল।"

"তা আর কি করা যাবে। কায়ক্লেশে কোনও রকম করে দিনপাত করা।"

দুইদিন পরে ভুবনেশ্বরবাবু নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গেলেন।

এবার তিন মাসের কম আর তাঁহার কলিকাতায় আসা হবে না।

ক্রমশঃ

প্রজাপতির খেদ

পাখী এক ডেকে বলে, শোন্ প্রজাপতি
বৃথা তোর রূপ গর্ব্ব, ওরে মূঢ়মতি !
পাখী হয়ে মত্ত তুই সুখ-স্বপ্নে ভোর
জানিস্ কি কোন্ হেয় বংশে জন্ম তোর ?
পক্ষী দলে মিশেছিস্ জেনে রাখ বোকা
তোর পিতৃকুল হল ঐ শুয়ো পোকা
এক হাজার পা তাহার কি রূপের ছিরি
শিমুলকণ্টক যেন আছে দেহ ঘিরি
পক্ষী বংশ উচ্চ অতি—আভিজাত্যময় ;
তোদের আপন ভাবা—সে কভু কি হয় ?
পাখীর বচন শুনি ক্ষুব্ধ প্রজাপ্রতি
আপন বংশের তরে খেদ করে অতি
তাহা শুনি কবি কন প্রজাপ্রতি শোন্,—
বৃথা তোর দুঃখ বোধ,—খেদ অকারণ।
অজ্ঞ যারা তারা শুধু করে ভেদাভেদ,
জ্ঞানীরা বোঝে যে গুণ, জানে না প্রভেদ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মণ্টি-ক্রীষ্টো

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন সুন্দর, পরিষ্কার দিনের ভোর বেলায় জাহাজ লেগহরণ বন্দরে পৌঁছিল। পূর্ব্বে অনেকবার এডমণ্ড জাহাজ লইয়া এই বন্দরে আসিয়াছে। তাই সে ব্যগ্র হইয়া দেখিতে লাগিল সহরটির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না। মনে হইল বিশেষ কিছুই বদল হয় নাই। জাহাজ নঙ্গর করিতেই সে ক্যাপটেনের কাছে সহরে যাইবার অনুমতি চাহিল কারণ তাহার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, চুল দাড়ি কামাইতে হইবে। ক্যাপটেন তাহাকে ছুটি দিলেন ও তাহার কাজের তারিফ করিয়া কিছু মাহিনাও দিলেন। তিনি একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ জটাজুট কামাতে নাপিত ভায়া দ্বিগুণ পয়সা বেশী নেবে।"

এডমণ্ড কিছু জবাব দিল না একটু মুচকি হাসিয়া সায় দিল।

তীরে পৌঁছিয়া তার মনে পড়িল কাছেই একটা নাপিতের দোকানে সে আগে অনেকবার কামাইয়াছে। একটু খুঁজিতেই তাহা পাইল— দোকানটি ঠিক আগের মতই আছে। দোকানে ঢুকিয়া নাপিতকে কামাইয়া দিতে বলিল। তাহার লম্বা লম্বা চুল দাড়ি দেখিয়া নাপিত একটু আশ্চর্য্য হইল—কিন্তু কিছু বলিল না, একখানি চেয়ার দেখাইয়া তাহাতে বসিতে ইঙ্গিত করিল। আধঘন্টা পরে এডমণ্ড একটু সভ্যের মত দেখিতে হইল— কামানো যখন একেবারে শেষ হইল তখন তাহাকে একেবারেই চেনা যায় না। কে বলিবে সে চৌদ্দ বৎসর কয়েদী হইয়া বন্দী ছিল ?

একখানি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এডমণ্ড নিজের চেহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। যে মানুষটাকে সে আয়নার ভিতরে দেখিল তাহাকে আগে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। চৌদ্দ বৎসর আগে যখন বন্দী হইয়াছিল— তখনকার চেহারার সহিত কোন মিল নাই। বন্দী হইবার সময় সে ছিল একজন যুবক—মুখে সারাদিন হাসি লাগিয়াই আছে—দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না। জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে তাহাও জানিত না। কিন্তু এখন সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গোলগাল মুখখানি শীর্ণ হইয়া একটু লম্বা হইয়া গিয়াছে। হাসিমাখা মুখখানি চিন্তান্বিত। চোখ দুটি দুঃখ-পূর্ণ—কেবল মাঝে মাঝে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় জ্বলিয়া ওঠে। ফ্যারিয়ার কাছে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া মুখে একটা প্রতিভার ছায়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানিতে এখনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আয়নায় চেহারাখানি দেখিয়া এডমণ্ড মনে মনে একটু হাসিল। তাহাকে কেহই চিনিতে পারিবে না—সে নিজেই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

নাপিতকে পয়সা দিয়া আর একটী দোকানে গিয়া একটী নাবিকদের পোষাক কিনিয়া পরিল। জ্যাকোনোর দেওয়া পোষাকটি ভাঁজ করিয়া লইয়া জাহাজে ফিরিয়া গেল।

জাহাজে এক মজা হইল। দিব্য ফিট্‌ফাট যুবকটিকে কেহই চিনিতে পারিল না। কেহই

বিশ্বাস করিল না—এই সে লম্বা চুলদাড়িওয়ালা নাবিক। তারপরে যখন সে জ্যাকোনোর পোষাকটি বাহির করিয়া দিল তখন তাহারা চিনিতে পারিল।

ক্যাপটেন এডমণ্ডের কাজে এত খুসী হইয়াছিলেন যে, তাহাকে এক বৎসরের জন্য কাজে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। এডমণ্ড কিন্তু তিন মাসের জন্য রাজী হইল। তাহার কি আর তখন চাকরী করিবার ইচ্ছা হয়—মাথায় ঘুরিতেছে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপ। কি করিয়া সেখানে গিয়া গুহার ভিতর থেকে সেই সম্পত্তি উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া কিছুই হইবার উপায় নাই। আপাততঃ অপেক্ষা করিতেই হইবে। মনকে বুঝাইল—"জেল থেকে পালাবার জন্য যদি চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা করে থাক্‌তে পেরে থাকি—মন্টি-ক্রীষ্টোদ্বীপে যাবার জন্য আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে পারিব।"

সে বেশ বুঝিতে পারিল জাহাজে যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছে তাহারা কি দরের লোক। তাহারা চোরাই মালের ব্যবসায় করে। জাহাজখানার নাম 'এমিলিয়া'। ক্যাপটেন একজন জেনোয়াবাসী—বেশ ওস্তাদলোক। প্রথমে এডমণ্ডকে মাল্টা সহর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঝালাইয়া লইল (এডমণ্ড নিজেকে মাল্টার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল)। কিন্তু এডমণ্ড আরও পাকাদরের ওস্তাদ। সে ঠকিবার পাত্র নয়, সমস্ত প্রশ্নেরই ঠিক জবাব দিল। তাহার কারণ সে যখন যেখানে যাইত সেখানকার যা কিছু জানিবার সব ভাল করিয়া জানিয়া লইত—অন্যান্য নাবিকদের মত আমোদ করিয়া সময় কাটাইত না। তাহার স্মরণ-শক্তিও ছিল খুব প্রখর—যাহা একবার শিখিত প্রায়ই তাহা ভুলিত না। এইগুণ তাহার ছিল বলিয়া ক্যাপটেনের চোখে ধূলা দিতে তাহার কষ্ট হইল না।

ক্যাপটেন দেখিলেন এডমণ্ড লোকটি বেশ। মনে মনে ভাবিলেন—"ও যা বলে তা যদি ঠিক নাও হয়—তবু কিছু ক্ষতি নেই। লোকটা নাবিকের কাজে বেশ ওস্তাদ। ওকে পেলে আমার ব্যবসার পক্ষে ভালই হবে।"

ক্যাপটেন ভাবিতে লাগিলেন এডমণ্ডকে কি করিয়া দলে টানা যায়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিমলেন্দ্র সরকার

ঘুঘ্নি দানা

—আমার নাম নাড়ু। আমি হিন্দু স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। এখানে দাদার কাছে থেকে পড়া শুনা করি। আমার বয়স দশ। শৈশবে আমি মাতৃ-পিতৃ-হীন হই। সংসারে আপন বলিতে এক দাদা বৌদি ও আর এক ভাইপো বই আর কেউ ছিল না।

ভাইপোর নাম খোকন্। খোকন এইবার আমাদের স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছে। তার বয়স সাত। সে যেন দাদা ও বৌদির নয়নের মণি। সুতরাং আমি তার উপর হাড়ে চটা ছিলাম।

এক দিন সে আমার উপর রাগ করে ইস্কুলে যায়নি। সেদিন বাড়ী এসে দেখি যে সে আমার সাধের ওয়াটারম্যান্ ফাউন্টেন পেন্‌টার দফারফা শেষ করে রেখেছেন। তাতেই শেষ হয়নি আবার আমার বাক্স খুলে আমার ভাল জামাটায় কালি লাগিয়ে দিয়েছে। দাদার ভয়ে এতদিন ওর গায়ে হাত তুলিনি, কিন্তু সেদিন কি হল। সেদিন দাদার ভয়টয় যেন খোলা কর্পূরের শিশির মত কোথায় উড়ে গেল যে তার খোঁজই পাওয়া গেল না।

তাকে ডেকে এনে বেশ কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল।

একথা দাদার কানে পৌঁছতে বেশী দেরী হল না। দাদা আমার খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

স্কুলের ছুটীর পর কিছুই খাওয়া হয় নাই, সুতরাং ক্ষিদের চোটে কোঁচায় আগুন ধরবার যো হয়েছিল।

যাহোক একটা কাজ করা গেল। আমার ঘরেই দাদার বইয়ের আলমারী, সেই অলমারী থেকে একটী ভাল বই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম্। দোকানে গিয়ে সেটাকে বিক্রি করে কিছু কিনে খাওয়া গেল। বাড়ীর দিকেই আস্‌ছি এমন সময় দেখি আমার সাম্‌নে দিয়ে এক ঘুঘ্‌নিওলা 'ঘুঘ্‌নি চাই, ঘুঘ্‌নি চাই' হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে মৃদু মন্দ গমনে পথ বাহিয়া চলিয়াছে। আমি তাকে ডাকিয়া দুই আনার ঘুঘ্‌নি কিনিয়া খাইলাম।

তারপর যাবে কোথা। বাড়ী পৌঁছতে না পৌঁছতে পেটকাম্‌ড়াতে আরম্ভ করল। বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ আমি চীৎকার করে উঠলাম্। বৌদি এসে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু একবার ভীষণ রকমের পেট কামড়ে উঠতে আমি 'ঘুঘ্‌নি, ঘুঘ্‌নি' 'বলে চেঁচিয়ে উঠলাম, তখন সবাই বুঝতে পেরে হাসতে লাগল। আমিও সুযোগ বুঝে চম্পট দিলাম।

শ্রীশুচীন্দ্রনাথ দত্ত

হরি ভট্‌চায

(গল্প)

গ্রামের প্রান্তে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। হরিদাস বড় গরিব মানুষ—এ বাড়ী সে বাড়ী পূজা ক'রে কোনরকমে দিন চালায়। কিন্তু হরিদাস একজন যে বড় পেটুক মানুষ তা গ্রামের সকলেই জান্‌ত। লোকের ক্রিয়াকাণ্ডে সে বিনা নিমন্ত্রণেই আগে হতেই আসর জমিয়ে বস্‌ত।

সে বছর বিষ্টুপুরের তারক চক্রবর্ত্তীর মা মারা যান। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামের মধ্যে একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক। মায়ের ক্রিয়াকাণ্ড একটুক ধুমধামেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরম্ভ করলেন। যথাসময়ে পঞ্চ-গ্রামে নিমন্ত্রণ হ'ল, এমন কি সেবার হরিদাস ভট্‌চাযও বাদ পড়ল না।

হরিদাসের নিমন্ত্রণের নাম শুনে মুখে আর আনন্দ ধরে না। গায়ে একখানি সাদা রঙের চাদর, গলায় মোটা একগোছা নূতন করকরে পৈতা, পায়ে একজোড়া তালি দেওয়া চটি, বগলে একটি ছাতা নিয়ে ভট্‌চায মহাশয় সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সেদিন ধূপ্যু রোদে বেরিয়ে পড়ল।

হরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হ'তে বিষ্টুপুর তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই তিন মাইল রাস্তার মাঝে একটা মস্তবড় শুক্‌নো ডাঙ্গা ছড়িয়ে আছে। ডাঙ্গাটি পার হ'লেই বিষ্টুপুরের তারক চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ছাদ দেখা যায়। বহু কষ্টে ভট্‌চায মশায় রোদে রোদে তিন মাইল পথ হেঁটে এসে সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই তারক চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর দ্বারে হাজির হ'ল।

রোদে রোদে হেঁটে এসে ভট্‌চাযের বড় খিদে পেয়েছিল। কতকক্ষণে খাবার ডাক হয় এই চিন্তায় হরিদাস ছট্‌ফট্ করতে লাগল। লুচির গন্ধে হরিদাসের জিভে জল ঝরতে আরম্ভ হ'ল। বহুকষ্টে হরিদাস কয়েকঘণ্টা জিভের জল সাম্‌লে থাক্‌ল। যথাসময়ে খাবার জায়গা হ'ল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজে এসে জোড়হাত করে সকলকে খাবার জন্য ডাক করলেন। খাবার নানা রূপ আয়োজন করার জন্য খাওয়া-দাওয়া হতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। সেদিন হরি ভট্‌চায নিজের ওজনের অতিরিক্ত ভোজন করলে। উপরন্তু ছান্দা নিল প্রায় দিস্তা দুই বড় বড় লুচি, আর সের খানেক বুঁদে।

হরিদাসের আনন্দের আজ সীমা নাই। রাতারাতিই বাড়ী ফিরে আস্‌ছে আর ভাবছে দু'দিন বেশ খাওয়া যাবে।

চারিদিকে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার ; রাস্তা ভাল করে মালুম হয় না। ভট্‌চায মশায় কিন্তু তা মান্‌লে না, বিষ্টুপুর ছাড়িয়ে রাতারাতি সেই ডাঙ্গার মাঝে এল।

বহুদিন হ'তে একটা ভূত সেই ডাঙ্গায় বাস করত। ভট্‌চায-এর কাছে গরম লুচি আছে জান্‌তে পেরে ভূতটার খাবার খুব ইচ্ছা হ'ল।

ডাঙ্গায় এসে ভট্‌চায-এর আর পা সরে না, গা যেন ছম্‌ছম্ করতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে ভট্‌চায দেখতে পেলে ডাঙ্গার মাঝে একটা মস্ত বড় তালগাছ, থেকে থেকে তালগাছের পাতা-

গুলা খড় খড় শব্দ করছে আর নাকি সুরে "আমি খাঁবু, আমি খাঁবু" বলে চীৎকার করছে। চীৎকার শুনে ভট্‌চাযের ত আক্কেল গুড়ুম্। বুঝি পথ হারালাম, এ ডাঙ্গায় ত কোন জন্মে গাছটাচ নাই এই না ভেবে ভট্‌চায মহাশয় পেছন ফিরে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। অমনি "আমি লুচি খাঁবু, লুচি খাঁবু" বলে লম্বা লম্বা দু'টো কাল সরু হাত ভট্‌চাযের কোলের দিকে দ্রুত আস্‌তে লাগল। তাই দেখে ভট্‌চাযের ভয়ে জান শুকিয়ে গেল, ভট্‌চায থতমত ক'রে পৈতাগাছটা কোন-রকমে আঙুলের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে দ্রুত রাম নাম জপতে সুরু ক'রে দিল। দেখো হরি, দেখো রাম যেন আমার গরম লুচিগুলার কোনরূপ বিপদ না হয় এই ব'লে ভট্‌চায নাক কান টিপে ফিস্ ফিস্ করে কত শত মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

এদিকে যেমন ফাঁক পেয়েছে অমনি ভূতটা তড়াক করে লুচিগুলা কেড়ে নিয়ে মুখে দেয় আর কি! সাত রাজার ধন পেটের মাণিক কেড়ে নিল দেখে ভট্‌চায ভয়ে রাগে কে তুই বলতে গিয়ে—বেরিয়ে গেল মুখ হ'তে "কেতুয়া" ভূতটার বড় ভয় হ'ল—ভাবল বুঝি এ সবজান্তা, নতুবা আমার নাম কেতুয়া তা কি করে জানলে বাবা! ভট্‌চাযের ধপ্‌ধপে সাদা পৈতা গাছটা দেখে ভূতটার আরও ভয় বেড়ে গেল।

পাছে মানুষের হাতে চুরির দায়ে ধরা পড়ে প্রাণ যায় ইত্যাদি সাত পাঁচ ভেবে ভূতটা জোড় হাত করে বললে—"ঠাকুর,দয়া করে এবার আমায় রক্ষা কর, আর কখনও এমন কাজ করব না, দোহাই ঠাকুর; আমার নাম আর কারও কাছে বলো না," তখন ভট্‌চায বললে—"তা হ'বে না। আমি সকলকে তোর নাম বলে দিব," ভূতটা বুঝল গতিক খারাপ, অগত্যা জোড়হাত ক'রে কাকুতি-মিনতি আরম্ভ ক'রে দিল। এদিকে ভট্‌চায তখন নাম পেয়ে তম্বি ক'রে বলে উঠল টাকা না দিলে বাবা ছাড়ছি না। তখন ভয়ে ভূতটা বললে, "তাই দিব ঠাকুর আজ ছেড়ে দিন।" ভট্‌চায বল্‌লে, "টাকা দে তবে ছেড়ে দিব।"

এ ভূতটা ছিল ভারি গরিব, টাকা পয়সা তার বেশী ছিল না। সে অন্য ভূতের দুয়ারে ধান ভেনে—কাজ করে খেত। কি করবে, কোথায় টাকা পাবে ভাবতে লাগল। তারপর "কেতুয়া" ভট্‌চাযের পায়ে ধরে বললে—"দোহাই ঠাকুর, আমি বড্ড গরিব, নগদ টাকা একটিও দিতে পারব না; আমি ধান দিয়ে তোমার টাকা শোধ করে দিব।" ভট্‌চায তাতেই রাজি হ'ল।

পৌষ মাস। চারিদিকে মাঠে মাঠে ধান পেকেছে, "কেতুয়া" সারা রাত হাতে করে পরের মাঠে মাঠে পাকা পাকা ধান দু'হাতে করে চুঁছে জড় করে—আর ভোর হ'তে না হ'তেই ভট্‌চাযের গোলায় দিয়ে আসে, এমনি ক'রে "কেতুয়া" ধান দিয়ে দিয়ে ভট্‌চাযের গোলা ভরতে লাগল।

কেতুয়ার এক মামা ছিল। সে ছিল বড় মাতব্বর গোছের, তার কথার সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। ভাগনের কয়দিন দেখা না পেয়ে, একদিন হঠাৎ "মামা" ভাগনের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। "মামা" ভাগনেকে দেখে বললে, "ভাগনে, তোমার শরীর এত রোগা হ'য়ে গেল কেন? অসুখ হ'য়ে ছিল নাকি।" তখন কেতুয়া বল্‌লে, "মামা গো মামা! আর দুঃখের কথা বলো না, এক ভট্‌চাযের ফাঁদে পড়ে মামা আমার প্রাণ গেল! হরি ভট্‌চাযের গোলায় দিন দিন ধান দিয়ে আসতে হয়, তাই সারারাত পরের মাঠে মাঠে ধান চুঁছে চুঁছে হাতের এই

দশা! শরীরের এই দশা মামা! বাঁচাও মামা আর পারি না!"

অমনি মামা টকাস্ করে বলে উঠল এর জন্যে আর ভাবনা কি ভাগনে। আমি ভট্চাযকে বেশ করে জব্দ করে দিচ্ছি। ভাগনে ভূতটা বললে,—"না মামা, অমন কাজ কখনো করো না। সে আমার নাম জানে। তার গলায় একটা কি সাদা ধপধপে ঝোলে, ওটার চাবুক খেলে কিন্তু আর রক্ষা নাই। হেই মামা অমন কাজ করোনা, কেন তোমাকেও আবার আমার মত ফাঁদে ফেলে।"

মামা একটুক গোঁপে চাড়া দিয়ে গুরুগম্ভীর ভাবে বলে উঠল, "কুছ পরয়া নাই ভাগনে, আমার সঙ্গে চালাকি করা সোজা ব্যাপার নয়। চল্ আমাকে ভট্চাযের ঘরটা দেখিয়ে দে। আমি তাকে শিখিয়ে দিচ্ছি আমার ভাগনেকে ঠকান কত মজা।" কেতুয়া মামার কথায় সাহস পেয়ে হরি ভট্চাযের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

ভট্চাযের বাড়ীর পেছনে একটা বহুদিনের পুরোনো তেঁতুল গাছে কেতুয়ার মামা একদিন রাত্রে লুকিয়ে রইল। আর মাঝে মাঝে আড়ি পেতে দেখতে লাগল কতক্ষণে ভট্চায ঘুমোয়।

ভট্চায মহাশয়ের একটা লেজ কাটা ষাঁড় ছিল। লেজ ছিল না ব'লে ভট্চায ষাঁড়টাকে আদর করে "বাঁড়ুয়া" "বাড়ুয়া" বলে ডাক্ত। বাঁড়ুয়া সারাদিন মাঠে ঘাটে চরত আর রাত হ'লেই ভট্চায তাকে খামারে বেঁধে রাখত। আবার ভোর হ'লেই খুলে দিত।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বাঁড়ুয়াকে দেখতে না পেয়ে ভট্চায হালের মোটা দড়াটা হাতে করে "বাঁড়ুয়া" "বাঁড়ুয়া" বলে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এদিকে এক ভারি মজা হ'ল। তেঁতুল গাছে যে কেতুয়ার মামা বসে ছিল তার নাম ছিল "বাঁড়ুয়া মাতব্বর"। সে তখন ভাবল এবার বুঝি ভাগনের কথা না শুনে আস্ত কাঁচা প্রাণটা যায়! যে রকম দড়া নিয়ে ভট্চায বাঁধতে আস্ছে আর রক্ষা নাই। তারপর ভট্চায বাঁড়ুয়া ষাঁড়টাকে খুঁজতে যেমন তেঁতুল তলায় এসে বাঁড়ুয়া বাঁড়ুয়া বলে ডাক দিল—অমনি বাঁড়ুয়া ভূতটা আমায় বাঁধতে এ'ল এই না ভেবে ধপাস্ করে ভট্চাযের পায়ের কাছে এসে পড়ল। ভট্চায ত ভয়ে কাঠ! এ আবার কে রে বাবা এত রেতে! ভট্চায মনে সাহস করে বলে উঠল, তুই আবার এখানে কে রে? তখন বাঁড়ুয়া ভূতটা নাকি সুরে কেঁপে কেঁপে বল্লে—"দোহাই ঠাকুর, এবার আমায় মাপ কর। আমি কেতুয়ার মামা। আমার নাম আর কারও কাছে রটিয়ে দিও না ঠাকুর! আমি আর কখনও এমন কাজ করব না। ভট্চায বললে, "সে হবে না। বেটা আমার চোখ এড়িয়ে যাবি কোথা! আমি তোকে আজ বেঁধে নিয়ে যাব।" বাঁড়ুয়া ভূতটা ত ভয়ে অস্থির হ'য়ে কাপড়ে, চোপড়ে হেগে মুতে ফেল্লে। হে ঠাকুর রক্ষা কর; যা চাইবে তাই দিব, আমায় এ'বার ছেড়ে দাও! ভট্চায মনে মনে ভাবল ভালরে ভাল, এত ভারি মজা—সেদিন এক বেটার কাছ হতে খামখা ধান আদায় করেছি, দেখি আজ এ'বেটার কাছে একটুক মোটা রকম কিছু মাথায় হাত বুলিয়ে আদায় করতে পারি কি না।

এই না ভেবে ভট্চায ফস্ করে বলে বস্ল দেখ, তুই যদি রেতের মধ্যেই চারতালা বাড়ী, গোয়াল ভরা গরু, সিন্দুক-ভরা টাকা, পুকুর ভরা মাছ আর গোলা ভরা ধান দিস্ তবে তোকে ছেড়ে দিব নতুবা তোর আজ আর নিস্তার নাই। কি করে বাঁড়ুয়া ভূত বেচারা তাতেই রাজি হ'ল।

বর্ণের কথা

তোমরা সকলেই বোধ হয় রামধনু দেখেছ। বহুক্ষণ বৃষ্টিপাতের পর আকাশে রামধনু ফুটে উঠে তার অপূর্ব্ব বর্ণ-সম্ভার নিয়ে। রামধনুর এই ক্ষণিক বিকাশে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাতে সকলের চিত্তই মোহিত হয়। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ রামধনুদর্শনে আত্মহারা হয়ে লিখেছেন,—"রামধনু হেরি আকাশের বুকে আমার হৃদয় নাচে।" রামধনুর এই নয়নভোলানো রূপের উদ্ভব যে তার সাতটী পাকা রং থেকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভায়লেট, ইণ্ডিগো, নীল, সবুজ, হলদে কমলা ও লাল রং রামধনুর আভরণ। প্রকৃতিদেবী একে সাজিয়ে তুলতে আপনার সকল রংই উজাড় করে দিয়ে দিয়েছেন।

কৃত্রিম রামধনু ও বর্ণচ্ছত্র

রামধনুতে যে বর্ণগুলো দেখা যায়, তা আমরা ইচ্ছা করলে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে পারি। একটি তে-শিরে কাচের ভেতর দিয়ে যদি তির্য্যক্‌ভাবে কিছু আলো পাঠান যায়, তাহলে ঐ আলো কাচ থেকে যখন বেরোয় তখন আর আগের মত সাদা থাকে না; সাতটী বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঝাড় লণ্ঠনে নানা প্রকার তে-শিরে কাচ থাকে তার একটী চোখের সাম্‌নে ধরে রোদে দাঁড়িয়ে দেখো, আশে পাশের সকল জিনিষই রামধনুর সাতটী বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে; কিম্বা কাঁচটী শুধু রোদে ধরো, তাহলে দেখতে পাবে কিছুদূরে একটা স্থানে রামধনুর সাতটী বর্ণ পাশা পাশি বিরাজ করছে, কিন্তু ঠিক রামধনুর আকারে নয়,—বর্ণগুলি এখানে লঘু। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আলোর বিশ্লেষণের দ্বারা যে সাতটী বর্ণ পাওয়া যায় তাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন বর্ণচ্ছত্র (Spectrum). বস্তুতঃ রামধনুর বর্ণ সপ্তকের সৃষ্টি হয় ঐ একই নিয়মে। তোমরা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করেছ বৃষ্টিপাতের সময় কিম্বা তার কিছু পরেই রামধনুর উদয় হয়। কেন তা জান? বহুক্ষণ বৃষ্টিপাতের পর বাতাসের স্তরে স্তরে জলকণিকায় ভর্ত্তি হয়ে থাকে। সূর্য্যালোক যখন এই জলকণিকার ভিতর দিয়ে গমন করবার প্রয়াস পায়, তখন জলকণা তে-শিরে কাচের মত তাকে সাতটী রঙে বিশিষ্ট করে ফেলে। অতি অল্প আয়াসেই জলের দ্বারা আমরাও সাতটি রং সৃষ্টি করতে পারি। মুখের ভিতর খানিকটা জল নিয়ে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে যদি তা খুব বেগে ছড়িয়ে ফেলা যায় তাহলে মুহূর্ত্তে শূন্যের জলভূমির উপর বিদ্যুৎ-বিকাশের মত রামধনুর ছায়াপাত হয়। এইরূপ ব্যাপার সমুদ্রযাত্রীদের চোখে প্রায়ই পড়ে। বায়ু তাড়িত হয়ে যখন কোন প্রবল ঢেউ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন যে রামধনুর সৃষ্টি হয়, তা কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় ও আকাশের রামধনুর মত স্পষ্ট। নাবিকেরা এইজন্য এই বর্ণচ্ছত্রের নাম রেখেছে সামুদ্রিক রামধনু।

আদি ও মিশ্রিতবর্ণ

রামধনুর সাতটী বর্ণ ভিন্ন গাছপাতা, ফল-মূলের এত বিভিন্ন বর্ণ আছে যে, তাদের নাম

করণ করাই দুরূহ। বর্ণগুলির কোনটী গাঢ়, কোনটী ফিকে, কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী অনুজ্জ্বল, তা ছাড়া মিশ্রিত ও অমিশ্রিত বর্ণও আছে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন এই হাজার রকমের বর্ণগুলির মধ্যে কতকগুলি মাত্র আদি রং আর সবগুলির উদ্ভব ঘটে এই আদি বর্ণগুলির মধ্যে নানা প্রকার মিশ্রণের ফলে। আদিরং কাকে বলে তা তোমাদের বলা দরকার। যে রংগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যায় না তাদের বলা হয় আদিরং। যেমন লালকে যতই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হোক না কেন, লালের কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; কিন্তু ভায়লেটকে অল্প আয়াসেই লাল ও নীলে বিশ্লিষ্ট করা চলে। সুতরাং এক্ষেত্রে লাল আদিরং, আর ভায়লেট মিশ্রিত। মনোবিদ্-বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, লাল, নীল, সবুজ ও হলদে রংগুলিই মাত্র আদি, আর সবই মিশ্রিত। কিন্তু এবিষয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতামত বিভিন্ন। চিত্রকরেরা তিনটী মাত্র বর্ণের সাহায্যে সকল বর্ণের সৃষ্টি করে থাকেন।

বর্ণমিশ্রণ

এই বর্ণমিশ্রণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক্ নিউটন্। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সুধীসমাজে আদি ও মিশ্রিত বর্ণের কথা প্রচার করেন। পূর্ব্বোক্ত তে-শিরে কাচের সাহায্যে সাদা আলোর বিশ্লেষণের ব্যাপারটা তাঁরই আবিষ্কার। তিনি একদিন একখানি বহু কোণ বিশিষ্ট কাচ ঘোরাতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, এব্যাপারে সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি করে। এই ঘটনা থেকে তাঁর বিশ্বাস হয় সাদার উৎপত্তি হয় সাতটী রংয়ের মিশ্রণের ফলে। এই ধারণার সত্যতা নিরূপণের জন্য তিনি নানা প্রকার বর্ণমিশ্রণের পরীক্ষা করেন। একটী চাক্তির উপর বর্ণচ্ছত্রের সাতটী রং যথাযোগ্য পরিমাণে সাজিয়ে তিনি যন্ত্রের সাহায্যে জোরে ঘুরিয়ে দেখেন, সকল বর্ণই মিলিয়ে গিয়ে চাক্তিটী ছেয়েরঙে দাঁড়ায় —একেবারে সাদা হয় না। চাক্তির রং কেন একেবারে সাদা হয় না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, বর্ণচ্ছত্রে যে প্রকৃতির এবং যে পরিমাণের রং থাকে কৃত্রিম উপায়ে ঠিক সেই প্রকৃতির ও সেই পরিমাণের রং পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই চাক্তির রং শাদা না হয়ে মেটে হয়। চরকার টেকোতে একটী চাক্তি বসিয়ে তোমরা নিজেরাই এ পরীক্ষা করে দেখতে পার।

পূরক রং

চাক্তির সাহায্যে এইভাবে বর্ণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি আরও কতকগুলি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার লক্ষ্য করেন। আদি বর্ণগুলির প্রত্যেক দুইটীর মধ্যে একটী মজার সম্বন্ধ আছে। যেমন লাল ও সবুজের মধ্যে অথবা নীল ও হল্‌দের মধ্যে। সম্বন্ধটী কিরূপ এইবার তা' বলি। এই দুই জোড়া রংয়ের যে কোন একটীকে যদি চাক্তিতে বসিয়ে ঘোরান যায়, তাহলে সাতটীরং মেশালে যেমন মেটে রং পাওয়া যায়, চাক্তির রং তেম্‌নি ধারা মেটে হয়। কিন্তু একজোড়ার একটীর সাথে যদি আর জোড়ার একটীর মেশান যায়, তাহলে মেটে হয় না, দুইটী রংয়ের মাঝামাঝি একটী রং পাওয়া যায় এজন্য নিউটন এই রংগুলির নাম দিয়েছেন পূরক রং অর্থাৎ কোনবর্ণই নিজে পূর্ণ নয় প্রত্যেকেই অপরকে পূরণ করে। আবার কেহ কেহ এদের নামে প্রতিদ্বন্দ্বী রং রাখতে চান। কারণ মিশ্রণের সময় পরস্পরের মধ্যে যেন একটী দ্বন্দ্ব বাধে তার

ফলেই উভয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ণদ্বয়কে কেউ যদি না মিশিয়ে পাশাপাশি বসায় তাহলে প্রত্যেক বর্ণই অপরকে উজ্জ্বলতর ও স্পষ্ট করে তোলে। তোমরা নিজেরাই এটী পরীক্ষা করে দেখতে পার। লালের পাশে যদি সবুজ বসান যায় তাহলে উভয়েই যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, লালের পাশে নীল কিম্বা হল্‌দে রাখলে ততটী হবে না।

প্রতিচ্ছায়া ও তার উৎপত্তির কারণ

পূরক রং সম্বন্ধে আরও একটী কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার আছে। একখণ্ড লাল কাগজের উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখ। তারপর দৃষ্টি না সরিয়ে আস্তে আস্তে লাল কাগজখানিকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেল, তুমি সবিস্ময়ে দেখবে লালের স্থানে তার পূরক রং সবুজ বিরাজ করছে, এই ব্যাপারকে বলা হয় প্রতিচ্ছায়া। প্রতিচ্ছায়ার আকার প্রথমে লাল কাগজের অনুরূপই হবে, কিন্তু পরে ছোট কিম্বা বড় হতে পারে। প্রতিচ্ছায়া কিছুক্ষণ ধরে বরাবরই দেখা যায় না। একবার আসে আবার যায়, একবার আসে আবার যায়, এম্‌নিভাবে অবশেষে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। প্রতিচ্ছায়ার উদ্ভব কেন হয় তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছেন। এখানে শরীর তত্ত্ববিদদের একটী মত প্রকাশ করছি। তোমরা সকলেই বোধ হয় ফটো তুল্‌বার ক্যামেরা দেখেছ। ক্যামেরার ভিতর একটী প্লেট থাকে, তার উপর বাইরের জিনিষের ছাপ পড়ে। এই ছাপ থেকেই ছবি তোলা হয়। মানুষের চোখের মধ্যেও ক্যামেরার প্লেটের অনুরূপ একটী প্লেট আছে,যাকে বলা হয় রেটিনা। এই রেটিনায় ছাপ পড়লেই আমরা দেখতে পাই। এখন ক্যামেরার প্লেটে একবার ছাপ পড়লে তা' নষ্ট হয়ে যায়, পুনরায় তা' দিয়ে ছবি তোলা যায় না। সুতরাং নতুন প্লেটের দরকার।

চোখের ব্যাপারও ঠিক তাই। কিন্তু চোখের জীবন্ত প্লেটের কোন পরিবর্ত্তনের দরকার হয় না, কারণ তার উপরকার ছাপ আপনা থেকে মুছে যাবার ব্যবস্থা আছে। কি ভাবে রেটিনার ছাপ মোছে তা' এবার বল্‌ছি। রেটিনায় যে রংয়ের উত্তেজনায় ছাপ পড়ে তার বিপরীত রংয়ের উত্তেজনা তাকে নষ্ট করবার জন্যে চোখের মধ্যেই সৃষ্টি হয়। যেমন চোখে যদি লাল রংয়ের ছাপ পড়ে তাহলে তাকে দূর করবার জন্যে রেটিনায় আপনা থেকেই সবুজ জিনিষের সৃষ্টি হয়। বিপরীত উত্তেজনা থেকেই প্রতিচ্ছায়ার উদ্ভব।

আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি, যখন কোন বিশেষ বর্ণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখন সেবর্ণ আর চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারের মূলেও ঐ একই কারণ বিদ্যমান। মনে কর আমার চশমাটী সবুজ। প্রথম যখন চশমাটী পরি তখন চশমার রংয়ের জন্য সমস্ত জিনিষই সবুজ দেখি, কিন্তু কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হওয়ার পর আর সবুজ দেখি না। এর কারণ চশমার রংয়ের ছাপ অবিরত পড়ায়, এর বিপরীত বর্ণের উত্তেজনাও রেটিনায় অবিরত সৃষ্টি হতে থাকে। তার ফলে চশমার রংয়ের ছাপ কখনও স্পষ্ট হতে পারে না। কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর আলোকিত স্থানে গেলে যে তা বেশী উজ্জ্বল দেখায় কিম্বা তীব্র আলোক থেকে স্বল্প আলোকময় স্থানে এলে যে তা বেশী অন্ধকার বলে মনে হয় তার কারণও এই।

বর্ণান্ধতা

আরও একটি মজার কথা বলি—শুধু দৃষ্টিশক্তি থাক্‌লেই রং দেখা যায় না। রং দেখবার আলাদা যন্ত্র আমাদের চোখের মধ্যেই আছে। মাঝে মাঝে এমন লোক দেখা যায় যাদের দৃষ্টি-শক্তির প্রখরতা সত্ত্বেও তারা বিশেষ বর্ণ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ। এই শ্রেণীর লোককে রংকাণা বলা হয়। রংকাণারা সাধারণতঃ সবুজ ও লালের তফাৎ বুঝতে পারে না। একটী আমগাছে যদি সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র পাকা সিঁদুরে আম থাকে তা রংকাণাদের চোখে ধরা পড়বে না। সমস্ত আমগাছটীকে তারা স্পষ্টই দেখতে পাবে, কিন্তু দূর থেকে পাতা আর আমের মধ্যে তাদের প্রভেদ করাই মুস্কিল। এই রংকাণাদের সম্বন্ধে কিছুকাল আগে মানুষ একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল। একবার একটী ট্রেণ দুর্ঘটনা থেকে এর আবিষ্কার হয়। গার্ড বিপদের সম্ভাবনা থাকায় লাল নিশান দেখায়, কিন্তু ড্রাইভার রংকাণা থাকায় সে সঙ্কেত বুঝতে পারে না। তার ফলে দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। এই ব্যাপার থেকে অনুসন্ধান সুরু হয় এবং বর্ণান্ধতার কথা অতি সহজেই আবিষ্কৃত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা তত্ত্বানুসন্ধান করে দেখেছেন, ইউরোপে শতকরা ৩ জন রংকাণা।

বর্ণান্ধতার কারণ

এই বর্ণান্ধতার কারণ কি তা' স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। তবে কারো কারো বিশ্বাস, আমাদের চোখের মধ্যে তিনটী যন্ত্র আছে। তার প্রথমটীর জন্য আমরা দেখতে পাই সাদা ও কালো, দ্বিতীয়টীর জন্য হল্‌দে ও নীল আর তৃতীয়টীর জন্য লাল ও সবুজ। এই তিনটী যন্ত্রই একই সময় উদ্ভূত হয় না। যদি কোনক্রমে ঐ তিনটী যন্ত্রের মধ্যে একটীর উদ্ভব না হয় তাহলে মানুষ রংকাণা হয়। দ্বিতীয় যন্ত্র যার নাই সে লাল ও সবুজের মধ্যে তফাৎ বুঝে না, আর তৃতীয় যন্ত্রের অভাবে মানুষ লাল ও সবুজ সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ হয়। এটা হ'ল হেরিংয়ের মত। হেল্‌মহোলজ নামক আর একজন বৈজ্ঞানিক আবার অন্য মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "মানুষের রেটিনায় তিনটী যন্ত্র আছে। তার প্রথমটী উত্তেজিত হ'লে আমরা দেখি লাল, দ্বিতীয়টী উত্তেজিত হ'লে সবুজ, আর তৃতীয়টী উত্তেজিত হ'লে ভায়লেট। যখন তিনটী যন্ত্রই সমভাবে উত্তেজিত হয় তখন আমরা দেখি সাদা। যদি উত্তেজনার একেবারেই অভাব ঘটে তা' হ'লে দেখি কালো। আর তিনটী যন্ত্র যখন সমভাবে উত্তেজিত না হয় তখন আমরা দেখি অন্যান্য রং।" এই মতের দ্বারা তিনি বর্ণান্ধতার কারণ নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, "যারা রংকাণা তাদের লাল ও সবুজের যন্ত্র থাকে না, কিম্বা যদি থাকে তাহলে এতটা অপুষ্ট যে, তার দ্বারা কোন কাজই চলে না।" কিন্তু এই মত বর্ত্তমানে কেউ আর স্বীকার করতে চান না। কারণ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নয়। এমতের দুএকটা ত্রুটীর কথা এখানে উল্লেখ করছি। হেলম্‌হোলজ বলেন, "তিনটী যন্ত্র যখন সমভাবে উত্তেজিত হয় তখন আমরা সাদা দেখি, অথচ প্রত্যেক রংকাণাই সাদা দেখতে পায়।" কিন্তু হেলম্‌-হোলজের মতানুসারে তাদের সাদা দেখা সম্ভব নয়। কারণ তিনটী যন্ত্রের মধ্যে দুইটী যন্ত্রই তাদের নেই। তাছাড়া এমতের আরও একটী ত্রুটী আছে। হেলম্‌হোলজ বলেন, "চোখে কোন প্রকার উত্তেজনা না পেলেই আমরা কালো

দেখি।” এ মত যদি সত্য না হয় তাহলে সমস্ত প্রকার কালো একইরূপ হবে, কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। অন্ধকারের কালো, ফাউণ্টেন পেনের কালো রং, কালো টেবিল, কালো জামা প্রভৃতির বর্ণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাছাড়া চোখ বুজলে, চোখে যখন কোন প্রকার উত্তেজনা না আসে তখন আমরা যা দেখি তাকে কালো বলা চলে না—অনেকটা ধূসর বর্ণের ন্যায়।

পুরকিন্‌জীর ঘটনা

বর্ণ সম্বন্ধে আরও একটা কথা ব'লে এবার প্রবন্ধের শেষ করব। তোমরা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছ দেওয়ালে যে সমস্ত নানা বর্ণের চিত্রিত ছবি থাকে, সেগুলোর বর্ণ গোধূলির ছায়া পাতে অদ্ভুত পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠে। প্রথমে সমস্ত রংগুলোই ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু ক্রমশঃ অন্ধকারের মাত্রা যখন কিছু বেশী হয় তখন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। লাল রংটা প্রথমে মেটে হয়, তার পর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। নীলরংটা যদিও হাল্‌কা হয়ে আসে তবুও এর রং ঠিক থাকে। কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্ত্তন হয় হল্‌দে ও সবুজের। দিবালোকে হল্‌দে হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল রং আর সবুজ কতকটা অনুজ্জ্বল রং। কিন্তু গোধূলিতে উল্টা ব্যবস্থা দেখা যায়—হল্‌দের উজ্জ্বলতা যেন স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে সবুজের উপর। এই ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক পুরকিন্‌জী লক্ষ্য করেন, তাই একে বলা হয় পুরকিন্‌জীর ঘটনা। এ ব্যাপারের পরীক্ষা তোমরা নিজেরাই করতে পার। যদি তোমরা কতকগুলি নানা রংয়ের পেন্সিল বা মোম বাতি নিয়ে অল্প অন্ধকারময় ঘরে গিয়ে দেখ, তা হ'লে এ ব্যাপার অনায়াসেই দেখতে পাবে। কিন্তু মনে রেখো পেন্সিল কিম্বা মোম্ বাতির রংয়ের ঔজ্জ্বল্য বা গাঢ়তা যেন এইরূপ হয় নচেৎ কিছুই দেখা যাবে না।

এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেন মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর চোখের রেটিনায় রড ও কোণ নামক তুইটি পদার্থ আছে। কোণএর সাহায্যে আমরা দিনের বেলায় দেখতে পাই, আর রডের সাহায্যে রাত্তিরে। নিশাচর প্রাণীরা যে রাত্তিরে ভাল ভাবে দেখতে পায় তার কারণ তাদের চোখে এই রডের পরিমাণ খুব বেশী। মানুষের মধ্যে যারা রাতকাণা তাদের চোখে রডের নিতান্ত অভাব আছে দেখা যায়। জীবজন্তু কিংবা মানুষ যদি আঁধারে থাকে, তাহলে এই রড-গুলোর উপর এক রকম লাল জিনিষ জন্মায়, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় Visual Purple. বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করে দেখেছেন,সবুজের দ্বারা এই রং সহজেই নষ্ট হয়; সুতরাং তাঁদের বিশ্বাস পুরকিন্‌জীর ঘটনার সবুজের ঔজ্জ্বল্যের সহিত এ ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এবার এখানেই প্রবন্ধের শেষ করা গেল। বারান্তরে এসম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসা

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন আমি ছোট ছেলে। মাত্র এগার কি বার বছর বয়স। এত ছোট সময়ের কথা বড় বয়সে কারও মনে থাকে কি না জানি না; আমারও সেই সময়ের অন্যান্য ঘটনাগুলি হয়ত কিছুই মনে নাই। কিন্তু আজ যে কথাটি বলিতে চাই—তার কথা একটুও ভোলা থাক্—ঠিক সেই দিনের মতই আজও স্পষ্ট; যেন সকল ঘটনাগুলি চোখের সাম্‌নে ছবির মত জ্বল্ জ্বল্ করে উঠছে। কত বছর অতীত হয়েছে, কত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কিছুই সে বাল্যের ব্যথার স্মৃতিটুকু মন হ'তে ধুয়ে মুছে দিতে পারে নাই। সেই স্মৃতির বেদনাই এখন আমাকে সুখী করে, সান্ত্বনা দেয়। আজ সেই কথাই বলবো।

শীতের শেষে সেবার আমার বড় অসুখ করেছিল। মার কাছে শুনেছি বাঁচবার না কি কোন আশাই ছিল না। কিন্তু যখন বেঁচে উঠলাম তখন মরারই মত। দেহে এমন একটু শক্তি নাই যে, হাত পাগুলিও নাড়তে পারি। সেই সময় মা-ই ছিলেন আমার একমাত্র আশ্রয়। মা যে দিনরাত কেমন করে বুকে নিয়ে বাঁচিয়েছেন, আবার এই দুর্ব্বল শরীরে শক্তি দিয়েছেন তা কি বলতে পারি!

দিন যায়, দিন যায়; ক্রমে আমার শরীর একটু একটু ভাল হ'তে থাকে। ক্রমে উঠে বসবার শক্তি হলো। একদিন মায়ের হাতে ভর রেখে দু'চার পা চলতে পারলাম। এমনি করে ভাল হ'তে থাকি। বাড়ীর ডাক্তারবাবু এবার একটু ভাল যায়গায় যেতে বললেন; তাতে আমার শরীরের শীঘ্র উন্নতি হবে।

আমার মামার এক বাড়ী ছিল মানভূম জেলার এক গ্রামে। তাঁর সেখানে বেশ বড় ব্যবসা ছিল। মামা বাবাকে বলিলেন—এখন ত সে বাড়ীতে কেউই নাই। অথচ জলবায়ুও বেশ ভাল। সেখানেই কিছুদিন থাকলে বোধ হয় ভাল হয়।

সেই গ্রামে যাওয়াই স্থির। একদিন আমরা —বাবা, মা, আর আমি—সেখানে চলিলাম। গ্রামে মামার বাড়ীতে চাকর দরোয়ান সবই আছে। ষ্টেশনে নেমেই আমার খুব স্ফূর্ত্তি হলো। পাহাড় আমি কখনও দেখিনি। এই গ্রামটির চারিদিকেই পাহাড়। আবার আমাদের বাড়ীটি একটি নদীর উপরেই। বাড়ীর সকল দিকেই পাহাড়। কোনটি ছোট, কোনটি বড়। এখানে এসে আর সকাল বেলায় মাকে ঘুম ভাঙাতে হতো না। সূর্য্যোদয় দেখবার জন্য আমি নিজেই খুব ভোরে উঠে পড়তাম। বাড়ীর চারিদিকে বড় বাগান। নানা রকমের ফল, ফুল, পাতাবাহারের গাছ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাল কাঁকরের পথ। আর সব সবুজ ঘাসে ঢাকা। স্থানে স্থানে এক একটি কুঞ্জের মত, আবার কত স্থানে ছোট ছোট বেদী। এদের একটি স্থান আমার বড় প্রিয় ছিল। একটি নিম গাছ, তার চারিদিক ঘিরে অনেকখানি স্থান নিয়ে লাল রংয়ের বেদী। গাছের ঠিক লাগা পূর্ব্ব দিকে মুখ করা আবার একটি বেদী। এই স্থানটিতে মা বাবা আমায়

নিয়ে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় বসে উপাসনা করতেন। আমি সেই অতি ভোরে উঠে সেই ছোট বেদীতে এসে বসতাম। সেই সাম্‌নের পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে চুপি চুপি যখন চারিদিকে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড লাল আগুনের গোলার মত ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠতো তখন যে আমার মনের ভাব কি হতো তা আমি বলতে পারি না। কি সুন্দর সে দৃশ্য!

বাড়ী এবং বাগানের মধ্যে ছিল আমার অবাধগতি। কিন্তু সকল সময়েই আমার সঙ্গে বাড়ীর হিন্দুস্থানী দরোয়ান থাকতো। ভাঙা বাংলা আর ভাঙা হিন্দী মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় সে কত কথাই বলতো।

নদীতে তখন জল ছিল না। সাদা বালি ধূ ধূ করচে। বাগানের বাহিরে নদীর উপর সেই সাদা বালিতে বেড়াতে, খেলা করতে, সম্ভব হলে দৌড় ঝাঁপ দিতে একটা আকুল আগ্রহ ছিল। কিন্তু মা বাবা দরোয়ানকে নাকি একেবারে নিষেধ করে দিয়েছেন বাহিরে যেতে। বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে যখনই আমি তাকে ঐ কথা জানাতাম তখনই সে তার গোল গোল চোখ দুটি কপালে উঠিয়ে বলতো—"উটি হোবে নেহি খোকা বাবু। হাম তা পারবে না।"

একটু দূরেই নদীর ঠিক উপরেই যে একটি পাহাড় সে আমায় মুগ্ধ করেচে। রোজই যখন তখন সে আমায় ডাকে। ঠিক যেন ঢেউ খেলা তার স্তরগুলি। এক একটি বড় ঢেউ যেন উপরে উঠেছে। কত গাছ তার উপর। আর দেখতে কি সুন্দর! তার কাছে যেতে ও তাকে স্পর্শ করতে আমার মন ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। একদিন অনেক বলে কয়ে, অনেক হাত পা নেড়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম বাবা বা মা তাকে কিছুই বলবেন না। আর সন্ধ্যার ঠিক আগেই আমরা ফিরে আসবো। সে ত কিছুতেই বুঝবে না। শেষে জোর করে আমি নিজেই ফটকের বার হলাম দেখে সেও আমার পিছু পিছু চল্‌লো।

আঁকা বাঁকা, উঁচু নীচু পথ। ছোট ছোট নালা; ছোট ছোট কত পাথর। চলতে চলতে পায়ে কত লাগে। তবুও মনে কি আনন্দ! আজ বাড়ীর বাহিরে এসেছি। আজ নদীর বালির উপর খেলবো। যে আমায় রোজ ডাকে সেই পাহাড়টির কাছে আজ চলেছি।

এক রকম ছুটতে ছুটতেই সেই পাহাড়টির কাছে এলাম। কত ছোট ছোট গাছ। অনেক খানি এসেছি; হাঁপিয়ে পড়লাম। একটু বড় পাথরের উপর বসে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট গাছের ডালগুলি একটু একটু কাটতে আরম্ভ করলাম। এমন সময় দেখি—আমাদের ঠিক নীচেই—আমারই মত একটি ছেলে পাথর নিয়ে খেলা করছে আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। বোধ হয় ওরই দাদা। ছুরিটা আমার হাত হ'তে পড়ে গেল। ঐ পড়ার শব্দে সে ফিরে দেখতেই আমার সঙ্গে দেখা হলো। আমায় দেখেই একটু হেসে ফেল্‌লে। মনে হলো তার বুঝি আনন্দ হয়েছে আমার ছুরিটী পড়ে যাওয়ায়। ছুরি নেবার জন্য নামতে যাচ্ছি, সে ছুটে এসে ছুরি কুড়িয়ে নিয়ে, আমার কাছে উপরে এলো। তেমনি হাসতে হাসতেই সে বললে, "এই নাও ভাই—তোমায় আর নামতে হ'বে না।"

ভাবলাম—না, তা' হলে সেত দুষ্টামি করে হাসে নাই। ছুরিটি নিয়ে আবার সেইখানে বসে পড়লাম। সে তখনও হাসচে। তার মুখটাই

যেন হাসিমাখা। হাসতে হাসতেই বল্‌লে— "তোমরা বুঝি এ বাড়ীটাতে এসেছ ভাই ?"

আমি বল্‌লাম "হাঁ ভাই। তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক !"

সে দূরে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লে, "ঐ—দেখ, ঐ সাদা বাড়ীটা।"

"ওঃ, ওত আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই।"

এতক্ষণে সে আমার পাশটিতে বসে পড়েছে। আমার হাতটি তার নিজের হাতে নিয়ে বল্‌লে— "তোমার নাম কি ভাই ?"

আমি বল্‌লাম—"নির্ম্মল।"

সে খুব হেসে—আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বললে, "বা রে, বেশ হয়েছে ! আমার নামও যে তাই।"

আমি হেসে বল্‌লাম—"ভারি সুন্দর হয়েছে কিন্তু।"

মাথা নেড়ে হেলে দুলে সে বল্‌লে—"এক কাজ করবি ভাই ?"

"কি ?"

"এখানের ছেলেরা যার সঙ্গে আলাপ হয় তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ করে। যেমন ফুল, বন্ধু এমনি কত কি, আর ঐ বলেই ডাকে। আমাদেরও একটা অমনি করবি ?"

আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল। হেসে বল্‌লাম, "বেশ ত ভাই ! বল্‌না তবে আমরা আজ হ'তে কি হবো !"

"দূর বোকা, তুই কিছুই জানিস্ না ! হবো আবার কি ? ভাই হবো ! তবে ডাকবো কি বলে বল্ ?"

"হাঁ—তাই—"

"দেখ ভাই এই পাহাড়টাকে আমি খুব ভালবাসি !"

তার কথা শেষ হ'তে না দিয়েই আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, "আমিও ভাই খু—ব ভালবাসি।"

"তবে আর কি, ঠিক ত মিলে যাচ্ছে। আমি এর নাম দিয়েছি ভালবাসা। আর এরই উপর যখন আমাদের প্রথম দেখা—তখন আমরাও ভালবাসা ; কেমন ?"

"হাঁ ভাই হাঁ, বেশ সুন্দর হয়েছে ভালবাসা।"

"মা আমাদের ভালবাসেন, আমাদের চুমো খান, বাবা দাদা সব্বাই ভালবাসেন—আর চুমো খান। আর আমরাও যখন ভালবাসি তখন চুমা খেয়েই আমাদের সম্বন্ধ হোক,—কি বল্ ভাই !"

ওঃ, সে আনন্দ আজও আমার বুককে ঠিক সেই দিনটির মতই আনন্দে দোলা দিচ্ছে। সেই মুহূর্ত্তের স্মৃতিটুকু, সেই স্মৃতির আনন্দভরা ব্যথাটুকু আজও মনের মাঝে তেমনি গাঁথা আছে। মুহূর্ত্তেই সে যে আমায় কত আপন করে নিয়েছিল ! তখন সন্ধ্যা হয় হয় ! পশ্চিমের দিকে এক পাহাড়ের চূড়ার কোণে সূর্য্য যেন চুরি করে আমাদের এই মিলন দেখে নিলে ! বসন্তের স্নিগ্ধ মধুর বাতাস এসে আমাদের মাতিয়ে দিলে ! ওপরের নীল আকাশে ভেসে যাওয়া সাদা সাদা মেঘগুলো ক্ষণিক থেমে আমাদের মিলন-আনন্দের পরশ নিয়ে চলে গেল। সেই মিলনের সাক্ষী সূর্য্য, মেঘ, বাতাস আর এই ভালবাসা।

"চল্ না ভাই নীচে যাই। ঐ দেখ, আমার দাদা।"

"চল্ যাই—।"

দাদার কাছে এসে সে বল্‌লে—"দেখ না দাদা, কে এসেছে ?"

দাদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কে রে—?"

"তুমিই বল না ওর নাম কি ?"

"তা কি আর আমি জানি ?"

"কেন—তুমি বুঝি আমার নাম জান না ?"

"তা আর কি করে জানি বল্, পাহাড় হতে আর একটি খাঁদীকে ধরে আনবি ?"

সে যে খাঁদা ছিল তা নয়। তবে তার ডাক নাম ছিল ঐ। কিন্তু সেটা তার পছন্দ হতো না। সে বল্‌লে, "দূর, আমার নাম বুঝি খাঁদী ?"

"তবে কি রে ?"

"কেন নির্ম্মলকুমার !"

সে এমন গম্ভীর হ'য়ে তার নাম বলেছিল যে, আমার বেশ মনে আছে দাদা হো হো ক'রে হেসে তাকে কোলে টেনে নিলেন, আর ছু' হাতে তার সেই সুন্দর মুখটি ধরে কত চুমাই না খেয়েছিলেন।

দাদার চুমা হ'তে নিজকে মুক্ত করে বল্‌লে, "ওর সঙ্গে কি পাতিয়েছি জান দাদা ?"

এইত ক' মিনিটই বা তোদের দেখা হলো রে !"

"তাতে কি দাদা ? আমিত ঐ পাহাড়টিকে দেখেই ভাল বেসেছিলাম। হ'বার হ'লে দেখেই ভালবাসা হয় !"

"তা' বটে রে, তবে ওই বুঝি তোর ভালবাসা ?"

সে আমায় বল্‌লে, "দেখলি ভাই ভালবাসা, আমার দাদার কি বুদ্ধি !"

দাদা আমায়ও তাঁর কোলে নিলেন। কত আদর করলেন—কত চুমা খেলেন।

দরোয়ান এতক্ষণ কোথায় কি জানি কি করছিল। সন্ধ্যা হ'তে দেখে—এসে যাবার তাগিদ করলে। নির্ম্মল তাকে বল্‌লে—"আরে যাওনা তোম্। ও আমার সঙ্গে যাবে।"

দরোয়ান তাকে বোঝাতে আরম্ভ করলে যে, সন্ধ্যার পর আমি বাড়ী গেলে তার বাবু তার উপর রাগ করবেন। দাদাও বল্‌লেন, "হাঁ, সন্ধ্যে হয়েছে। এবার যাওয়া যাক্।

"সকলে উঠলাম। দাদা আমায় বললেন—"তোমার ত এখন বাড়ী যাওয়া হ'বে না। কিছু সম্বন্ধ হ'লেই যে খেয়ে যেতে হয়।"

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বল্‌লে—"বেশ বলেছ দাদা। আজ আর যেতে পাবে না।"

আমি বললাম, "মা বাবা যে কত ভাববেন দাদা।"

দাদা ডান হাতে আমায় ও বাঁ হাতে নির্ম্মলকে ধরে যাচ্ছিলেন। আমার হাতটি নাড়া দিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ গো সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হ'বে না,—সে ব্যবস্থা আমি করবো।"

নির্ম্মলের কথা ত আর শেষ হয় না। একটু পরেই আমরা তাদের বাড়ী পোঁছলাম। সে ত দাদার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বাড়ীর ভিতর গেল। শুনতে পেলাম সে চীৎকার করে বলছে "মা—মা, দেখ কে এসেছে।"

মা যেন বল্‌লেন—"কে রে ?"

নির্ম্মল মাকে ধরে আনছিল। আমরাও গিয়ে পড়লাম। মা শিখিয়েছিলেন সাধু লোক, এবং যাঁরা আপনার লোক তাঁদের প্রণাম কর্‌তে হয়। নির্ম্মলের মা ত এখন আমার আপনার এই মনে করে প্রণাম কর্‌তে যাব এমন সময় মা বুকে তুলে নিলেন। বললেন, "করিস কি রে, করিস কি—" তারপর যা হ'লো তা আমিই জানি। মায়ের সেই চুমার সহিত আশীর্ব্বাদগুলি এখনও স্পষ্ট মনে আছে। এমনি ভাবে নির্ম্মলের বাবাও কত আদর করলেন।

একটু পরেই দেখি মা ও বাবা এসেছেন।

সকলেরই সে রাত্রি কি আনন্দ! সকলেই সেদিন কত আদর, কত সোহাগ করেছিলেন।

এরপর হ'তে কি দিন আর কি রাত্রি আমরা ছু'জনে ছু'জনের প্রায় সঙ্গ ছাড়া হই নি। ছু' বাড়ীর মধ্যে যেখানে খাবার সময় হ'তো খেতাম আর রাত্রি হ'লে ঘুমাতাম। খুব কম রাত্রিই আমরা আলাদা শুয়েছি। যেদিন এরকম হ'তো সেদিন আমার ভাল ঘুম হ'তো না; এবং বোধ হয় তারও এই অবস্থা হ'তো। অতি ভোরেই সে আমার ঘুম ভাঙাতো, আর ছু' জনে বাগানে নেমে সেই গাছের নীচে বসতাম। বসে বসে একটি গান গাইতাম; তখন তার মানে জানতাম না। সেই গানটি—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

ক্রমে নির্ম্মলও শিখেছিল। তারপর হ'তেই ছু' জনে একই সাথে গাইতাম।

এক দিন নির্ম্মল বললে—"আর ভাল লাগ্‌ছে না ভাই! একটা কিছু খেলা আনা যাক্।"

"কি খেলা আনবি?"

দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হ'লো ব্যাডমিণ্টন্ আনা হবে। সেই দিনই চিঠি লিখে দেওয়া হলো। সব আসার পরই খেলা আরম্ভ হ'লো। দাদা আমাদের খেলা শেখালেন। মাঝে মাঝে এক দিকে তিনি একা, আর অপর দিকে আমরা ছু' জনে খেলতাম। কি আনন্দই না হতো তাতে!

এক দিন অতি ভোরে নির্ম্মল এসে খুব হাঁক ডাক লাগিয়ে দিয়েছে। গায়ের মোটা চাদরখানা টেনে নিয়ে বললে—"বুড়ো খোকা, এখনও ঘুম হচ্চে?"

আমি ধীরে ধীরে হাসতে হাসতে বললাম, "আজ আমি বেড়াতে পারবো না ভাই!"

তার বোধ হয় কথা শুনে একটু ভয় হলো। গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে, "তোর জ্বর হয়েছে বুঝি?"

"হাঁ।"

সেদিন ত সে বাড়ী গেলই না। ছু'তিন দিন পর—আমরা এক সঙ্গেই তাদের বাড়ী গেলাম। এ ক'দিন সে আমার কাছছাড়া হয় নি। মা তাকে জোর করেই চান করিয়ে খাইয়ে দিতেন; আর রাত্রে ঘুম পাড়াতেন।

কি ভাবে যে আমাদের দিন কাট্‌ছিল তা আর কি বলবো! কিন্তু শীঘ্রই সে দিনের শেষ হয়ে এলো। একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে আসতে আসতে সে বল্‌লে—"দেখ ভাই, হাত পাগুলো কেমন বেদনা করছে।"

আমারও জ্বর হবার সময় ঐ রকম হয়েছিল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। বল্‌লাম, "তবে জ্বর হবে নাকি?"

আমার ভয় দেখে সে একটু হেসে বললে, "দূর বোকা, তাই নাকি আবার হয়! আজ একটু বেশী খেলা হয়েছে কি না তাই বোধ হয় এমন লাগছে।"

আমার কিন্তু ভয় গেল না। মনের ভিতর কি হ'তে লাগলো বুঝতে পারলাম না। সে রাত্রে সে কিছুতেই তাদের বাড়ী থাকতে দিল না। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন—"তোর কি হয়েছে রে; মুখ এত শুকিয়ে গেল কেন?"

বল্‌লাম—"মা, ভালবাসার বোধ হয় জ্বর হবে। আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

মা বললেন—"তাতে আর ভয়ের কি আছে? ছু'দিনেই সেরে যাবে।"

রাত্রিটা কোন রকমে কাটল। ভোরেই গিয়ে-দেখি যা ভয় করেছিলাম তাই। নির্ম্মল লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে কাঁপছে; চোখ মুখ লাল। মা মাথার কাছে বসে আছেন। দাদা ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আমি এসেছি জেনে নির্ম্মল একবার কষ্টে চোখ খুলে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সেই সদাহাস্য মুখেও আজ সে সুন্দর হাসি নিমিষেই মিলিয়ে গেল। আমি তার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

একটু পরেই পাশের গ্রামের ডাক্তার দেখতে এলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বাহিরে গিয়ে দাদা ও জ্যাঠামশাইএর (নির্ম্মলের বাবা) সঙ্গে ইংরাজীতে কি বললেন। আমাদের কাছে কিছু না ব'লে বাহিরে বলাতেই আমার ভয়টা যেন আরো বেড়ে গেল।

অসুখ ক্রমেই কঠিন আকার ধারণ করলে। জ্বর ত প্রায় কমতই না। প্রায় ১০।১৫ দিন পরে নির্ম্মল ভুল বকতে লাগলো। তার পর ক্রমেই আর কাহাকেও চিনতে পারতো না। একুশ দিনের দিন সকাল হতেই তার ভাব পরিবর্ত্তন হ'লো। নিৰ্জ্জীবের মত সে শুয়েছিল। আমার যেন মনে হলো সে আজ মারা যাবে। এ ক'দিন তার কাছ ছাড়া হইনি; কিন্তু আজ আর থাকতে পারলাম না। একটু বেলা হতেই উঠে বাড়ী চলে এলাম। মা বাবা ত আগেই জানতেন, দিনের অধিকাংশ সময় ঐ বাড়ীতেই থাকতেন। আজ হঠাৎ আমি চলে আসায় মা জিজ্ঞাসা করলেন—"চলে এলি যে বাবা" দেখলাম মার চোখ ছল্ ছল্ করছে। আমি কিছু উত্তর দিতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম। মা আমাকে বুকে তুলে নিলেন। তাঁর বুকে মাথা রেখে আমি কত যে কেঁদেছিলাম, আজ আর তা মনে নাই। মা আমায় কিছু সান্ত্বনা দেন নাই। তাঁর চোখেও জল!

দিনের আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ শরীর ছেড়ে গেল। তাদের বাড়ী হতে কান্নার শব্দ পাই নাই। আমি কিছুই জানতাম না। সমস্ত দিন কিছু খাইও নাই। সন্ধ্যার সময় বাবা একবার আমাদের বাড়ী এলেন। যে ঘরে আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম সেখানে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই মা কেঁদে ফেলে ছিলেন, কিন্তু কোন কথা বলেন নাই। তাঁর সেই ভাব দেখেই ভয়ে আমার জ্ঞান লোপ হলো। যখন চোখ মেলেছিলাম তখন সকাল হয়ে গেছে।

তিন দিন চলে গেল। এ ক'দিন আর তাদের বাড়ী যাই নি। বেড়াতেও বের হই নি। আজ নির্ম্মলের মা, বাবা আর দাদা কলকাতা ফিরবেন। মা একবার এসে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। তখন দরোয়ানকে কাছে রেখে মা আর বাবা তাদের বাড়ী গেলেন।

কিছু পরে তাঁরা বাড়ী ছেড়ে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলেন। আমি আমাদের উপরের বারাণ্ডায় এসে এমন ভাবে বসলাম যেন তাঁরা দেখতে না পান। তাঁদের মুখের ভাব আর কি বলবো। আজও যে আমি সে দৃশ্য ভুলতে পারি নাই! ক্রমে ক্রমে তাঁরা চোখের আড়াল হলেন। ভালবাসা-পাহাড়টির দিকে চোখ পড়তেই সেই প্রথম মিলনের স্থানটি দেখতে পেলাম। সেইখানেই তার শরীরের শেষ কাজ করা হয়েছিল। এখনো দু' একটা আধ-পোড়া কাঠ, হাঁড়ি ইত্যাদি পড়ে আছে। চোখের জল আর বাধা মানল না। ছুটে এসে ঘরে বিছানায় মুখ চেপে শুলাম।

তারপর হ'তে অনেক বৎসর কেটে গেছে।

পাহাড়ের সেই স্থানটিতে একটি ছোট শ্বেত পাথরের মন্দির করেছি। সে ফুল বড় ভালবাসতো। তাই তার চারিধারে ভাল ভাল ফুলের ছোট একটি বাগান। সে যে বাড়ী ভাড়া করে ছিল এখন সেখানি কিনে নিয়েছি। প্রতি বৎসর ঠিক সেই সময় ঐ বাড়ীতে গিয়ে থাকি; আর তার মৃত্যু তারিখের তিনদিন পরে চলে আসি। প্রথম প্রথম খুব কাঁদতাম আর সেই ছোট মন্দির-টিতে বসে যত ফুলের মালা সাজিয়ে দিতাম তার চারিপাশে ততই চোখের জল গড়িয়ে পড়তো, এখন আর কান্না আসে না। মনে অনেকটা আশা জেগেছে। বিশ্বাস হয়েছে—জানতে পেরেছি—ভালবাসা অমর আর মানুষও অমর। যে যারে ভালবাসে এখানে মরবার পর আবার তাদের মিলন হয়; সে মিলনের আর শেষ নাই। এই আশা নিয়েই সেই দিনের প্রতীক্ষা করছি।

গত কার্ত্তিক মাসের মুকুলে তোমরা একটি মেয়ের পিতৃভক্তির কথা পড়িয়াছ। সে তাহার বাবাকে খুব ভালবাসিত। তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। বাবার জেল হইয়াছে শুনিয়া সে আত্মহত্যা করে।

ঘটনাটি সত্য। সে তাহার বাবাকে এত যে ভালবাসিত তাহাও প্রশংসার বিষয়। সকলেরই পিতামাতাকে এইরূপ ভালবাসা উচিত। কিন্তু তাহার আত্মহত্যা করা ভাল হয় নাই। আত্ম-হত্যা মহাপাপ। তাহার উপর সে সকল ঘটনা ভাল ভাবে না জানিয়াই ঐরূপ করিয়াছিল। তাহাও অন্যায়। মানুষকে স্থিরচিত্ত হইতে হয়। তাহার এই চঞ্চলতা এবং ঐ আত্মহত্যা অতিদোষের হইয়াছে। ঐ দোষ ছাড়িয়া তোমরা তাহার গুণের অনুকরণ করিও।

শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু

জ্যৈষ্ঠের মজা

আজকে প্রাতে সবার সাথে
আয়রে ছুটে বাহিরে;
জ্যৈষ্ঠ মাসের এমন দিনে
চোখেতে ঘুম নাহিরে।
আমের গায়ে রং ধরেছে,
জাম লিচুরা সাজ পরেছে,
ফলের ভারে বৃক্ষ নত।
ছোট্‌রে আজি বাহিরে।

পাকা ফলের আশায় আশায়
জোট্‌রে আজি ছেলেরা;
তোদের তরেই শাখায় ডালে
ঝুল্‌ছে কাঁঠাল বেলেরা।

ঝড়ের দিনে দুপুর বেলা
আয়রে যদি কর্‌বি খেলা,
আমবাগানের গাছের তলে
জোট্‌রে ওরে ছেলেরা।

ভোরের বাতাস ফলের সুবাস
আজকে বহি আনি রে
কিসের আশার বার্ত্তা নিয়ে
করচে কানা কানি রে!
পাকা আমের গন্ধে ভরা
বাগানেতে আয়রে ত্বরা
পড়া শুনা সকল ফেলে,
শাসন নাহি মানিরে।

শ্রীরথীন্দ্র দত্ত

২য় বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৬ [১০ম সংখ্যা

দুই বন্ধু

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাল্যবন্ধু' নামক গল্প, তাঁহার অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে ও বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।]

নবম পরিচ্ছেদ

বিষম পরীক্ষা

ইহার কিছুদিন পরেই নলিন লক্ষ্য করিল, বড়বাবু তাহার প্রতি পূর্ব্বের মত আর সদয় ব্যবহার করেন না। একটু ছুতা পাইলেই নলিনকে কড়া কড়া শুনাইয়া দেন। নলিনের কোন কাজই তাঁহার পছন্দ হয় না। নলিনের কাজে সামান্য একটু ভুলচুক হইলেই বড়বাবু তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাবু, এ রকম করলে কিন্তু তোমার দ্বারায় এ আপিসের কাজ হবে না।"

এইরূপে খিটিমিটি প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিল।

সোমবার দিন নলিনের একজন সহকর্ম্মী বিনোদবাবু নলিনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনার প্রতি বড়বাবু অসন্তোষের কারণটা টের পেয়েছি।"

নলিন বলিল, "কি বলুন দেখি?"

"আপনি কি বন্দীপুরের ভুবনেশ্বরবাবুকে চেনেন?"

"খুব চিনি।"

"তিনি কবে এসেছিলেন?"

"এই সম্প্রতি এসেছিলেন। এক সপ্তাহ হ'ল ফিরে গেছেন।"

"তিনি আমাদের বড়বাবুর একজন বন্ধু, তা জানেন?"

"জানিনে আবার? তিনিই ত বড়বাবুকে ধরে আমার চাকরি করিয়েছিলেন।"

"জানেন যদি, তবে এমন কাজ কেন কল্লেন?"

নলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি করেছি?"

"কি করেছেন, ভেবে দেখুন। তাঁর কাছে আপনি বড়বাবুর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন—তাইতেই আগুন লেগে গেছে।"

নলিন অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি কি বলেছি?"

"আপনি নাকি বলেছেন, বড়বাবু বদ্ধ মাতাল, ওষুধের মার্কামারা শিশি করে আপিসে ব্রাণ্ডি নিয়ে আসেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই ব্রাণ্ডি খান। পরশু সন্ধ্যাবেলায় ওঁর বাড়ীতে আমরা 'শনিবার করতে' গিয়েছিলাম, উনি ঐ সব কথা বল্লেন।"

কলিকাতার অনেক টাকাওয়ালা লোক শনিবার সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-প্রামোদে লিপ্ত হন। অনেক স্থানেই মদ্যপান হয়। রবিবার আপিস নাই বলিয়া শনিবার এ সকল করিবার সুবিধা হয়। ইহারই নাম 'শনিবার করা।' নলিনের স্মরণ হইল, যেদিন সে ভুবনবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, সে দিন ঔষধের শিশির কথা হইয়াছিল বটে। তবে সে বড়বাবুকে মাতালও বলে নাই, তাঁহার কোনরূপ নিন্দাও করে নাই। সেই কথা নলিন বিনোদ-বাবুকে বলিল।

বিনোদবাবু বলিলেন, "ঐ ত! মুখে মুখে কথা বেড়ে যায় কি না। আচ্ছা আমি বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলব এখন। আর আপনার উচিত নলিনবাবু, মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ীতে যাওয়া, ওঁর একটু খোসামোদ করা। দেখছেন না, আজকাল খোসা-মোদেরই বাজার। আমরা ত প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে 'শনিবার করতে' যাই—আপনি যান না কেন?"

নলিন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনারা মোটা মোটা মাইনে পান, আপনাদের 'শনিবার করা' পোষায়। আমি গরীব মানুষ, আপনাদের দলে পড়ে যদি 'শনিবার করতে' শিখি, তা হলে আমার দুর্গতিটা কি হবে বলুন দেখি? পেটেই খেতে কুলায় না, ত 'শনিবার কর্‌রি' কোত্থেকে বলুন?

বিনোদবাবু বলিলেন—"তা যাবেন। মদে আপনার আপত্তি থাকে, নাই বা খেলেন। বস্‌বেন—গল্পগুজব করবেন—চলে আসবেন।"

ইহার পরের শনিবার নলিন বিনোদবাবুর সঙ্গে বড়বাবুর সান্ধ্য-সমিতিতে উপস্থিত হইল। অপর সকলেই সুরাপানে রত হইলেন—নলিনই কেবল বসিয়া রহিল। মদ খাইবার জন্য কেহ কেহ নলিনকে সাধ্য-সাধনা করিল, স্বয়ং বড়বাবুও দুই একবার বলিলেন, কিন্তু নলিন সম্মত হইল না। এখন তাহার পানস্পৃহা ত নাই-ই, বরং মদ্যের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছে। তথাপি কি করিবে, চাক্‌রীর খাতিরে পরে পরে আরও দুই শনিবার গিয়া বসিয়া রহিল।

এ কয়দিন বড়বাবু নলিনের প্রতি একটু প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সোমবার হইতে আবার তিনি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। নলিন ইহার কারণ কিছুই বুঝিল না। মঙ্গলবার দিন বিনোদ বাবু নলিনকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার কি বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নেই? এই কত কষ্টে বড়বাবুর মন পেলেন,—আবার সব বিগড়ে দিলেন?"

নলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কি করেছি?"

আপনি নাকি কার কাছে বলেছেন, "শনিবার রাত্রে বড়বাবু মদ খেয়ে ধেই ধেই করে নাচেন। আরও নাকি কি সব বলেছেন?"

অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া নলিন বলিল, "কৈ এমন কথা আমি ত কাউকেই বলিনি।"

"ভুবনবাবুর কাছে?"

"বিলক্ষণ! তিনি ত প্রায় মাসখানেক হ'ল কলকাতা ছাড়া।"

বড়বাবু কারু নাম করলেন না। শুধু

বল্লেন, একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছেন। আর বল্লেন, "আমাদের আপিসে ও রকম বেহ্ম-টেহ্ম নিয়ে চল্‌বে না। আচ্ছা নলিনবাবু, আপনি সত্যি ব্রাহ্ম না কি?"

নলিন বলিল, "না মশাই, আমি ত ব্রাহ্ম নই।"

"তবে এক কাজ করুন। এখন, বড়বাবুকে আপনার দেখান্‌ দরকার যে, আপনি আমাদেরই একজন।"

"কি করলে দেখান যায়?"

"আপনি আমাদের সঙ্গে বসে বসে দুই এক গ্লাস মদ খেলেই, অনায়াসে আপনার ব্রাহ্ম বদনাম ঘুচে যায়।"

নলিন করযোড়ে বলিল, "মাফ করবেন মশাই—সেটি আমি পারব না। আপনি বড়-বাবুকে বুঝিয়ে বল্‌বেন, আমি কারু কাছে তাঁর নামে কোনও নিন্দা বা কুৎসা করিনি—করবও না।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "আমি ত বলব, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করলে হয়।"

পরের শনিবারে নলিন মোটেই আর বড়বাবুর বাড়ী গেল না। সোমবারে বিনোদবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরশু রাত্রে আপনি যান নি যে?"

"গেলেই নানা কথা ওঠে, তাই যাই নি।"

"না গিয়ে ভারি অন্যায় করেছেন। বড়বাবু কি বলেছেন জানেন?"

"কি?"

"বলেছেন, তবে নিশ্চয়ই সে আমাদের নামে ঐ সব অপবাদ রটিয়েছে—এখন ধরা পড়ে গেছে—কোন্‌ মুখে আর আসবে? আরও বলেছেন, আপনার সম্বন্ধে বাৎসরিক রিপোর্ট লেখবার সময় আপনাকে কর্ম্মে অপটু বলে লিখে দেবেন।"

শুনিয়া নলিনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কোথায় সে আশা করিতেছিল, এবার বেতন পঞ্চাশ টাকা হইবে, পনেরো টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা মাসে তাহার দশটি টাকা অধিক থাকিবে—সংসার একটু সচ্ছল হইবে, হঠাৎ এ কি বিপদ! তাও অন্য সময় নহে, বড়-বাবু যে দিন রিপোর্ট লিখবেন ঠিক তাহার দুইটি দিন আগে! চাক্‌রী গেলে কি উপায় হইবে? আর একমাস পরে ত বাড়ীটিও ছাড়িতে হইবে। দাঁড়াইবে কোথায়, খাইবে কি? দুই দিন নলিনের বিষম উদ্বেগে কাটিল। তৃতীয় দিনে জল খাবার ঘরে বিনোদবাবু চুপি চুপি নলিনকে বলিলেন, "আজ বড়বাবু আপনার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখেছেন। আজ পাঁচটার পর আপনি একটু থাকবেন। উনি বাড়ী চলে গেলে ফাইলটা বের করে দেখতে হবে কি লিখলেন।"

নলিন পাঁচটার পরেও বিলম্ব করিতে লাগিল। বড়বাবু যথাসময়ে চলিয়া গেলেন। আপিসের অন্যান্য বাবুরাও একে একে অদৃশ্য হইলেন। বিনোদবাবু তখন ডেস্ক হইতে রিপোর্ট বাহির করিলেন। দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে "নলিন কার্য্যে অপটু, বৎসরান্তে তাহাকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।"

পড়িয়া নলিন চারিদিক অন্ধকার দেখিল। মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বিনোদবাবু অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আজ সন্ধ্যাবেলা বড়বাবুর বাড়ী আমি যাব এখন। আর একবার তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে দেখি।"

"আমিও যাব কি?"

"কি জানি কি রকম মেজাজে থাকবেন তা ত বলতে পারিনে, আর আজ আপনার গিয়ে কাজ নেই। যদি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেন কাল নিয়ে যাব।"

"বড়বাবু কি বলেন তা আমি কি করে জানতে পারব? বলেন ত রাত্রে আপনার বাড়ীতে আসি।"

"তা আস্‌বেন—রাত ন'টার সময় আসবেন। তার মধ্যেই আমি ওর ওখান থেকে ফিরে আসব"

নলিন মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বাড়ী গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষায় অটল

কয়েক দিন হইতেই হেমাঙ্গিনী লক্ষ্য করিতেছিল যেন স্বামীর মনে কোন দুর্ভাবনা রহিয়াছে। গত পরিচ্ছেদে বিপিনবাবুর সহিত যে কথাবার্ত্তার বর্ণনা হইয়াছে তাহার পর নলিন যখন বাড়ী আসিল, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

"বলব এখন"—বলিয়া হাত মুখ ধুইয়া নলিন ছেলে পড়াইতে চলিয়া গেল। সেখান হইতে একটু শীঘ্র বিদায় লইয়া, রাত্রি আটটার সময়ই বিনোদবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিনোদবাবু বড়বাবুর কাছে নলিনের প্রতি দয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন তখনও তিনি ফিরেন নাই।

নলিন কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর বিনোদ বাবু ফিরিলেন। উৎকণ্ঠিত হইয়া নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

বিনোদবাবু ম্লান মুখে বলিলেন, "বড় সুবিধে নয়।"

"তবু?"

"তিনি বল্লেন, নলিন আমাদের যে রকম অপমান করেছে, তাতে কোনও মতেই ওকে আর আফিসে রাখা যায় না। আমি তখন ওঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলাম। অনেক বলতে কইতে শেষে বল্লেন, আচ্ছা ও যদি কাল এসে আমাদের সঙ্গে দুই এক পাত্র মদ খায়, তা হলেই জানব যে, ও আমাদের ঘৃণা করে না। তা হলে ঐ রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে অন্য রিপোর্ট লিখব। আমি অনেক করে বল্লাম, যখন খাবে না বলে ওর প্রতিজ্ঞা, তখন ঐ নিয়ে কেন গরীবের অন্নটি মারছেন? বড়বাবু বল্লেন—কেন ও খাবে না-ই বা কেন? আমি কি ওর আগের কথা সব জানিনে? ভুবনের কাছেই ত শুনেছি। এক সময়ে কত পিপে পিপে মদ পার করেছে, আর এখন আমাদের অনুরোধে একটি গেলাস খেতে পারে না? বড়বাবু একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছেন।"

নলিন মাথায় হাত দিয়া, নীরবে বসিয়া আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদবাবু বলিতে লাগিলেন, "কি করবেন বলুন, চোখ কান বুজে খেয়ে ফেলুন। একবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলেই যে আপনি একেবারে জাহান্নমে যাবেন, তা ত নয়। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই বড়বাবুকে বলে এসেছি, আচ্ছা সে খাবে, কিন্তু একটি দিন মাত্র। তাও সকলের সাম্‌নে নয়—আমরা এই তিন জন মাত্র থাক্‌ব। শুধু আপনার মান রক্ষা করবার জন্যে। আপনি যে বলবেন ফি শনিবারে এসে আমাদের সঙ্গে খাবে, তা হবে না কিন্তু। বড়বাবু তাইতে রাজি হয়েছেন। বলেছেন, কালকে রিপোর্টখানা বড়সাহেবের কাছে পাঠাবেন না। কেমন নলিন-

বাবু আপনি রাজি ত?" নলিনের গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কষ্টে বলিল, "কাল আফিসে বলব।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ করে ভেবে দেখুন। আপনিও এই জেদ ছাড়ুন। একদিন একটু মদ খেলেই যদি চাক্‌রীটি বজায় থাকে—তা হলে খাওয়াই উচিত। কাল সন্ধ্যে বেলা আসবেন এখন, দুজনে এক সঙ্গে বড়বাবুর ওখানে যাওয়া যাবে।"

বিনোদবাবুর নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া, আহারাদি কোনও মতে শেষ করিয়া নলিন শয্যায় প্রবেশ করিল। অন্যদিন সে সারাদিন পরিশ্রমের পর বিছানায় পড়িবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। আজ আর তাহা হইল না। আজ সে বিষম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। মদ্য স্পর্শ করিবে না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে, না চাক্‌রী রক্ষা করিবে? চাক্‌রীটি যদি যায় তবে উপায় কি হইবে? নলিন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, যে দিন এ বাড়ীতে বাসের অনুমতির এক বৎসর পূর্ণ হইবে, তাহার চারি দিন পরেই তাহার চাক্‌রী শেষ হইবে। বিপদের উপর বিপদ। এই দুই বিপদের পশ্চাতে না জানি আরও কত বিপদ লুক্কায়িত আছে। হায়, নলিন কি করিবে? কেনই বা ভুবনবাবুর সাক্ষাতে ঔষধের শিশির গল্প করিয়াছিল। যাক্‌, সে কথা আর ভাবিয়া কি হইবে? ভুবনবাবুও কলিকাতায় নাই যে, তাঁহাকে দিয়া বড়বাবুর কাছে একটু দয়ার জন্য অনুরোধ করাইবে। এবার তিন মাসের পূর্ব্বে তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে চিঠি লিখিবার বা টেলিগ্রাম করিবার সময়ও নাই। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বড়বাবু অপেক্ষা করিয়া পরশ্ব রিপোর্ট পাঠাইবেন। পাঠাইলেই বড় সাহেব তাহাতে সহি করিয়া দিবেন। বস্‌, আর কোন উপায় থাকিবে না। তাহার পর গৃহ নাই—অন্ন নাই! অন্য কোনও আফিসে যে কর্ম্মের চেষ্টা করিবে, তাহারও উপায় নাই, কারণ ইহারা নলিনকে সার্টিফিকেট দিবে না। যদি বা দেয় তাহাতে লিখিয়া দিবে—"কার্য্যে অপটু বলিয়া বৎসরান্তে পদচ্যুত করা গেল।" সে সার্টিফিকেট কোথাও দেখাইয়া ফল কি?

নলিন বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অকূল পাথার চিন্তা করিতে লাগিল। একবার নিম্নে উঠান হইতে বাসন মাজার শব্দ নলিনের কর্ণে আসিল। আজ হেমাঙ্গিনী স্বয়ং বাসন মাজিতেছে—কারণ ঝির জ্বর হইয়াছে। এই পৌষমাসের শীত, রাত্রে হেমাঙ্গিনীকে স্বহস্তে বাসন মাজিতে হইতেছে। অথচ এমন দিন ছিল যখন বাড়ীতে এত ঝি চাকর থাকিত যে, একটা কেন, দুইটা ঝির এক সঙ্গে পীড়া হইলেও বাড়ীর মেয়েদের বাসন মাজিতে হইত না। সঙ্গে সঙ্গে নলিনের ইহাও মনে হইল, বাসনও আর বেশী দিন মাজিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। যখন ঘর থাকিবে না, পথে পথে ভিক্ষা করিতে হইবে তখন বাসনও থাকিবে না, বাসনে করিয়া কিছু খাইবারও থাকিবে না। নলিনের চোখের সাম্‌নে যেন একখানি ছবি ভাসিয়া উঠিল,—নলিন আগে আগে মেয়েটির হাত ধরিয়া, হেমাঙ্গিনী পাছে পাছে ছেলেটিকে কোলে করিয়া, কলিকাতার পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। যেন শ্যামবাজারে বড়বাবুর দ্বারেই ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নলিনের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ কাটিলে গৃহকার্য্য শেষ করিয়া হেমাঙ্গিনী শয়নগৃহে আসিল। শয্যা-

পার্শ্বে আসিয়া নলিনকে জাগরিত দেখিয়া বলিল, "তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

অশ্রুসিক্ত স্বরে নলিন বলিল, "না।"

ক্রমে হেমাঙ্গিনীকে সকল কথাই সে খুলিয়া বলিল। একবার দু' এক পাত্র মদ খাইলে চাকরী থাকিবে নতুবা চাক্‌রী যাইবে, তাহাও বলিল।

নলিনের কথা শেষ হইলে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "তুমি কি স্থির করেছ?"

"আমি ত কিছুই স্থির করিতে পার্‌চি না। ক'দিন থেকে ক্রমাগত ভাবছি, ভেবে কিছুই কূলকিনারা পাচ্ছি নে। তুমি কি বল?"

হেমাঙ্গিনী বলিতে লাগিল—"আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তোমায় ধর্ম্মপথে থাকিতেই পরামর্শ দেব—অধর্ম্ম পথে যেতে কখনই বলব না। দেখ, অনেক কষ্টে তুমি সাম্‌লে উঠেছ। আবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর—তবে আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে না।"

নলিন বলিল, "তা কি আমি জানি নে? তা খুবই জানি। আমার মন যে কত দুর্ব্বল, তা আমিই জানি। কিন্তু আমি কেবল তোমাদেরই কথা ভাবচি। আমি যদি একা হতাম—তাহ'লে আমি নির্ভয়ে বলতাম, এমন চাক্‌রী যায় যাক, আমি মদ কিছুতেই খাব না। আমার আবার অন্য কোনও উপায় হবে। কিন্তু তোমাদেরই জন্যে ভেবে আমার মন অস্থির হচ্চে। বাড়ীখানাও যাবে, তখন তুমি কোথায় দাঁড়াবে?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "তুমি কিছু ভেব না। সে উপায় ভগবান করবেন। তোমার কাজ তুমি কর—তুমি ধর্ম্মপথে থাক—তাঁর কাজ তিনি করবেন।"

"তোমার মনে কি কিছু ভাবনা হচ্ছে না?"

"কিছু না। তিলমাত্র না। যিনি সকল জীবকে আহার দিচ্ছেন, তিনি আমাদের অনাহারে মার্‌বেন না।"

"এ তোমার দৃঢ় বিশ্বাস?"

"এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তবে আমি বিনোদবাবুকে কাল বলি যে, আমার দ্বারা মদ খাওয়া হবে না?"

"বল।"

নলিন কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। তাহার কানের কাছে ভুবনেশ্বরবাবুর শেষ উপদেশ—

ছোড়িও না হিম্মৎ,

বিশরিও না হরিনাম——বাজিতে লাগিল।

তখন সে দৃঢ়চিত্তে বলিল—"বেশ। তবে তাই হোক। আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করব না। চাক্‌রী যাক্। আমি ভগবানের পায়ে নিজেকে ও তোমাদিগকে সমর্পণ করলাম।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত বন্ধু

আজ রবিবার। যে তারিখে বিপিনবাবু নলিনকে এক বৎসর কাল বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, সেই তারিখ আবার ফিরিয়া আসিল।

গত কল্য এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আজ প্রভাত হইতে নলিন অত্যন্ত বিমর্ষ।

হেমাঙ্গিনীর মুখখানিও আজ শুষ্ক—তবে সে নিজের মনের ভাব নিজের মনেই গোপন করিয়া সাধ্যমত স্বামীর মন ভাল রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

বেলা দশটা বাজিলে নলিন স্নান করিল।

খোকার জন্য, খুকীর জন্য, নলিনের জন্য তিনখানি আসন পাতা হইয়াছে। তিন জনে

খাইতে বসিল। নলিন ভাত খায়—আর মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ের পানে চায়। তাহার কেমন মনে হইতেছে, বেশী দিন আর এখানে বসিয়া ইহারা ভাত খাইবে না।

নলিন আজ ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না। কোনও মতে আধ-খাওয়া অবস্থায়, স্ত্রীর মিনতিসত্ত্বেও উঠিয়া পড়িল।

আহারান্তে নলিন শয্যায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী নিজে স্নানাহার শেষ করিয়া, শয্যায় বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিল। নলিনের ঘুম আসিল না। বেলা দুইটা অবধি এইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল—"কৈ আজ এখনও ত বিপিনের কাছ থেকে বাড়ী ছাড়বার নোটিশ এল না। কাল ত এক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "তোমার এই বিপদ—চাক্‌রীটি পর্য্যন্ত গেল তা কি বিপিনবাবু শোনেন নি? এমনি সময় তিনি কখনই বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে বলবেন না। শরীরে একটুও ত দয়ামায়া আছে!"

নলিন হাসিয়া বলিল—"খুব দয়ামায়া আছে! বোধ হয় কাজের ভিড়ে ভুলে গেছে। আজ কি কাল নোটিস্ আসবে দেখে নিও।"

বেলা তিনটা বাজিল। খোকা বলিল, "বাবা আমার জুতো ছিঁড়ে গেছে। তুমি ত বলেছিলে, রবিবারে কিনে এনে দেব। আজ ত রবিবার।"

নলিন খোকাকে বুকে লইয়া বলিল, "আজ নয় বাবা, অন্য এক রবিবারে কিনে এনে দেব।"

অভিমানের সুরে খোকা বলিল, "যখনই বলি, তখনই ত বল অন্য এক রবিবারে।"

খুকী আসিয়া বলিল, "মা পয়সা দাও না, মুড়ি কিনে আনি, ক্ষিধে পেয়েছে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "আজ আর মুড়ি খেও না মা—সন্ধ্যে হলেই ভাত খেও এখন।"

মেয়ে পয়সার জন্য অনেক বায়না ধরিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী আজ কিছুতেই পয়সা বাহির করিল না। এখন প্রত্যেক পয়সাটি তাহার কাছে মোহরের মত মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে।

ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা, বেলা যে গেল। বাজার যেতে হবে না? আলু একটীও যে নেই।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "থাক্ ঝি, আজ আর আলু আনতে হবে না। বেগুন আছে, তাইতেই এবেলা চলে যাবে এখন।"

নলিন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "হা ভগবান!"

এমন সময় নীচে সদর দরজা হইতে উচ্চ শব্দ আসিল, "বাবু—এ নলিনবাবু।"

কে ডাকে? স্ত্রী-পুরুষে উভয়ে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল উর্দ্দিপরা একজন চাপরাশি, হস্তে পিয়ন-বুক, দ্বারে করাঘাত করিতেছে।

হেমাঙ্গিনী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"কে আবার! বিপিনের চাপরাশি—তাদেরই উর্দ্দি। নোটিস্ এসেছে।"

কোনও মতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, দ্বার খুলিয়া, পিয়ন-বুকে সহি দিয়া, চিঠি লইয়া নলিন উপরে আসিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যে হাতে চিঠি ধরিয়া আছে সে হাত ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

চিঠি হাতে করিয়া নলিন বিছানায় বসিল। বলিল, "হিমু, তুমি যে বলছিলে তার শরীরে দয়ামায়া আছে, দেখ কেমন দয়ামায়া।"

"কিছুদিন সময় দিয়েছে, না আজই উঠে যেতে বলেছে, দেখি।" বলিয়া নলিন ধীরে ধীরে চিঠিখানি বাহির করিল। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া দেখে—

এ কি! চিঠির সঙ্গে গাঁথা একখানি চেক্। তাহাতে নলিনকে টাকা দিবার জন্য আদেশ রহিয়াছে। বারো হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকার চেক। নীচে বিপিনবাবুর দস্তখৎ রহিয়াছে। নলিন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, "হিমু, আমার মাথায় জল দাও।"

হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া ঘটি হইতে শীতল জল লইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া স্বামীর মাথায় দিতে লাগিল। বিছানা ভিজিয়া গেল। তাহার পর একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট এইরূপে কাটিলে নলিন ধীরে ধীরে আবার চক্ষু খুলিল। বলিল, "ভেব না, ভাল খবর। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।" বলিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

ভবানীপুর

ভাই নলিন,

ছোটবেলা হইতে আমরা পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতেছি। ছোটবেলায় আমরা একত্র কত খেলা করিয়াছি। আমাদের সেই বাল্যজীবন বড় মধুময় ও পবিত্র ছিল। হায়, যদি চিরদিনই সেইরূপ থাকিত!

আজিও তোমার প্রতি আমার মনের ভাব সেইরূপই আছে। কিন্তু আজ ছয় বৎসর কাল ধরিয়া তুমি মনে করিতেছ, আমি সে ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া তোমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতেছি। এরূপ মনে করিয়া নিশ্চয়ই তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ। আর আমিও তোমাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের উভয়েরই সকল কষ্ট সার্থক হইয়াছে।

তুমি যখন তোমার পিতার মৃত্যুর পর কুসঙ্গে পড়িয়া টাকা উড়াইতে লাগিলে, তখন আমি তোমাকে বুঝাইলে কিংবা ভর্ৎসনা করিলে তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিতে না। ছয় বৎসর আগে তুমি যখন তোমার মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমার কাছে টাকা চাহিতে আস তখনও তোমার মদের অভ্যাস ছাড়ে নাই। পাছে আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া পরে আবার তুমি টাকার জন্য বাড়ীগুলি অন্যের কাছে বন্ধক দাও, সেই ভয়ে আমি সেগুলির "কট্‌কবালা" লিখাইয়া লইয়াছিলাম। তার পরে পাঁচ বৎসর কাল নিয়ত আমি গোপনে তোমার সংবাদ লইয়াছি। দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, তোমার চরিত্র সংশোধন হইল না, কারণ তুমি দলটি ছাড়িলে না। তখন আমি ভাবিলাম, স্ত্রী সন্তানের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দেখিলে হয়ত তোমার সুমতি হইবে। তাই তোমার ভালর জন্যই বাড়ীগুলি কাড়িয়া লইয়া, তোমাকে গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। পুলিসকোর্টে তোমার মোকর্দ্দমার বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া, আমিই ভুবনেশ্বরকে তোমার উদ্ধারার্থ পাঠাই।

ভুবনেশ্বর আমার একজন প্রিয় বন্ধু। আমিই হেড্‌ক্লার্ক যোগীন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিয়া তোমার চাক্‌রীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম যে ভুবনেশ্বর প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা তোমাকে দিতেন, তাহাও আমার পরামর্শে। ছেলে পড়াইবার নাম করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত তোমাকে আবদ্ধ রাখা—তাহাও আমারই পরামর্শ, কারণ রাত্রি নয়টার সময় দোকান বন্ধ হইয়া যায়। গোপনে গোপনে তোমার প্রতি-

দিনকার সংবাদই আমি রাখিতাম। যখন দেখিতাম, দশ মাস কাল তুমি মদ্য স্পর্শ করিলে না, তখন আমার অনেকটা আশা হইল। তথাপি ভাবিলাম আর একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি।

মদ্যপান করিলে তোমার চাকরি পাকা হইবে এবং না করিলে চাক্‌রী যাইবে, এ পরীক্ষাটি আমারই উদ্ভাবিত। এ বিষয়ে যোগীন্দ্রবাবু আমার অনুরোধ পালন করিয়াছেন মাত্র।

আজ দেখিতেছি, ভাই, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার মনে তোমার সম্বন্ধে আর কোনও আশঙ্কা নাই। তুমি তোমার সম্পত্তির যে অংশ নিজ দোষে নষ্ট করিয়াছ, তাহা গিয়াছে।

আমি যতটুকু বাঁচাইতে পারিয়াছি, তাহা আজ তোমায় প্রত্যর্পণ করিতেছি।

যে দিন তোমার বাড়ীগুলি আমি কাড়িয়া লই, তাহার সপ্তাহ পরেই আমি ভাড়াটে বাড়ী দুখানি সুবিধা দরে বিক্রয় করি, সেই দাম হইতে আমার প্রাপ্য টাকা বাদে বাকী সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলাম।

এক বৎসরে তোমার সেই টাকা সুদে আসলে যত হইয়াছে তত টাকার একখানি চেক এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম। তোমার বসতবাটীর দলিল-খানিও ফেরৎ পাঠাইলাম। উহার পৃষ্ঠে দাবী পরিশোধ লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলাম। ঐটুকু রেজিষ্টারি করাইয়া লইবে। ঐ বাড়ী তোমারই রহিল।

তুমি যদি ঐ আপিসে এখনও চাক্‌রী করিতে ইচ্ছা কর, আমি যোগীন্দ্রবাবুকে বলিয়া দিব। যদি চাক্‌রী করিতে ইচ্ছা না থাকে ঐ বারো হাজার টাকা মূলধন লইয়া তুমি দালালী ব্যবসায় কিংবা অপর কোনও ব্যবসায় করিতে পার। আমার মতে, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাই ভাল।

অনেকদিন তোমায় দেখি নাই—একদিন অবসর মত আসিও।

তোমার বাল্য বন্ধু
শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাপ্ত

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

অভিনব ভেলা—

জলের ঢেউএর উপর ভেলাতে করিয়া তীর-বেগে চলিয়া যাওয়া ইউরোপের এবং আমেরিকার নানাস্থানের অতি প্রিয় খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভেলার গতি বাড়াইবার জন্য ভেলার একপ্রান্তে একটি ছোট অথচ জোরালো মোটর বসান হয়। আরোহী যাহাতে পড়িয়া না যায় এবং নিজের তাল সামলাইতে পারে সেইজন্য ভেলার সঙ্গে দাঁড় আঁটা থাকে। এই ভেলায় আর একটি অভিনব ব্যবস্থা আছে—আরোহী জলে পড়িবামাত্র আপনা হইতেই ভেলা থামিয়া যায়।

অভিনব ভেলা

—

দাঁতের গোড়ায় ঔষধ দিবার যন্ত্র—

দাঁতের গোড়ার ব্যথা ফুলা ইত্যাদি সারাইবার দরকার হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁত তুলিয়া ফেলিতে অথবা মাড়ি কাটিতে হয়। সম্প্রতি জনৈক চিকিৎসক দাঁতের অসুখে দাঁতের গোড়ায় মাড়িতে আইডিন ঢুকাইয়া দিবার জন্য একটি নূতন ইন্‌জেকশন যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, এই নূতন যন্ত্র বিশেষ ভাল কাজ দিতেছে। দাঁতের গোড়ায় মাড়িতে

দাঁতের গোড়ায় ঔষধ দিবার যন্ত্র

ভাল করিয়া ইন্‌জেকশন দিবার ফলে অনেক সময় অনাবশ্যক দাঁত তোলা বা মাড়ি কাটার হাত হইতে বাঁচা যায়।

গাছ হইতে দুধ—

গোয়াতেমালা দেশের এক প্রকার বৃক্ষ হইতে অবিকল দুগ্ধের মত এক প্রকার পানীয় পদার্থ

গাছ হইতে দুধ

পাওয়া যায়। এই দুগ্ধ ঐ স্থানের লোকেরা চা কফি ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। দুধ যেমন বাসি হইলে বা টক্ জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়া যায়—এই বৃক্ষের দুগ্ধও ঠিক সেই প্রকারে কাটিয়া যায়।

—

জাল এবং নকল চিত্র ধরিবার উপায়—

বাজারে অনেক সময় প্রসিদ্ধ চিত্রকরের আঁকা ছবি বলিয়া বহু চিত্রাদি বিক্রয় হয়। অনেকে বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আঁকা বিখ্যাত চিত্রাদির নকল ছবি আঁকিয়া লোককে ঠকাইয়া বিক্রয় করে। বিশেষ অভিজ্ঞ শিল্পী ছাড়া অন্য

এক্স্-রের সাহায্যে চিত্রের জাল ও নকল ধরা

কেহ এই চুরি ধরিতে পারিত না। সম্প্রতি এক প্রকার এক্স-রে বাতি বাহির হইয়াছে। ইহার আলোর সাহায্যে ছবির বয়স এবং রং কতকালের পুরানো তাহা অনায়াসে ধরা যায়। নূতন এবং পুরানো রং-এর তফাৎ এই আলোর মুখে অতি স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বাতি বাহির হইবার পরে বাজারে জাল এবং নকল ছবি চালানো কষ্টকর ব্যাপার হইবে।

—

ঘণ্টায় ২৩১ মাইল—

প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে মেজর সিগ্রেভ নামক একজন ইংরেজ মোটর চালক ঘণ্টায় ২৩১ মাইল বেগে মোটর চালনা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ২০৭ মাইল বেগে মোটর দৌড়াইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত এত বেগে আর কেহ মোটর চালনা করিতে পারে নাই।

মেজর সিগ্রেভের ২৩১ মাইল বেগে মোটর চালনা করিবার পরেই আমেরিকান মোটর চালক লি বিবল্‌ আরো জোরে মোটর চালনা করিতে গিয়া একচুল ভুলের জন্য প্রাণ হারাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মোটরের ধাক্কায় একজন ক্যামেরা-ম্যানও মারা যায়।

আমেরিকার ডেটোনা-বিচে মেজর সিগ্রেভ তাঁহার মোটর দৌড় করান। হাজার হাজার

মেজর সিগ্রেভের মোটর-গোল্ডেন অ্যারো

লোক এই অত্যাশ্চর্য্য দৌড় দেখিবার জন্য সমবেত হয়। মেজরের গাড়ী চার মাইল দৌড়াইবার পর হঠাৎ তাহার বেগ বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে গাড়ীখানি ৯ মাইল পথ ২৩১-৩৬ মাইল বেগে অতিক্রম করিয়া যায়।

মোটর দৌড় হইয়া যাইবার পর মেজর সাহেব দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, ঘণ্টায় ২৪০ মাইল বেগে গাড়ী না চলাতে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গাড়ী-খানি অন্তত ২৪০ মাইল বেগে চলিবে।

অনেকে বলিতেছেন যে, এইরূপ বিষম বেগে

মেজর সিগ্রেভ ও তাঁহার পত্নী

গাড়ী দৌড় করানোর উপকারিতা কিছুই নাই। মানুষের কোনো কাজে এত দ্রুতবেগ প্রয়োজন হইবে না। তাহা ছাড়া শহরের মাঝখানের রাস্তা দিয়া এত জোরে গাড়ী চালানো অসম্ভব ব্যাপার। কোনো কালে ইহা হইতে পারে না। তবে ইহাতে ইঞ্জিনের জোর এবং গাড়ীর 'বডি' নির্ম্মাণের বহু উন্নতির আশা করা যায়।

সতী-মুনি বিসম্বাদ

এক ব্রাহ্মণ—তাঁর দুই কন্যা।

বড় কন্যা বিয়ে করলে না। বল্লে—আমি বিয়ে করব না—বনে তপস্যা করব। ছোট ভগ্নীর বিয়ে দাও।

ব্রাহ্মণ ছোট ভগ্নীর বিয়ে দিলে। বড় ভগ্নী বনে তপস্যা করতে গেল।

ব্রাহ্মণ কিছুদিন পর মারা গেল।

ছোট ভগ্নী বিয়ে ক'রে স্বামীর সেবায় রত থাকে; আর সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম করে। এই-ই হ'ল তার একমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম—সে স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না।

(২)

একদিন দুপুরে সে স্বামীর পদ-সেবা করছে, এমন সময় এক ভিখারী এসে ভিখ্ চাইলে। ঘরের ভিতর থেকে সে ভিখ্ আন্‌ছিল ভিখারীকে দিতে; কিন্তু হঠাৎ সে মধ্য উঠান থেকে ফিরে গিয়ে এক ঘটী জল এনে উঠানে ঢেলে দিলে। পরে সেই ভিক্ষার চাউল ভিখারীকে দিলে।

ভিখারী জিজ্ঞাসা করলে—মা, উঠানে হঠাৎ তাড়াতাড়ি জল ঢাল্‌লে কেন?

সে বল্লে—আমার বড় ভগ্নী, বনে তপস্যা করছেন। তাঁর পর্ণকুটীরের পশ্চিমাংশে দৈব-ক্রমে আগুন ধরেছিল; তাই জল ঢেলে নিবিয়ে দিলাম।

(৩)

ভিখারী অতিশয় আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার দিদি কোন্ বনে তপস্যা করছে? আর মা, তুমি কি করেই বা তা জান্‌লে?

সে বল্লে—অমুক্ বনে। আমি স্বামী-সেবা ভিন্ন অন্য কোন যোগাযোগ জানি না—তবে, আগুন লাগা ঠিকই।

ভিখারী সন্ধান নিয়ে সেই বনে গেল। গিয়ে দেখে—এক ব্রাহ্মণকন্যা ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন; কিন্তু তার কুটীরের পশ্চিমাংশে সদ্য আগুন-লাগার চিহ্ন বর্ত্তমান।

ভিখারী তার তপস্যা-ভাঙা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে।

তপোভঙ্গের পর ব্রাহ্মণকন্যা ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখানে কি জন্য এলে?

ভিখারী বল্লে—অমুক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে ভিখ্ চাইতে গিয়েছিলাম। সেই-ই বল্লে যে, তোমার কুটীর-ঘরে নাকি আগুন লেগেছে। তার জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে এক ঘটী জল উঠানে ঢেলে, সেই আগুন নিবিয়ে দিয়েছে। ইহা ঠিক কি না, তাই জান্‌বার জন্য আমি এখানে এসেছি। আমি কিন্তু এখানে এসে দেখ্‌লাম যে, তাঁর কথাই ঠিক্—একটা চাল পুড়ে গেছে—তিন চাল ঠিক আছে।

(৪)

এই শুনে অতি আশ্চর্য্য হ'য়ে বড় ভগ্নী ছোট ভগ্নীর নিকট এলো। এসে দেখ্‌লে—ছোট ভগ্নী অনন্যমনে তার স্বামী-সেবায় নিযুক্ত রয়েছে। বড় ভগ্নীকে দেখে ছোট ভগ্নীর স্বামী বল্লে—ঐ দেখ, তোমার দিদি এলো। যাও যাও, ওর আদর অভ্যর্থনা কর—জলযোগ ও পা'ধোবার ব্যবস্থা কর।

ছোট ভগ্নী ভাল করে দিদির আদর অভ্যর্থনা করলে।

এ-কথা, সে-কথা, নানা কথার পর বড় ভগ্নী, ছোট ভগ্নীকে তার ঐ অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভের পন্থা কি, জিজ্ঞাসা করলে।

সে বল্লে—একমাত্র স্বামী-সেবা ভিন্ন আমি অন্য কিছুই জানি না। স্বামী-সেবাই আমার একমাত্র জপতপ, যোগাযোগ যা কিছু বল, সবই।

বড় ভগ্নী প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আর বৃথা তপস্যা করে সময় নষ্ট করবে না; স্ত্রীলোকের স্বামী-সেবায় যখন সকল বৈভবই সহজে আয়ত্ত হয়, তখন স্ত্রীলোকের স্বামী-সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এখন আমার বিবাহ করাই উচিত। এই ভেবে সে বল্লে যে, ভোরে উঠে প্রথমেই যার মুখ দেখ্‌বে সে তারই গলে বরমাল্য দিয়ে বিয়ে করবে।

বড় ভগ্নী প্রাতে উঠেই দেখলে—এক গলিত-কুষ্ঠ যুবা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে বিনা দ্বিধায়, তারই গলায় বরমাল্য দিলে। তখন হতে, প্রাণমন এক ক'রে, সে তার সেই কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলো। তারপর সে তার স্বামীকে প্রাতে ও বৈকালে দুইবার ক'রে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

একদিন দৈব-ক্রমে, এক তপস্যা-মগ্ন মুনির গায়ে তার কুষ্ঠস্বামীর পা ঠেকে গেল। মুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাৎ করলে যে, যে আমার তপোভঙ্গ করেছে, নিশি প্রভাত হবা মাত্রই, তার মৃত্যু হবে।

বড় ভগ্নী বল্লে—আমি যদি সতী হই, তবে নিশি প্রভাত হবে না।

নিশি প্রভাত আর হ'ল না। তখন তেত্রিশ-কোটি দেবতা, নারায়ণের নিকট গিয়ে বল্লেন—প্রভু আজ নিশি প্রভাত হচ্ছে না কেন? এ যে বড় বিষম হলো!

নারায়ণ বল্লেন—মর্ত্ত্যভূমে সতী-মুনির বিসম্বাদ হ'য়েছে, তাই প্রভাত হচ্ছে না—তোমরা যাও, আমি নিশি প্রভাতের ব্যবস্থা কর্‌ছি।

(৫)

এই বলে নারায়ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে, সেই সতী-মুনির নিকট এসে উপস্থিত হ'লেন।

সতীকে বল্লেন—বল সতি, নিশি প্রভাত হোক্।

সতী বল্লে—নিশি প্রভাত হ'লে যে আমার স্বামীর মৃত্যু হ'বে—আমি কোন মতেই নিশি প্রভাত হ'তে বল্‌তে পারি না।

নারায়ণ বল্লেন—প্রভাত হ'তে বল; আমি অভয় দিচ্ছি—আমি তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবো।

নারায়ণের কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে, সতী নিশি প্রভাত হ'তে বল্লে। নিশি প্রভাত হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠী স্বামীর মৃত্যু হ'ল।

তখন সে জোড়করে নারায়ণকে বল্লে—এই বার আপনি আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন।

নারায়ণ বল্লেন—তোমার স্বামীকে চাদর দিয়ে ঢেকে বিমুখ হ'য়ে ব'স।

সে তাই-ই করলে। তখন নারায়ণ তার স্বামীর গায়ে পদ্ম-হস্ত বুলাইবা মাত্রই, সে দিব্য সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ প্রাপ্ত হয়ে বেঁচে উঠ্‌ল।

বড় ভগ্নী স্বামীকে ফিরে পেয়ে খুব খুসী হ'ল! সে নারায়ণকে শত কোটি প্রণাম করলে। নারায়ণ অন্তর্ধান হ'লেন। সুস্থ সুন্দর স্বামীকে সে বাড়ী নিয়ে এসে, তাঁর সর্ব্ববিধ সেবা শুশ্রূষায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হ'ল। তাদের উভয় ভগ্নীর স্বামী-সেবার গুণে, জগতে সতী ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা হ'লো।

শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এ

সতীদাহ

ছোটভাই—"দাদা, 'সতীদাহ' কি? 'সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন' মানে কি? এই যে ইতিহাসে রয়েছে—রামমোহন রায়ের সহায়তা পাইয়া লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক্ সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন।"

দাদা—"আগের কালে হিন্দু জাতির মধ্যে এই এক নিয়ম ছিল, যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে শ্মশানে পুড়ে' মর্‌তেন। যাঁরা এই রকমে স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মর্‌তে প্রস্তুত হতেন, তাঁদের বলা হত 'সতী'; আর তাঁদের দাহ করাকেই বলা হত 'সতীদাহ'।"

ছোটভাই—"কেন তাঁরা পুড়ে' মর্‌তে প্রস্তুত হতেন? সবাই পুড়ে' মর্‌তেন? বিধবা হয়ে কেউ বেঁচে থাক্‌তেন না?"

দাদা—"সবাই নয়; যাঁদের সাহস হত, তাঁরাই মর্‌তেন। বাঙলা, বিহার-উড়িষ্যা, আর আগ্রা-অযোধ্যা, এই তিন প্রদেশেই বোধ হয় এই নিয়ম বেশী চলিত ছিল। এই তিন প্রদেশে বছরে আন্দাজ ৬০০।৭০০ সতীদাহ হ'ত।"

ছোটভাই—"প্রতি বছর ৬০০।৭০০! তবু বল্‌চ কম? কেন তাঁরা ও রকম সাহস কর্‌তেন?"

দাদা—"তাঁদের বিশ্বাস ছিল, এতে খুব পুণ্য হয়; স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা হয়। মানুষের শরীরে যেমন সাড়ে তিন কোটী লোম আছে, তেমনি সাড়ে তিন কোটী বছর স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বর্গবাস কর্‌তে পার্‌বেন, এই তাঁরা মনে কর্‌তেন।"

ছোটভাই—"এ কি সত্যি? তাঁরা কেমন করে' জান্‌লেন?"

দাদা—"শাস্ত্রে লেখা আছে; তাই তাঁরা বিশ্বাস কর্‌তেন।"

ছোটভাই—"শাস্ত্রে কে লিখ্‌লে?"

দাদা—"অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিরা না কি লিখেছেন।"

ছোটভাই—"তাঁরা ওসব কথা কাউকে না জানালেই পার্‌তেন! আচ্ছা, সতীরা যে শ্মশানে পুড়্‌তে যেতেন, তাঁদের বাড়ীর লোকেরা কেউ কিছু বল্‌ত না? ছেলে মেয়েরা কি কর্‌ত?"

দাদা—"কাঁদ্‌তে থাক্‌ত; আর কি কর্‌বে? একে বাবা মারা গিয়েছেন; তাতে আবার মাও চল্লেন! কাঁদ্‌বে না?"

ছোট ভাই—"আর, কাকা, দাদা, মামা, তাঁরা কি কর্‌তেন?"

দাদা—"তাঁরা, কেউ ছেলে মেয়েদের সাম্‌লাতেন; আর, অন্যেরা শব নিয়ে শ্মশানে যেতেন। সতীকেও স্নান করিয়ে, নূতন শাড়ী পরিয়ে, কপালে সিঁদূর দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতেন।"

ছোটভাই—"তার পর?"

দাদা—"তার পর, আর কি? মন্ত্র পড়িয়ে, হাত ধরে সাজান চিতার উপর তুলে দিতেন।"

ছোটভাই—"চিতা তখন জ্বল্‌ছিল?"

দাদা—"তখনও আগুন দেওয়া হয় নি; শুধু কাঠগুলো সাজিয়ে রেখে, তার উপর স্বামীর শবকে রাখা হয়েছে। সতীকে তাঁর পাশে শুতে বলা হল।"

ছোটভাই—"তার পর বুঝি তলায় আগুন ধরিয়ে দিলে? কে দিলে? মা উঠে আস্‌তে চাইলেন না?—যখন আগুন এসে পিঠে লাগ্‌ল?

কি ভয়ানক! বাড়ীতে যে ছেলেমেয়েগুলো মা মা করে কাঁদ্‌চে!"

দাদা—"উঠে আস্‌তে চাইলে কি হবে? তখন আর উঠে আস্‌বার যো-টি নেই। আগুন দেবার আগেই দু'জনার উপর আরও কাঠ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কখন কখন দু' তিনটা লম্বা বাঁশ দিয়ে দু' দিকে চেপে ধরে রাখা হত।"

ছোটভাই—"কেন? ও রকম কর্‌ত কেন? আস্‌তে চাইলে, সেই ত বেশ।"

দাদা—"মন্ত্র পড়ার পর ফিরে আসা যে ভয়ানক পাপ! কঠিন প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। না কর্‌লে ঘরে জায়গা নেই। একবার একজন পালিয়ে, সেই যে নিরুদ্দেশ হল, আর দেশে ফিরে এল না। লোকে ছি ছি করে; মুখ দেখান যায় না। আর আধ-পোড়া হয়ে উঠে আসাও ত বিপদ। তাই, লোকেরা কিছুতেই পালিয়ে আস্‌তে দিত না। কোনও রকমে উঠে এলে, আবার ধরে নিয়ে আগুনে ফেল্‌ত।"

একবার এক সতীকে পোড়ানর সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখ্‌ছিলেন, যেন তাকে কোনও রকমে জোর করা না হয়। সেইজন্য একজন সিপাইও দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। সতী নিজের ইচ্ছায় চিতার উপর গিয়ে উঠ্‌ল। স্বামীর মস্তক কোলে নিয়ে বসে' "রাম নাম সত্য হ্যায়! রাম নাম সত্য হ্যায়!" বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল।

ছোটভাই—"সে বুঝি হিন্দুস্থানী ছিল?"

দাদা—"হাঁ। গঙ্গার ধারে অনেক লোকের ভিড় হয়েছিল। সবাই তার সাহস দেখে অবাক্ হ'ল। তার পর যখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল, তখন আর তাপ সহ্য কর্‌তে না পেরে, স্ত্রীলোকটি গঙ্গায় লাফিয়ে পড়্‌তে চাইল। লোকেদের ত যাতে সে ইচ্ছা না পালায়; কারণ, তাতে যে ভয়ানক পাপ। তাই, তারা বল্‌তে লাগ্‌ল, "খবর্‌দার! খবর্‌দার!" সিপাইটিও ত সেই ধাতের লোক। তারও বিশ্বাস, পালান নিতান্ত খারাপ। তাই সে, কোথায় দেখ্‌বে কেউ জোর করে' ধরে না রাখে, তা নয়, সে নিজেই তরওয়াল খুলে' সতীকে শাসাল।"

ছোটভাই— "বাঃ রে!"

দাদা—"সতী ভয়ে জড়সড় হয়ে আবার চিতায় উঠ্‌ল। সাহেব বিরক্ত হয়ে সিপাইকে সরিয়ে কয়েদ করে' রাখ্‌লেন। সতী আবার আগুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে গঙ্গার জলে লাফিয়ে পড়্‌ল। জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাকে আবার জোর করে' এনে পোড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সাহেবের জন্যে পার্‌লেন না। সাহেব তাকে পাল্কী করে' হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।"

ছোটভাই—"সাহেব ত খুব ভাল। ওরা বুঝতে পারে নিজের লোকেরা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হয়?"

দাদা—"ভুল বিশ্বাসে মানুষ সব নিষ্ঠুর কাজ কর্‌তে পারে। সবারই ত এই বিশ্বাস ছিল, যে, স্বামী স্ত্রী দু'জনে সাড়ে তিন কোটী বছর স্বর্গে বাস কর্‌বে! আর নিষ্ঠুর কাজ চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদা দেখে দেখে মানুষের সয়ে যায়।"

ছোটভাই—"হাঁ। পূজোয় পাঁটা-বলি অনেক ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। আমি সইতে পারি নে; পালিয়ে আসি। সতীদাহও কক্ষনো সওয়া যাবে না।"

দাদা—"রামমোহন রায়ের ওটা সহ্য হ'ত না। তিনি ছোট সময় থেকে এই কথাটাকে বড় খারাপ বলে' মনে কর্‌তেন।"

ছোটভাই—"তিনি শাস্ত্র জান্‌তেন না?"

দাদা—"জান্‌তেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রের চাইতে সহজ বুদ্ধিকে বড় মনে কর্‌তেন। কোন্ কালে কবে অঙ্গিরা, ব্যাস বা বৃহস্পতি একটা কথা লিখে গেছেন, তাই বড় হবে; আর হাজার হাজার, লাখ-লাখ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝছে তার কোনও মূল্য নেই;—এমন তিনি মনে কর্‌তেন না। ভাল মন্দ বোঝ্‌বার একটা সহজ বুদ্ধি ত সবারই আছে।"

ছোটভাই—"রামমোহন রায় কি কর্‌লেন?"

দাদা—"তিনি এই বিষয়ে অনেক বই লিখে ছাপিয়ে, লোকদের পড়তে দিলেন। তাতে বুঝিয়ে দিলেন স্বর্গের লোভে আত্মহত্যা করা পাপ। বেঁচে থেকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, আর নিজে ভালভাবে জীবন কাটানই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায় লাট্ সাহেবকেও বুঝিয়ে দিলেন যে, হিন্দুর শাস্ত্রে এমন কথা নেই, যে স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণ যেতেই হবে; না গেলে কোন পাপ নেই। এতে লাট্‌সাহেবের ভ্রম গেল। ইংরেজরা আগে মনে কর্‌তেন, সহমরণ বারণ করে দিলে হয়ত একটা বিদ্রোহ হবে। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন, রামমোহন রায়ের পক্ষে অনেক লোক আছে; তারা চায় সতীদাহ আর না হয়; তখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইন করে' দিলেন যে, কেউ আর এই নিষ্ঠুর কাজ কর্‌তে পার্‌বে না।"

ছোটভাই—"সকলে তা মান্‌ল? বিদ্রোহ হ'ল না?"

দাদা—"অনেকে কিছুদিন গোলযোগ কর্‌ল; লাট্‌সাহেবের আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে আপীল কর্‌ল; কিন্তু কিছু হ'ল না। শেষে আপনা-আপনি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

ছোটভাই—"আর, রামমোহন রায় কি কর্‌লেন?"

দাদা—"তিনি আর তাঁর দলের লোকেরা খুব খুশী হয়ে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দন দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন।"

ছোটভাই—"আমাদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বাপ রে! এমন প্রথা যদি আজও চলিত থাক্‌ত? বেণ্টিঙ্ক সাহেব কবে আইন করে' দিলেন?"

দাদা—"ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইনটি পাশ হয়েছিল।"

ছোটভাই—"এই যে সে দিন ৪ঠা ডিসেম্বর গেল, সে দিন তাহলে ঠিক এক'শ বছর হ'ল?"

দাদা—"হাঁ।"

ছোটভাই—"সে দিন ত তা হ'লে একটা মস্ত দিন গেল! কিছু ত টের পেলাম না!"

দাদা—"আমি ভেবেছিলাম, সে দিন সহরে-সহরে গ্রামে-গ্রামে রামমোহন রায়ের প্রতি, বেণ্টিঙ্ক সাহেবের প্রতি, আর সর্ব্বোপরি ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু কই কিছু ত হ'ল না! কেবল কলিকাতায় বুঝি একটি সভা হয়েছিল। সে দিন হিন্দু মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অনুভবের দিন গিয়েছে। কেবল হিন্দুর কেন?—মুসলমান, খ্রীষ্টান, সবারই। তাঁদেরও ত এই ব্যাপার দেখতে হত। হিন্দুর দুঃখে কি তাঁদের দুঃখ নেই?"

ছোটভাই—"দাদা, ৪ঠা ডিসেম্বর কেন আমাকে এ সব কথা মনে করিয়ে দিলে না? ঐ তারিখে যে ভারতবর্ষ একটা গুরুতর পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল!"

দাদা—"তুমি যে অতটা বুঝতে পার্‌বে, তা ভাবি নি। আমার ত সে দিন সারাদিনই এ সব কথা মনে জাগ্‌ছিল।"

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিউলী ফুল

(কবিতা)

শিশির রাতে কে গো তুমি! পরীর বেশে বেশ করি।
ভোর না হ'তে আপন মনে ঝর যেন ফুল ঝরি ॥
শাখায় শাখায় রাত্রি বেলায় নৃত্য কর ঢুল ঢুল।
তালে তালে পাতার ফাঁকে গেয়ে উঠে বুল বুল ॥
ছোট্ট ছোট্ট মেয়েগুলি সাজি হাতে যায় ছুটি'।
তুমি যখন মাটির 'পরে ছড়িয়ে গন্ধ দাও লুটি' ॥
তারার সাথে পাল্লা দিয়ে আপন রূপে রূপ ছড়াও।
অরুণ যখন আসে ছুটে তুমি তখন সরে দাঁড়াও ॥
শীতের রাতে সাদা দাঁতে হাস যখন খিল্ খিল্।
কাঁপে তখন তোমার সাথী মায়ের কোলে হিল হিল ॥
রাতেই আস রাতেই যাও বিশ্বজনার ইঙ্গিতে।
ভেবেছিলাম অমনি বুঝি থাক্‌বে চির-সঙ্গীতে ॥
মুখে নিয়ে ছেলেরা যখন বাজায় তোমায় পুঁ পুঁ।
পাখীরা তখন কূলা ছেড়ে ভেসে বেড়ায় সুঁ সুঁ ॥
ছুটে বেড়ায় ঝিঁঝিঁ পোকা কর্‌তে তোমার ঘটকালি।
হেসে হেসে চাঁদ এসে ভিজিয়ে দেয় সুধা ঢালি ॥
বিশ্বজনার হাতে গড়া সবই যেন অস্থায়ী।
একবার আসে একবার যায়; আসা যাওয়াই চির-স্থায়ী ॥

শ্রীঅরবিন্দ মিত্র

ডাকাতের হাতে দুই বার

এই যে গল্পটি লিখ্‌ছি, এটি কিন্তু আমার তৈরী মিথ্যা গল্প নয়; একটি জীবনচরিতের সত্য ঘটনাই তোমাদের শুনাচ্ছি। তোমরা শান্তিপুরের নাম শুনেছ ত? হয় ত অনেকেই শুনেছ। এই শান্তিপুরে একটি সাধুপুরুষ জন্মেছিলেন, তাঁর নাম অঘোরনাথ গুপ্ত। ছেলেবেলা হতেই তাঁর স্বভাবচরিত্র খুব ভাল ছিল। তিনি পাড়ার লোকের উপকার কর্‌তে পার্‌লেই খুব খুশী হতেন। এইজন্য মানুষেরা সুবিধা পেয়ে তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাবার চেষ্টা কর্‌ত। তাই বাড়ীর লোকেরা তাঁকে বল্‌তেন, 'তুই কি সকলেরই চাকর না কি? যে যা বলে, তা করিস্‌ কেন?' অঘোরনাথ শুনে হাস্‌তেন।

অঘোরনাথের বাবাও একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি খুব ভাল একজন কবিরাজ ছিলেন বটে; কিন্তু তা থাক্‌লে কি হবে? কাহারও কাছে টাকার জন্য ত আর পীড়াপীড়ি কর্‌তেন না; গরীব হলে টাকা না নিয়েই চিকিৎসা কর্‌তেন। কাজেই তাঁর কাজ বেশি থাক্‌লেও আয় বেশি ছিল না। কিন্তু একবার এক চোর মনে কর্‌ল, কবিরাজ মশাই যখন খুব ভাল চিকিৎসক, তখন তাঁর ঘরে ঢের টাকা আছে। চোর ত এক রাত্রে টাকার লোভে কবিরাজ মহাশয়ের ঘরে ঢুক্‌লো; কিন্তু টাকা কোথায়? নেবার মতন কোন জিনিষই সে খুঁজে পেলে না। অনেকক্ষণ ধরে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে, নিরাশ হয়ে চোর যখন চলে যাবে, তখন কবিরাজ মহাশয়ের মনে বড় কষ্ট হ'ল। তিনি রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমান নাই, চোখ বুজে মনে মনে ঈশ্বরের নাম কর্‌ছিলেন। চোরের সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকা, দ্রব্যসামগ্রীর অনুসন্ধান—এ সকলি তিনি জান্‌তে পেরেছেন। তাই তিনি দয়ার্দ্র হয়ে চোরকে ডেকে বল্লেন,—

"ওহে বাপু, তুমি বড়ই ভুল করেছ, চুরি কর্‌তে এখানে এলে কেন? আমার যে কিছুই নেই। তোমার বড় পরিশ্রম হয়েছে, তোমাকে তামাক সেজে দিচ্ছি, খেয়ে আপনার বাড়ীতে চলে যাও।"

চোরের আর তামাক খাবার সাহস হ'ল না, সে কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনেই প্রস্থান কর্‌ল।

এই অঘোরনাথ আর তাঁর বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রথমে গ্রামের টোলে সংস্কৃত পড়েন। তারপরে তাঁরা কলিকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। এই সময়ে স্বর্গীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে পড়তেন। অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ এই তিনজনই খুব ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাই কলেজে তিন জনের মধ্যেই বেশ একটা ভালবাসা জন্মেছিল। কলেজের সব ছেলেরা, এই তিন বন্ধুর নির্ম্মল চরিত্র, সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মভাব দেখে তাঁদের অতিশয় শ্রদ্ধা কর্‌তেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন বন্ধুই ঈশ্বরকে লাভ করে ধর্ম্মপ্রচারক হয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ শিবনাথের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, আর তাঁরা শিবনাথের আগেই কলেজের পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাই দুজনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন।

অঘোরনাথ এই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মালদহ গিয়ে যে চোরের হাতে পড়েছিলেন, প্রথমে সেই মজার কথাটাই বলি। মালদহ সহরে তখন অন্নাদাচরণ খাস্তগির মহাশয় সরকারী ডাক্তার। তিনিও খুব ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। অঘোরনাথ তাঁরই অতিথি। তোমরা ত জানই মালদহের আম বড় চমৎকার। সেখানে বিস্তর আমের বাগান। এক একটি বাগান বড়ই সুন্দর। অঘোরনাথ সহরের একটু দূরে, তারই একটি বাগানে গিয়ে উপাসনায় বস্‌লেন। ঈশ্বরেতে তাঁর মনটা একেবারে ডুবে গেল।

এই সময়ে আমবাগানের নিকটেই মাঠে রাখালছেলেরা গরু নিয়ে এসেছিল। তারা দেখতে পেলে, একটি মানুষ পাথরের মূর্ত্তির মতন স্থির হয়ে বসেই আছে, ঘণ্টার পরে ঘণ্টা চলে যায়, তবু সে নড়েও না, কথাও বলে না, চোখ মেলেও চায় না। রাখালদের কয়টি ছেলের চুরি-বিদ্যাটা হয় ত বেশ ভাল করেই জানা ছিল। তাই তারা আস্তে আস্তে অঘোরনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো, তার পরেই সেই ছেলেরা তাঁর গায়ের গরম কাপড়, জুতা ও ছাতা নিয়ে সরে পড়্‌লো। অঘোরনাথ উপাসনার পরে বাসায় ফিরে যাবার সময়ে চেয়ে দেখেন, গায়ের কাপড়, জুতা ও ছাতা—এই তিনটি বস্তু একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। নানা জায়গায় খুঁজে দেখ্‌লেন, কোথাও ঐ তিনটী জিনিষের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। অঘোরনাথ খালি গায়ে, খালি পায়ে, খালি মাথায় যখন বাসায় ফিরে এলেন, তখন ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"সে কি অঘোরবাবু, আপনার যে ছাতা, জুতা ও গায়ের কাপড় কিচ্ছুই নেই?"

অঘোরনাথ বল্লেন—"মশাই, ঐ কথা আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? গায়ের কাপড়, জুতা ও ছাতা এই তিনটি জিনিস আমারই কাছে রেখে দিয়েছিলুম, তা কখন যে চোর এসে নিয়ে চলে গেল, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

অঘোরনাথ এই মালদহ হতে পূর্ণিয়া যাবার রাস্তায়ই ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন মালদহ ও পূর্ণিয়া অঞ্চলে রেলগাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করেনি। অঘোরনাথ কাবুলীর মতন পিঠে আপনার জিনিষ-পত্রের বোঝা নিয়ে পায়ে হেঁটেই পূর্ণিয়া চল্লেন। রাস্তায় কোথাও বা বড় বড় মাঠ, কোথাও বা ভয়ানক জঙ্গল, কোথাও বা উঁচু পাহাড়। সাধু-পুরুষ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে এই সকল জায়গা দিয়েই চল্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি ভাব্‌লেন যত কষ্টই সহ্য করি, আর যত বিপদেই পড়ি না কেন, দেশে দেশে গিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের নাম শুনাতেই হবে। তিনি পূর্ণিয়া জেলায় একটি জঙ্গলের কাছে ছোট একটি গ্রাম দেখতে পেলেন। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করার পরেই সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন আর পথে চল্‌তে তাঁর সাহস হ'ল না। চল্‌বেনই বা কেমন করে? শরীর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার উপরে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। অঘোরনাথ নিরুপায় হয়ে এক বাড়ীতে রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন। বাড়ীর লোকদের গৃহস্থ বলেই মনে হ'ল। বাড়ীর মানুষ-গুলিও তাঁকে যত্ন করে ঘরে নিয়ে গেল। তার পরে হাত মুখ ধুতে জল দিয়ে কিছু খাবার দিল। অঘোরনাথ যখন একটু সুস্থ হয়ে বস্‌লেন, তখন বাড়ীর পুরুষ মানুষগুলি যেন কোথায় গেল।

একটু পরেই অঘোরনাথের কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হ'ল। অঘোরনাথ ত অবাক্! আলাপ পরিচয় নেই, তবুও স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছে আস্‌তে লজ্জাবোধ কর্‌ল না! স্ত্রীলোকটি খুব ভাল, আর তার বড় দয়া। তাই সে সাহসের সহিত অঘোরনাথকে বল্লে—

"ওগো বাবু, তুমি এ কোথায় এসেছ? এ যে ডাকাতের বাড়ী। পুরুষমানুষগুলি সবাই যে ডাকাতি করে। তারা বিদেশী লোক পেলেই, তাকে কেটে কুটে সর্ব্বস্ব লুটপাট করে লয়। ডাকাতেরা যে তাদের দলের লোকদের ডাক্‌তে গেল, তুমি এখুনি দৌড়ে পালিয়ে যাও। নইলে আর তোমার রক্ষা নেই; মানুষগুলি এসেই তোমায় মেরে ফেল্‌বে।"

ভয়ে অঘোরনাথের প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো। তিনি ঈশ্বরের নাম করে তখনি ছুটে রাস্তায় এসে পড়্‌লেন। ভাগ্যে সে দিন নেকমর্দ্দনের মেলা ছিল, তাই মেলার লোক দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নচেৎ রাত্রে এই ডাকাতের গ্রামের কাছ দিয়ে কেই বা চল্‌তে সাহস পায়? ডাকাতেরা তাদের শিকার পালাতে দেখে, লাঠি, খাঁড়া নিয়ে "মার মার" করে যখন তাড়া কর্‌ল, অঘোরনাথ তখন রাস্তার যাত্রীদলের সঙ্গে মিশে পড়্‌লেন। ডাকাতেরা যাত্রীর দলে পড়ে ডাকাতি কর্‌তে আর সাহস পেলে না। অঘোরনাথ যে ঈশ্বরের ভক্ত, এ যেন সেই ঈশ্বরই তাঁকে রক্ষা কর্‌লেন।

আর একবার অঘোরনাথ মতিহারি হতে ছাপরা যাচ্ছিলেন। ছাপরার আঠার মাইল দূরেই ইস্‌বাপুর গ্রাম। ঐ গাঁয়ে যে ডাকাতের মস্তমড় এক আড্ডা, অঘোরনাথ সে কথা মোটেই জান্‌তেন না। কেমন করেই বা জান্‌বেন? তিনি যে বিদেশী লোক। এবার কিন্তু তিনি সাম্পেনি গাড়ীতে ছাপ্‌রা যাচ্ছিলেন। গাড়ীখানা ডাকাতের গাঁয়ের কাছে যেতেই সন্ধ্যা হ'ল। অথচ গাড়োয়ান রাত্রে আর গাড়ী চালাতে রাজি হ'ল না। সে ঐ গাঁয়েরই ছোট একটি হাটে গাড়ী রাখিল। দিনের বেলায় ঐ হাটে অনেকগুলি দোকানদার এসে জিনিষপত্র বিক্রি করেছিল, সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলেই দোকান তুলে যে যার ঘরে চলে গেল। একখানি তাড়ি ও একখানি মদের দোকান ছিল, সেই দুখানি দোকানেই কয়েকজন মানুষ তাড়ি মদ খেয়ে ফুর্ত্তি কর্‌ছিল। কাজেই অঘোরনাথের মনের ভিতরে বড় ভয় হ'ল। তিনি ভাবলেন, এখানে যে চোর-ডাকাত নাই, তা কে বল্‌বে? তিনি গাড়ীতে বসে ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

রাত্রি যখন দশটা, তখন তিনি দেখ্‌লেন, গাড়ীর কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে তিনটি লোক বসে কি পরামর্শ কর্‌ছে। তাঁর মনে কতই আশঙ্কা হতে লাগ্‌লো। তিনি আপনার মনকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য ভাব্‌লেন, আমি চোর-ডাকাতের কল্পনা করে মিথ্যা কেন ভয় পাচ্ছি? ওরা হয় ত এই হাটেরই মানুষ হবে। অঘোরনাথ কিছু জল-খাবার খেয়ে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু চোখে ঘুম কোথায়? কেমন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁর বুক দুড় দুড় কর্‌তে লাগ্‌ল। তিনি উপাসনায় ডুবে থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। অবশেষে রাত্রি দুটোর সময় ডাকাতে হাঁক উঠ্‌লো; তা শুনে দশ বারটা মানুষ ডাকাতে হাঁক দিতে দিতে তাড়ির দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালো। তাদের সেই হাঁক শুন্‌লে যথার্থই পেটের পীলে চম্‌কে যায়। তার পরেই একটা গোলমাল হতে লাগ্‌লো; কেউ গালাগালি দিচ্ছে, কেউ লাঠি নিয়ে আস্ফালন কর্‌ছে; কেউ হিন্দী ভাষায়

বল্ছে "হাম একেলা এক লাঠিসে শির তোড় দেঙ্গে," অর্থাৎ আমি একেলা এক লাঠিতে মানুষটিকে মেরে ফেল্‌ব। একজন বল্লে,"বস্ আবি লোট"—অর্থাৎ আর দেরি কেন,এখনি মানুষটিকে মেরে ফেল। আর একজন বল্লে—"হাঁ, আউর ক্যা! আবি লোট।" ডাকাতদের কথা শুনে অঘোরনাথের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌ল। তিনি একবার মনে কর্‌লেন চীৎকার কর্‌বেন, কিন্তু তাতে আর ফল কি? তাঁর চীৎকার শুনে কে তাঁকে রক্ষা কর্‌তে আস্‌বে? সকলেরই ত ডাকাতের ভয় আছে। অঘোরনাথ আপনাকে বিপন্ন মনে করে ঈশ্বরকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। সেই সময়ে যমদূতের মতন প্রকাণ্ড জোয়ান চারিজন লোক লাঠি নিয়ে অঘোরনাথের গাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তিনি ডাকাতদের বল্লেন, "আমি চাক্‌রী করি না, শুধুই ঈশ্বরের নাম করে আর তাঁর ভজন গেয়ে বেড়াই। আমার কাছে টাকাকড়ি অতি অল্পই আছে; যা কিছু আছে সব তোমরা নিয়ে যাও।"

অঘোরনাথ এই কথা বলেই তুলসীদাসের একটি ভজন গাইতে লাগলেন। ভজনটি এই—

"তু দয়াল, দীন হোঁ, তু দানী, হোঁ ভিখারী।"

এই গান শুনে ডাকাতদের একটি লোক বল্লে—"আরে উয়ো ভকত্ হ্যায়।" ওরে তোরা কাকে মেরে ফেল্‌তে চাচ্ছিস? এ যে ঈশ্বরের ভক্ত।

ভক্তের প্রতি এই ডাকাতদের আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা! তারা কত পরিশ্রম করে ডাকাতি কর্‌তে এসেছিল, কিন্তু অঘোরনাথ ধার্ম্মিক ও ভক্ত বলে তারা তাঁকে হত্যা ত কর্‌লই না, তাঁর একটি টাকা, একটি জিনিষ স্পর্শও না করেই, যে যার ঘরে চলে গেল। যেন ঈশ্বরই করুণা করে তাঁর ভক্ত সন্তানকে ডাকাতদের হাত হতে রক্ষা কর্‌লেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

সোনার আলো

(কবিতা)

সোনার আলো লাগিল ভালো
আজ আমাদের চোখে,
পরম সুখে মোদের বুকে
নিয়েচি দিব্যলোকে।
আকাশ পানে ধরণী হানে
তৃষিত চোখ আজি,
দূরের বনে করুণ স্বনে
বাঁশি যে উঠে বাজি' !
আমরা সবে এসেচি ভবে
সবে দুদিন, তাই
মোদের চোখে এই আলোকে
কোনও ছায়া নাই !

ভাদ্রের নদী উছলে যদি,
সেই ভরা নদীতে
সবায় নিয়ে সাঁতার দিয়ে
হরষ জাগে চিতে !
শারদ মাঠে মোদেরি বাটে
রাখাল গরু রাখে
বাঁশির ডাকে খোঁজে সে কা'কে
জানি না কারে ডাকে !
কার্ত্তিক এলে খেলাও ফেলে
বসে' থাক্‌তে চাই
অগ্রাণে হায় বেলা যে যায়
শীঘ্র, সময় নাই !

বৈশাখ মাসে ঝড় যে আসে
আম কুড়োনোর বেলা !
জ্যৈষ্ঠের রাতে সাথীর সাথে
হবে যে ঘরের খেলা !
আষাঢ়ে যবে গভীর রবে
বৃষ্টি নেমে আসে—
আমরা ছুটি, সবাই জুটি'
ভিজে মাঠের ঘাসে !
শ্রাবণে ধরা আঁধার, মোরা
উধাও হয়ে যাই—
ভেলায় উঠে যাই যে ছুটে'—
যাই কোথা ঠিক নাই !

শীতের দিনে রৌদ্র বিনে
কেমন করে থাকি !
মাঘের শেষে কোকিল এসে
লয় মোদেরে ডাকি' !
ফাগুনে কে যে আসেরে সেজে—
নতুন পাতা গাছে !
তখন কি আর ঘরে থাকার
জো আমাদের আছে ?
পাপিয়া ডাকে, খোঁজে সে কা'কে
এসে মোদের ঠাঁই—
খেলা যে তবে আবার হবে
আর তো দেরী নাই !

চৈতী দুপুর . করুণ সুর
ঘুঘুর গানে ফুটে !
মোরা সে ক্ষণে ঘরের কোণে
রহি না, যাই ছুটে' !
গাছের ছায়ে বাঁশি বাজায়ে—
বাজায়ে বাঁশের বাঁশি
খেলার সাথী আসন পাতি
মাটিতে ফুটায় হাসি !
এম্‌নি করে' বছর ভ'রে
আমরা যে সুখ পাই
তা'তেই বাঁচি খেলি ও নাচি—
আর কিছু কাজ নাই !

সোনার আলো বেসেচি ভালো
আমরা এ প্রাণ ভরি'—
ঘরের মাঝে কাজে, অকাজে
রেখো না মোরে ধরি' !
"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে"—
তখন বুঝি মায়েরে খুঁজি
ঘুমাতু কোলে এসে !
বর্গী যদি এল আবার,
ঘুমোবো না রে ভাই !
এক নিমেষে করব সাবাড়,
ছাড়াছাড়ি নাই !

শ্রীবসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আম্রফল

ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, হে অমৃত ফল,
তোমার পরশ পেলে পরে জিহ্বায় আসে জল।
প্রথম যখন মুকুলিত হও তুমি গাছে,
তোমার গন্ধে খোকা-খুকু আনন্দেতে নাচে।
গুটি ধরলে ছুট্‌ দেয় ছোট খোকা খুকী,
আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মারে উঁকি ঝুঁকি।
কচি আঁবের টক খেয়ে কতই খুশী তায়,
অল্পে স্বল্পে সাধ মিটে না আরো খেতে চায় !
কাঁচা আমের আচার অতি উপাদেয় খাদ্য,
খেতে আরম্ভিলে থামায় কার বাপের সাধ্য ?
পক্ক আম পেলে শিশু নাছোড়বান্দা অতি,
একটী দু'টী দিয়ে মার নাহি অব্যাহতি।

মধু রসের আস্বাদনে মন মজেছে তার,
'দেওনা' বলে মায়ের কাছে করছে সে আব্দার
ফল-শ্রেষ্ঠ বলি আম সাধে কি তোমায়,
সেবার প্রধান উপচার তুমি পেট পূজায় !
রসনার তৃপ্তিকর এমন কিছু নাই,
শত মুখে তোমার গুণ বলি হারি যাই !
জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী-উপলক্ষ তুমি,
তোমার গুণে ধন্য আজ ধরায় বঙ্গভূমি !
খোকা-খুকুর মনের সাধ মিটাও তাই আম,
সুখ-তরঙ্গে ভাসে তারা শুনলে তোমার নাম !
'বৃদ্ধ' যেন বাদ না পড়ে চুষতে তোমার আঁঠি,
ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি রসের মধ্যে খাঁটি !

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

বার্ষিক মূল্য ২৲
প্রতি সংখ্যা ৵০
মুকুল
দ্বিতীয় বর্ষ]
ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৬
[১১শ ও ১২শ সংখ্যা
বালকবালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা
শ্রীশকুন্তলা দেবী, এম-এ
সম্পাদিত।
BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE
14. JUNE 1930
ডোয়ার্কিনের
ফোল্ডিং অর্গ্যান
আজ ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া সঙ্গীতপ্রিয় ও মার্জ্জিত রুচি বাঙ্গালীর ঘরে আদর পাইয়া আসিতেছে। গুরুগম্ভীর অথচ সুকোমল স্বর সঙ্গীতের প্রাণসঞ্চারকারী এবং গৃহেরও গৌরব।
৪ অক্টেভ ২ সেট রীড -১৮০৲
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা
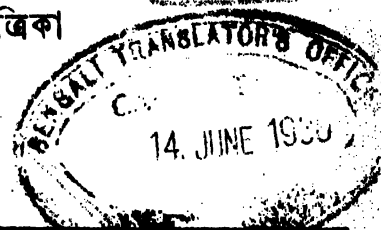
বিষয়-সূচী

ফাল্গুন ও চৈত্র —১৩৩৬

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের প্রথম দিনেই বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া মাসের দশ তারিখের মধ্যে সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাও প্রকাশিত হইবে।

৪। লেখাগুলি মনোনীত না হইলে ফেরৎ পাঠান যাইবে; কিন্তু তজ্জন্য লেখক-লেখিকাদের পূর্ব্বেই ডাকটিকিট পাঠান দরকার।

৫। বিজ্ঞাপনের হার ঃ—সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা; ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা তিন টাকা; সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৷০; ঐ ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা আট টাকা, ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা পাঁচ টাকা।

২য় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৬ [১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন

অলিকুল গুন্ গুন্
কোন্ গান গায় রে ?
শোন্ শোন্ আয় তোরা
ঘর ছাড়ি' আয় রে !
ধরণীর আঙিনায়
লতাগুলি শিহরায়,
ওই ছাখ বয় বুঝি
দক্ষিণ বায় রে !

কাননের কুন্তলে
ফুলহার দোলে রে !
তাই বুঝি মধুপেরা
সব কাজ ভোলে রে !
খোকাখুকু পুঁথি তোল্
বাহিরেতে কলরোল,
ফাল্গুন-উৎসব—
চন্দ্র যে ভায় রে !

শ্রীরথীন্দ্রনাথ সমাদ্দার !

মন্টি-ক্রীষ্টো

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এমেলিয়া জাহাজ লেগহরণ বন্দরে বেশী দিন থাকিল না। এক সপ্তাহ যাইতে-না-যাইতে জাহাজখানি মসলিন, তূলা, বারুদ, তামাক প্রভৃতি মালে বোঝাই হইয়া গেল। লেগহরণ বন্দরে সবাই অবাধে বাণিজ্য করিতে পারে—সেজন্য সেখানে কোন শুল্ক লাগে না। এমেলিয়া জাহাজের নাবিকদেরও কোন শুল্ক দিতে হইল না। কিন্তু ফরাসী দেশের যে বন্দরে মালগুলি নামাইয়া দিবার কথা সেখানে বিদেশী জাহাজ বাণিজ্য করিতে আসিলেই শুল্ক দিতে হয়। এমেলিয়া জাহাজ বিদেশী—উহা ঐ বন্দরে গেলে শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু ঐ শুল্ক যাহাতে না দিতে হয় সেজন্য উহারা এক উপায় বাহির করিয়াছে। এমেলিয়া জাহাজের নাবিকেরা মালগুলি কর্সিকাদ্বীপে উপস্থিত করিবে—সেখানে একটা ফরাসী জাহাজ তাহাদের অপেক্ষায় আছে। মালগুলি সেই জাহাজে উঠাইয়া দিলে তাহারা সেগুলি ফরাসী বন্দরে নামাইয়া দিবে। এইরূপে ইহাদের ব্যবসা চলে।

সন্ধ্যার সময় তাহারা লেগহরণ হইতে রওনা হইল। পরদিন-সকালে ক্যাপ্টেন ডেকে আসিয়া দেখিল এডমণ্ড তাহার আগেই ডেকে আসিয়াছে, ও খুব আশ্চর্য্য হইয়া দূরে সমুদ্রের মধ্যে যে পাহাড়ে-দ্বীপটা আছে, সেটির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ফ্যারিয়ার মুখে যে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের গল্প শুনিয়াছে ও যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছে—এডমণ্ড সেই দ্বীপটি দেখিতেছিল। সে জানিত ঐ দ্বীপে পৌছিতে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। গ্রীষ্মের শান্ত সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আধ ঘণ্টা সাঁতার কাটিলেই সেখানে পৌঁছিবে।

কিন্তু সেখানে গিয়া সে কি করিবে? বিনা অস্ত্রে, বিনা আহারে সে কিছুই করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আসিবারও একটা উপায় করিতে হইবে ত? জাহাজ থেকে হঠাৎ সরিয়া পড়িলে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য সবাই বা কি ভাবিবে? তার পরে সেখানে যদি কোন অর্থেরই সন্ধান না পাওয়া যায়? সবই যদি ফ্যারিয়ার মন-গড়া গল্প হয়? এইরূপ নানা চিন্তা তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। আবার মনে হইল ফ্যারিয়া কার্ডিনালের উইল দেখাইয়াছে—মিথ্যা কখনই হইতে পারে না। উইলটা ঠিক মনে আছে কি না জানিবার জন্য একবার মুখস্থ বলিয়া ঝালাইয়া লইল। যতক্ষণ সেই দ্বীপটা দেখা গেল—সে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল।

পরদিন কর্সিকার উপকূল দেখা গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা এদিক ওদিক ঘুরিয়া কাটাইল, জাহাজ তীরে ভিড়াইল না। অন্ধকার হইলে তীরে এক জায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তখন জাহাজ তীরে লাগাইবার হুকুম হইল। ঐ আগুন হচ্ছে তীরে মাল নামাইবার সঙ্কেত। জাহাজের লোকেরাও মাস্তুলে একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া বুঝাইয়া দিল তাহারা সঙ্কেত বুঝিয়াছে।

সমস্ত কাজ বেশ ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। চারিখানি ছোট ডিঙ্গী জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। সকলে এত শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করিতে লাগিল যে, রাত্রি দুইটার মধ্যে সমস্ত মাল তীরে পৌঁছিল। তার পরে ক্যাপ্টেনের লাভের টাকা সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল।

এইখানেই সব শেষ হইল না। তাহারা আরও মাল বোঝাই করিয়া লইবার জন্য তখনই সার্ডিনিয়ার পথে রওনা হইল। সমস্ত কাজই বিনা বিপত্তিতে হইল, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে যিনি শুল্ক আদায় করেন তিনি দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কবল হইতে পলাইতে গিয়া ছোট একটি দাঙ্গা হইয়া গেল। তাহাতে এডমণ্ড ও আর একজন নাবিক আহত হইল। যাহা হউক, জাহাজ নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলে জ্যাকোপো এডমণ্ডের ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহা বিশেষ গুরুতর নয়। জ্যাকোপোর সেবায় সে শীঘ্রই সুস্থ হইল।

এডমণ্ড ও জ্যাকোপোর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হইল। যখন বিশেষ কোন কাজের তাড়া থাকিত না, তখন সে জ্যাকোপোকে নানা বিষয় শিক্ষা দিত। জ্যাকোপো খুব আগ্রহের সহিত তাহা মন দিয়া শুনিত। অল্পদিনের মধ্যেই সে কি করিয়া মাটি তৈরী হয়, কি করিয়া কম্পাস দেখিতে হয়, কি করিয়া নক্ষত্র চেনা যায় এরূপ নানা বিষয় শিখিয়া ফেলিল।

দুই মাস চলিয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে যাইবার কোনো উপায় ঠিক হইল না। এডমণ্ড চুপ করিয়াছিল না—নানা রকম মতলব আঁটিতে লাগিল। শেষে ঠিক করিল, তিন মাস উত্তীর্ণ হইলেই একখানি ছোট জাহাজ কিনিয়া মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের দিকে কোনো ফিকিরে রওনা হইবে। তাহার লাভের অংশে সে যে টাকা পাইয়াছে তাহাতেই তাহা হইবে। একবার সেখানে পৌঁছিতে পারিলেই আর সব ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু সঙ্গে যে নাবিকেরা থাকিবে তাহাদের চোখে কি করিয়া ধূলা দেওয়া যাইবে তাহাই হইল ভাবিবার কথা।

তাহার মাথায় যখন এইরূপ নানা চিন্তা ঘুরিতেছে সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাপ্টেন তাহাকে নাবিকদের এক আড্ডায় কতকগুলি দর কারী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য লইয়া গেল।

সেখানে গিয়া সে দেখিল যে, আলোচনার বিষয় হচ্ছে কতকগুলি দামী কার্পেট, সিল্ক, আব কাশ্মিরী শাল কি করিয়া ফরাসী দেশে চালান করা যায়। কোন্ জায়গা থেকে মালগুলি পাঠালে বন্দরের কর্ত্তাদের চোখে পড়িবার ভয় থাকে না তাহাই বিবেচনার বিষয়। অনেকে অনেক জায়গার নাম করিল, কিন্তু কোনটাই সুবিধাজনক মনে হইল না। শেষে একজন বলিল "মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে লোকজনের বসবাস নাই, সেখানে পুলিশ কিংবা শুল্ক আদায় করবার জন্য কর্ম্মচারীও নাই, সেই জায়গাটা সব চেয়ে সুবিধার।"

এডমণ্ড খুব আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতেছিল, মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের নাম হইতেই তাহার বুক দুলিয়া উঠিল। কোনো রকমে মনের উদ্বেগ বাহিরে প্রকাশ করিল না। ক্যাপ্টেন যখন তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল তখন শান্তভাবে উত্তর করিল, "মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান।" তখন ঠিক হইল পরদিন তাহাদের জাহাজ মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের দিকে রওনা হইবে; দিন ও আকাশ পরিষ্কার থাকিলে তার পর দিন তাহারা সেখানে পৌঁছিবে। তার পরে সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

ভাই-বোন

শীতের শেষ। এখন আর সন্ধ্যা হইতে না হইতেই চাদর গায় দিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। সন্ধ্যার শান্ত শীতল বাতাস কেমন দেহ এবং মনকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল করে। শীতের জড়তা দূর হইয়াছে; আকাশে বাতাসে নূতন খেলা চলিয়াছে। আজ আকাশ সুন্দর—বাতাস সুন্দর, বাগানের গাছগুলি সুন্দর—মানুষের মনও সুন্দর। সুন্দর সকল স্থানে। বেণু ও রেণুর মন তাই পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে।

আজ রেণুর জন্মদিন। তাই পড়া বন্ধ। রেণুর সমস্ত দিন আজ অবসরই ছিল না। সকলের আদরে,স্নেহে, ভালবাসায় সে যেন ডুবিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে দুই ভাই-বোন ছাদে আসিয়া বসিল। রেণু বলিল—"দাদা, আমরা একটুও আজ ঝগড়া করিব না, কেমন?"

বেণু বোনের হাতের আঙ্গুলগুলি ধরিয়া বলিল, "হাঁ ভাই, আজ আমাদের কিছু বিবাদ নাই। আজ ত মা চন্দ্র সূর্য্যের কথা বলবেন। সত্যি ভাই, দেখ চাঁদ কি সুন্দর। যেন কত হাসছে আর আমাদের কি বলতে চায়!"

"হাঁ দাদা, যারা সেখানে থাকে তারা খুব সুখী, না? পরীরা বোধ হয় ঐখানেই থাকে! তাইত তারাও এত সুন্দর!"

বেণু বলিল, "ঐ ত মা আসছেন। এখনি সব বলবেন।"

মা আসিয়া মাদুরের উপর বসিলেন। দুই ভাই-বোনে মায়ের দুই দিকে বসিল। সুন্দর সন্ধ্যার সুন্দর বাতাস সুন্দর রেণুর সুন্দর চুলগুলির সাথে খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। চুলগুলি আনন্দে ছোটাছুটি করিয়া রেণুর মুখে চোখে আসিয়া পড়িতেছে। রেণু মাকে বলিল, "দেখ না মা, চুলগুলো আজ কি দুষ্টু হয়েছে! কেবল আমার মুখে আসে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আজ তোমার জন্মদিন কিনা, তাই ওদেরও আনন্দ হয়েছে।"

বেণু বলিল, "আজ কিন্তু গ্রহণ সম্বন্ধে তোমার বলবার কথা আছে মা, মনে আছে ত? সেদিন ত বললেই না।"

মা বলিলেন, "দেখছ ত, আজ কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে!"

মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া রেণু মধুর আলস ভরে' নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হাঁ মা, চাঁদ রোজই কেন এমন সুন্দর হয় না? এক এক দিনই ত এত বড় হয়! আবার মাঝে মাঝে একেবারেই থাকে না। কেন মা এমন হয়?"

"তোমাদের মনে আছে ত যে পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে? আর রাত দিন কি করে হয়?"

বেণু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ—"

মা, রেণুর মাথায় ক্ষুদ্র একটী আঘাত করিয়া বলিলেন, "কিরে, তুই বুঝি ভুলে গিয়েছিস?"

না উঠিয়াই সে বলিল, "না মা, আমি একটুও ভুলিনি।"

"সূর্য্যের চারধারে পৃথিবী যেমন অনবরত ঘুরছে, সেই রকম আবার পৃথিবীর চার-

ধারে চাঁদ ঘুরছে। পৃথিবীর যেমন ঘোরার একটা পথ আছে, চাঁদেরও সেইরকম একটি পথ আছে। সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে রেখেছে, পথ ছাড়া অন্য দিকে নড়বার তার ক্ষমতা নাই, পৃথিবীও সেই রকম তার অদ্ভুত শক্তি দিয়ে চাঁদকে আকর্ষণ করে রেখেছে, পথ ছাড়া সে অন্য দিকে একটুও নড়তে পারে না।" কেমন বুঝছ ত?

বেণু বলিল, "হাঁ মা।"

মা বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, এখন বুঝতে পারছ চাঁদের পথ পৃথিবীর পথকে দু-জায়গায় কেটেছে। তবেই দেখ, চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয় এক সময় পৃথিবী আর সূর্য্যের মাঝখানে আসবে। সে যখন এই রকম জায়গায় আসে তখন সূর্য্যের দিকটাতেই আলো পড়ে, আর আমাদের দিকটা থাকে অন্ধকার। সে দিন আর আমরা আকাশে চাঁদ দেখতে পাই না। সে রাতকে বলি অমাবস্যা।"

বেণু বলিল, "কেন মা—সূর্য্যের আলো একদিকে পড়লে অপর দিকে আমরা দেখতে পাই না?"

"ও বলতে ভুলেছি যে, চাঁদকে যে আমরা এত সুন্দর দেখি বাস্তবিক কিন্তু সে সুন্দর নয়। আর তার আলো যে এত স্নিগ্ধ বলি—আসলে তার আলোই নাই। পণ্ডিতরা বলেন—আমাদের পৃথিবীতে যেমন পাহাড় আছে চাঁদেও সেই রকম পাহাড় আছে; তবে সেগুলি খুব বড় বড়। আর চাঁদ দিন-রাতই পৃথিবীর উপর থাকে, কিন্তু দিনের বেলা সূর্য্যের আলোর জন্য দিনের বেশীর ভাগ সময়ই দেখতে পাই না। যে আলো আমরা চাঁদ হতে পাই সে তা পায় সূর্য্যের কাছে।

বেণু বলিল, "কিন্তু মা এমন ছোট বড় হয় কেন?"

"হাঁ, চাঁদ যেমন সেই স্থান হ'তে একটু চলতে থাকে সূর্য্যও তেমনি তার এক পাশে কিরণ দিতে থাকে। চাঁদের ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য তার উপর বেশী কিরণ দিতে পারে। তাই ক্রমশ লম্বায় ও চওড়ায় বড় দেখায়। এখন, পৃথিবীর এই চারদিকে ঘুরতে চাঁদের সময় লাগে প্রায় আটাশ দিন। তা'হলেই অর্দ্ধেকখানি রাস্তা আসতে কত সময় লাগবে?"

বেণু তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, "কেন চৌদ্দ দিন! মা, রেণু এখনও অঙ্ক শেখেনি!"

রেণুর মুখের চুমা লইয়া মা বলিলেন, "এও সব শিখবে। আচ্ছা দেখ, এই চৌদ্দ দিন পরে চাঁদ আসবে ঠিক সূর্য্যের সামনাসামনি। কাজেই তার যে দিকটা আমাদের দিকে থাকে, তার সবটাই আলোকময় হয়ে ওঠে, আর আমরা এতবড় একটি সুন্দর চাঁদ দেখি।"

রেণু বলিল, "যেমন আজ, না—মা?"

বেণু বলিল, "হাঁ মা, সূর্য্য আর চাঁদ ত সমান? একটু যদি সূর্য্য বড় হয়!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দূরের জিনিষ যে ছোট দেখায় তা' জানত?"

বেণু উত্তর করিল, "হাঁ।"

"সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হ'তে অনেক দূরে আছে, আর চাঁদ আছে নিকটে। চাঁদ আমাদের যত কাছে আছে তার প্রায় সাড়ে তিনশ গুণ দূরে আছে সূর্য্য। সেইজন্যই দু-জনকে প্রায় সমান দেখি। সত্যই কিন্তু তা নয়। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর অপেক্ষাও ছোট। সূর্য্য ত পৃথিবীর অপেক্ষা কত হাজার গুণ বড়; আবার চাঁদ পৃথিবীর প্রায় আশী ভাগের এক ভাগ।

এখন বোঝ কে কত বড়! এখন যা' বলছিলাম তাই শোন। কাল হতে আবার চাঁদ ছোট হবে। তার কারণ, ঐ আগের মতই যেমন একটু একটু চলতে থাকবে তেমনি এক পাশ আলো পাবে না। এই ভাবে ক্রমে ছোট হ'তে হ'তে আবার একদিন তাকে আকাশে হাজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

রেণু উঠিয়া বলিল, "সেই মা, তুমি বলেছিলে, লোকে মনে করে রাক্ষসে সূর্য্যকে খেয়ে ফেলে, তাই তারা চান করে; কিন্তু সে তাদের মিছে কথা। আজ কিন্তু মা, বলতে হ'বে, কেন গ্রহণ হয়।"

তাহার মাথাটি দোলা দিয়া মা বলিলেন, "হাঁরে পাগলী, সব বলবো। কতদিনে একবৎসর হয় জান?"

রেণু বলিল, "৩৬৫ দিনে।"

মা বলিলেন, "কেন জান? সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবীর ঘুরতে প্রায় ৩৬৫ দিন লাগে। আগেই ত শুনলে যে, পৃথিবীর রাস্তা আর চাঁদের রাস্তায় দু'জায়গায় কাটাকাটি হয়েছে। এখন পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে যখন ঐ দু-জায়গার মধ্যে আসে আর চাঁদও ঠিক সেই সময় ঐখানে আসে তা হলেই চাঁদ সূর্য্য আর পৃথিবী এক লাইনে হল না?"

রেণু বলিল, "হাঁ।"

"পৃথিবী যদি চাঁদ আর সূর্য্যের মাঝখানে থাকে তবে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়বে। কিন্তু পূর্ণিমার দিন ছাড়া এ রকম ঘটনা হ'তে পারে না। আবার পূর্ণিমার রাত্রে কোনো সময়ে চাঁদ দেখতে না পেলে লোকে ত ভাববেই একটা কিছু হয়েছে। এই হ'ল চন্দ্র গ্রহণ। এ দিনও রাত্রে—তা' শীতই হোক্ আর গ্রীষ্মই হোক্—ঐ সব লোকে চান করে। এখন শোন সূর্য্যগ্রহণের কথা। চাঁদ ত ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সূর্য্য আর পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আসবেই? তা' হলেই তিন জনে এক লাইনেই থাকবে। তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে। যে সব স্থানে এই ছায়া পড়ে সেই সব স্থানের লোকেরা কখনও বা সূর্য্যের কতকটা আবার কখনও বা সবটাই দেখতে পায় না। কিন্তু এমনি নিয়ম যে, অমাবস্যার দিন ভিন্ন সূর্য্যগ্রহণ হ'তেই পারে না।"

রেণু বলিল, "মা, গঙ্গায় চান করলেই পাপ চলে যায়?"

মা বলিলেন, "তা কি আর যায় মা? তা' হলে ত চুরি করে', অন্যায় করে' একবার গঙ্গায় চান করে এলেই হলো!"

রেণু আবার বলিল, "তুমি ত মা বলেছিলে কোনো জীব মারতে নাই! সেদিন আমি না জেনে একটা পিঁপড়ে মেরে ছিলাম—আমার কত কষ্ট হলো মা!"

মা তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ মা, এতেই পাপ যায়। কেহ যদি না জেনে কোন অন্যায় কাজ করে—আর তার জন্য মনে কষ্ট পায় এবং প্রতীজ্ঞা করে যে, আর কখনো এমন কাজ করবে না তা' হলেই ভগবান তাকে ক্ষমা করেন।"

রেণু বলিল, "আমি আর মা কোন খারাপ কাজ করবো না।"

তাহার ছোট মুখটি চুমায় চুমায় ভরিয়া দিয়া মা বলিলেন, "তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে।"

রেণু মায়ের কথা শুনিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "হাঁ মা, এত সব নিয়ম কে করলে?"

মা তাহাকেও বুকে টানিয়া বলিলেন, "সবই ভগবানের কাজ বাবা। তিনি আমাদের জন্য কত করেছেন। বড় হ'লে আরও কত বুঝতে পারবে। কাল তোমরা যে গানটী শিখলে—দু-ভাই বোনে সেই গানটী গাও ত!"

রেণু বলিল, "তোমার ভাল লাগে মা? আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। তোমার কথা হয়ে গেলে, আমরা রোজ তোমায় এই গান গেয়ে শোনাব। কেমন মা?"

মা বলিলেন, "বেশ মা, রোজ আমি তোমাদের গান শুনবো।"

শান্ত সন্ধ্যায় রেণু-বেণুর শান্ত কণ্ঠের সুমধুর সুর স্নিগ্ধ হাওয়ার তালে তালে ভাসিয়া গেল। মাথার উপর চাঁদ কেমন হাসিতেছে, তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। দুই ভাই-বোনে তখন গাহিতেছে—

"বল দেখি ভাই, এমন ক'রে
ভুবন কেবা গড়িল রে,
গগন ভ'রে তারার মাণিক
ছড়ায়ে কে রাখিল রে!
উজল উষায় আলোর খেলা,
তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী
হেরে নয়ন ভুলিল রে!
শীতল পবন বহে ধীরে,
দোলা দিয়ে নদী-নীরে,
দুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে,
সুবাস নিয়ে যায় গো হ'রে!
সুধায়, সুখে, শোভায়, সুরে,
কে রাখিল ভুবন জুড়ে!
এমন দয়াল বল কে ভাই,
দেহ জীবন যে দিল রে?
দয়াল আমায় দয়া করে,
ধরায় জীবন দিলেন মোরে,
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল,
গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার ত নাই তুলনা রে,
দয়ালকে ভাই ভু'ল না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো,—
দয়াল বল বদন ভ'রে॥"

শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু

ধর্ম্মযাজক

(ভিক্টর হিউগোর একটী চিত্র)

(১)

মসিয়েঁা চার্লস্ ফ্রানকো'য় বিয়েনভান্যু মিরিয়েল ফ্রান্সের "ডি" নগরের বিশপ। বয়স পঁচাত্তোর; বড় সদাশয় ও ধার্ম্মিক লোক। পরের দুঃখে সর্ব্বদাই তাঁর প্রাণ কাঁদতো। তিনি বৎসরে পনরো হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন পেতেন। এই আয়ের মাত্র এক হাজার ফ্রাঙ্ক নিজে রেখে অবশিষ্ট চৌদ্দ হাজার সাধারণের হিতার্থে খরচ কর্‌তেন। স্কুল, ডাক্তারখানা, মিশনের কাজ, গরীব-দুঃখীকে দান, দেনার দায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তির কারামুক্তির চেষ্টা ও তাদের পরিবারের ভরণপোষণ, কারাগারের উন্নতি, অল্প বেতনের শিক্ষকগণের সাহায্য ইত্যাদি নানা ভাবে তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহার হ'তো। সংসারে একটী ভগিনী ও একটী বৃদ্ধা চাক্‌রাণী ভিন্ন অপর কেহ ছিলেন না। বিশপের বাড়ীখানা অতি বৃহৎ—ঠিক যেন একখানা রাজপ্রাসাদ। অনেকগুলো বড় বড় ঘর—কোনটা বৈঠকখানা, কোনটা শয়নকক্ষ, কোনটা অতিথি-অভ্যাগতগণের বিশ্রামগৃহ এবং কোনটা বা ভোজনাগার রূপে ব্যবহৃত হতো। বাড়ীর চারিদিকে মনোহর উদ্যান ফল ও ফুলে সুশোভিত। উদ্যানটী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই সুবৃহৎ প্রাসাদের অতি নিকটেই বিশপের আর একখানা বাড়ী হাসপাতাল করা হয়েছে। বিয়েনভান্যু নূতন ধর্ম্মযাজকের পদ লাভ করে "ডি" নগরে আস্‌বার অব্যবহিত পরেই তিনি স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। একদিন হাসপাতালের ম্যানেজার তাঁর সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে বল্লেন, "দেখুন, আপনার হাসপাতালে এখন রোগীর সংখ্যা কত?"

"ছাব্বিশ।"

বিশপ বল্লেন, "আমিও তাই গ'ণে দেখেছি।"

ম্যানেজার বল্লেন, "খাটগুলো বড় ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে সাজান রয়েছে।"

"হাঁ, সেটাও আমি লক্ষ্য করেছি।"

রোগীদের থাক্‌বার ঘরগুলোও অতি সাধারণ রকমের: স্বচ্ছন্দ আলো-বাতাস খেল্‌তে পারে না।"

"ঠিক বলেছেন, আমারও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে।"

"যে সব রোগী ক্রমশঃ একটু সুস্থ হচ্ছে তাদের রোদ-হাওয়া খাবার পক্ষে বাগানখানাও বড় ছোট।"

"আমিও মনে মনে তাই ভাব্‌ছিলুম।"

"সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হ'লে শতাবধি রোগী কখন কখন এই হাসপাতালে আশ্রয় নেয়; তখন কি কর্ব্বো, কোথায় রাখবো তাদের, ভেবে ঠিক পাই না।"

"সে কথাও আমার মনে হ'য়েছিল।"

"মশাই, আমার অসুবিধার কথা সবই তো জান্‌লেন, এখন কি উপায় করা যায়?"

যে ঘরখানায় ব'সে বিশপ হাসপাতালের ম্যানেজারবাবুটীর সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন, তিনি তাহার চারদিক একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে

বল্লেন, "আচ্ছা বলুন তো, এই হলটায় কতখানা বিছানা হ'তে পারে?"

ম্যানেজার বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বলেন কি? আপনার এই ভোজন-ঘরে?"

বিয়েনভানু প্রথমে যেন আপন মনেই বল্লেন, "এ হলটায় বোধ হয় বিশখানা বিছানা হবে।" তারপর ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমার একটুখানি ভুল হয়েছে। আপনাদের পাঁচ ছয়টা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ছাব্বিশজন রোগী থাকে; এতবড় বাড়ীটায় আমরা মাত্র তিনটী প্রাণী বাস করি। এ বাড়ীতে অন্ততঃ ষাটজন রোগী থাক্‌তে পারে। আপনি আমার বাড়ীখানা নিন, আমি আপনার বাড়ীখানা নি আসুন, আমরা বাড়ী বদল করি।"

তৎপরদিবসেই হাসপাতালের রোগীদিগকে বিশপের প্রাসাদে আনা হ'ল এবং বিশপ তাঁর ভগিনী ও ঝিকে নিয়ে ওই ক্ষুদ্র বাড়ীখানিতে উঠে গেলেন।

(২)

জিন ভলজীন জেল-ফের্‌তা কয়েদী। জেল-খানা থেকে খালাস হয়ে সে সঙ্গে একখানা হল্‌দে কাগজ নিয়ে বেরুলো। তাতে লেখা ছিল — "এই লোকটা বড় ভয়ানক।" সে যে-সহরের ভিতর দিয়ে যেতো এই কাগজখানা সেই সহরের 'মেয়রকে' তার দেখাতে হতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা ভলজীন "ডি" নগরে প্রবেশ করলো। নগরের মেয়রকে কাগজ দেখিয়ে সে একটা হোটেলে গেল। হোটেলওয়ালা তার চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে সন্দেহ ক'রে তাকে হোটেল থেকে বের ক'রে দেয়। বেচারী সারাদিনে ছত্রিশ মাইল পথ হেঁটেছে, এ পর্য্যন্ত পেটে একবিন্দু খাবার পড়ে নাই। খিদেয় সে আর পথ চলতে পারে না। একান্ত নিরুপায় হ'য়ে নিকটে একজন কৃষকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। সহরে এই অল্প সময়ের ভেতরই ভলজীনের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে— কৃষকটী তাকে আশ্রয় দিতে সাহস পেলে না। হতভাগা কয়েদী নিরাশ হ'য়ে গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে একখানি পাথরের বেঞ্চে শুয়ে আপন অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলো। গির্জ্জা হ'তে এক বৃদ্ধা রমণী গৃহে ফির্‌ছিলেন, তিনি লোকটীকে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি ওখানে শুয়ে কেন?"

"কি কর্ব্বো? আমার কোথাও স্থান নেই।"

"হোটেলে চেষ্টা ক'রে দেখেছ কি?"

"হাঁ দেখেছি, সেখানে স্থানাভাব।"

মহিলাটী বিশপের বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন, "ওই বাড়ীতে একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।"

(৩)

রাত্রি আটটা বেজে গেছে। বিশপ বিয়েনভানু তাঁর শয়নকক্ষে বসে একখানা বই লিখ্‌ছিলেন। বৃদ্ধা ঝি আলমারী হ'তে রূপার কাঁটা চামচে নামিয়ে খাবার টেবিলে রেখে দিল। বিশপও বুঝ্‌তে পার্‌লেন খাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। তিনি বই লেখা বন্ধ ক'রে তাড়াতাড়ি খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন সবই প্রস্তুত। তাঁর ভগিনী তাঁর জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন। বিশপ আপন আসনে ব'সে শুন্‌লেন, আজ সহরে হৈ চৈ ব্যাপার, একজন ডাকাত এসেছে। সহরশুদ্ধ লোক ভয়ে জড়সড়। তাঁর ভগিনী বল্লেন, "তাঁদের বাড়ীর কোনো দরজাতেই তালা নেই, এরূপ ভাবে থাকাও তো নিরাপদ নয়!"

ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হলো।

বিশপ বল্লেন, "কে ? ভেতরে এস ।"

দরজা খুলে গেল। একটী নাতিদীর্ঘ সবল-কায় লোক ঘরে প্রবেশ করলো, চোখ দুটী তার ব'সে গেছে, মুখের দিকে তাকালেই ভয় হয়; মাথার চুলগুলি খাটো ক'রে ছাঁটা। বিশপের ভগিনী ও তাঁর ঝি ভয়ে আড়ষ্ট হলেন। এই লোকটীই হতভাগা ভলজীন ! !

বিশপ কিছু বল্‌বার আগেই ভলজীন তার নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বল্‌লো। আগন্তুকের কথা শেষ না হতেই বিশপ ঝিকে আর একখানা চেয়ার আন্‌তে বল্লেন।

লোকটী টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লো, "আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ না, আমি কি ভীষণ লোক ! ! এই দেখুন আমার ছাড়পত্র। আপনি পড়ে দেখতে পারেন"—এতে লেখা আছে "এই লোকটা বড় ভয়ানক।"

বিশপ তাঁর ঝিকে বল্লেন, "ম্যাগ্‌লিয়র, আর এক প্রস্থ কাঁটা চামচে নিয়ে এস, আর আমার শয়ন-ঘরের পাশের ঘরটীতে বিছানায় পরিষ্কার ধপ্‌ধপে চাদর পেতে রাখ।"

বিশপ লোকটীকে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে চেয়ারে বস্‌তে বল্লেন। ভলজীন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কেউ যে তার প্রতি এত সদয় হ'তে পারে সে যেন তা বিশ্বাসই করতে পাচ্ছিল না।

রূপার কাঁটা চামচে আনা হ'ল। অতিথির সম্মানের নিমিত্ত বিশপ রূপার বাতিদান জ্বেলে দিলেন। আহার শেষ হলে তিনি ভলজীনকে শয়ন-কক্ষে নিয়ে গিয়ে তার শয্যা দেখিয়ে দিলেন।

লোকটী বিশপের অমায়িক ব্যবহারে বড় বিস্মিত হয়েছিল। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে সে বলে উঠলো, "আপনি কি কচ্ছেন, তা কি ভেবে দেখেছেন ? আমি যে হত্যাকারী নই তাই বা আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?" বিশপ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এ সব বিষয় নিয়ে আমি নিজে মাথা ঘামাই না; এগুলো ভগবানকেই সমর্পণ ক'রে থাকি।" তারপর তিনি ভলজীনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁর নিজের শোবার ঘরে ফিরে গেলেন।

(৩)

রাত্রি দুটা—ভলজীন এতক্ষণ বেশ ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ জেগে গেল। একবার ঘুম ভাঙলে আর সহজে ঘুম আসে না। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যাও ঘুম না আসার একটা কারণ। প্রায় বিশ বৎসর সে কাষ্ঠ-শয্যায় ঘুমিয়েছে। এত আরাম কোথায় পাবে ? তাই ঘুম আসে না। অনেক চেষ্টা করলো ঘুমুতে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শুয়ে শুয়ে সে কেবলই ভাব্‌তে লাগলো। পাশের ঘরেই বিশপ ঘুমে অচেতন। তাঁর শয্যার কাছেই একটা আলমারীতে রূপার বাসনগুলো থাক্‌তো। আহারের পর যখন বৃদ্ধা ঝি ধুয়ে মুছে আলমারীতে বাসনগুলো রেখে দেয় তখন ভলজীন তা দেখেছিল। ভলজীনের বড় লোভ হ'লো। ধীরে ধীরে সে বিছানায় উঠে বসলো; অতি সন্তর্পণে জুতোজোড়া তার ঝুলির মধ্যে পূরে লাঠিগাছ হাতে নিয়ে জানালার দিকে অগ্রসর হলো। বিবেক ও লোভের মধ্যে অনেক-ক্ষণ ধ'রে বিবাদ চললো, কখনও বিবেক জেতে লোভ হারে; কখনও লোভ জেতে বিবেক হারে। অবশেষে লোভেরই জয় হ'ল। আকাশের চাঁদও ঠিক সেই সময়ে একবার হাস্‌ছে আর একবার মেঘের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছে। আলো ও আঁধারে বেশ লুকোচুরি খেলা ! ! ভলজীন

ধীর পদবিক্ষেপে বিশপের শয়ন-গৃহে গিয়ে দেখে দরজা আল্‌গা, চাঁদের কিরণ দেবতুল্য বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের মুখে পড়াতে তাঁর মুখ হ'তে একটা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই, যেন কত আনন্দ, কত আশা, কত করুণা এই মুখখানিতে। শুভ্র পক্ক কেশগুলোও যেন তাঁদের স্নিগ্ধ আলো স্পর্শে পবিত্র ও ধন্য হয়েছে!! ভলজীনের দেহ রোমাঞ্চিত হ'ল, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আস্তে আস্তে আলমারীর কাছে গিয়ে পকেট হ'তে একখানা ধারালো লোহার কাঁটা বের করে তালা ভাঙবে এমন সময়ে সে দেখ্‌তে পেলে যে, তালা আল্‌গাই আছে, চাবিটা তালার গায়ে রয়েছে। ভলজীন আলমারী হ'তে বাসনের ঝুড়িটা বের ক'রে নিয়ে জানালার কাছে গেল; সেখানে লাঠিগাছটা হাতে করে একলাফে জানালা দিয়ে বাগানে পড়লো এবং ঝুড়ি হতে রূপার জিনিষগুলো তার থলেয় ভরে ঝুড়িটা বাগানে ফেলেই প্রাচীর ডিঙিয়ে পালালো।

(৪)

প্রভাত হ'য়েছে। বিশপ উদ্যানে ভ্রমণ কচ্ছেন। এমন সময় ম্যাডাম ম্যাগলিয়র দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌তে লাগলো, "মসিয়ঁ, জানেন কি বাসনের ঝুড়িটা কোথায়?"

বিশপ উত্তর ক'র্‌লেন, "হাঁ জানি।"

"যা হোক্ ভগবানকে ধন্যবাদ। আমি তো এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হলেম।"

বিশপ ফুলের কেয়ারী হ'তে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বল্লেন, "এই নাও বাসনের ঝুড়ি।"

ম্যাগলিয়র চীৎকার ক'রে বল্লেন, "ঝুড়িটা খালি যে! রূপার জিনিষগুলো কই?"

বিশপ বল্লেন, "তুমি কেবল রূপার ভাবনাই ভাব্‌ছো! তা তো আমি বল্‌তে পরি না।"

ম্যাগলিয়র ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে দ্রুতপদে অতিথির শয়ন-ঘরে গিয়ে দেখে ভলজীন পালিয়েছে।

ঝুড়ির আঘাতে বাগানের একটা ফুল নষ্ট হয়েছিল, বিশপ মাথা হেঁট ক'রে তাই দেখ্‌ছিলেন।

ঝি ফিরে এসে জানালে ওই লোকটাই বাসন নিয়ে গেছে, ওই চোর।

বিশপ বল্লেন, "ম্যাগলিয়র, রূপার বাসনগুলো গরীবদের। ওগুলো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে ভাল করি নেই। গরীবের জিনিষ গরীবই নিয়েছে। তা বেশ ভালই হয়েছে। এখন থেকে আমাদের কাঠের কাঁটা চাম্‌চেতেই চল্‌বে। আর এক পেয়ালা দুধে এক টুকরো রুটী ভিজাতেই চামচেরই বা দরকার কি?" ভগিনী ব্যাপ্টিষ্টিন্ ও ঝি ম্যাগলিয়র নীরবে বিশপের বক্তৃতা শুনছেন্ এমন সময়ে বাইরে সদর দরজায় করাঘাত হ'ল। বিশপ বলে উঠলেন, "কে? ভেতরে আসুন।"

জিন ভলজীনকে নিয়ে তিনজন পুলিসের লোক ঘরে ঢুক্‌লো। ভলজীনের হাত বাঁধা। পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজন বিশপের একটু কাছে এসে অভিবাদন ক'রে বল্লে, "মসিয়ঁ"! বিশপ ভলজীনকে চিন্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বল্লেন, "একি ভলজীন যে! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড় আনন্দিত হলেম। আমি যে তোমাকে রূপার বাতিদান দুটাও দিয়েছি সেগুলো তুমি ফেলে গেছ কেন? ও দুটা জিনিষ বিক্রী করলে তোমার দু'শো ফ্রাঙ্ক হবে। সে দুটাও তোমাকে এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।"

ভলজীন বিশপের দিকে বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

পুলিশ-কর্ম্মচারী বল্লে, "মসিয়ঁ, আমাদেরই ভুল হয়েছে। লোকটা আমাদের কাছে বলেছিল বটে, আপনি তাকে এই রূপার জিনিষগুলো দিয়েছেন। আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস কর্‌তে পারি নেই, তাই সন্দেহের বশে তাকে আটক রেখেছি। এখন দেখ্‌ছি সে সত্যই বলেছে।" বিশপ বল্লেন, "হাঁ আপনাদেরই ভুল বটে, ওকে ছেড়ে দিন।" প্রহরিগণ ভলজীনের বাঁধন খুলে দিয়ে বিশপকে অভিবাদন ক'রে চলে গেল।

বিশপ রূপার বাতিদান তুটা এনে ভলজীনের হাতে দিলেন। ভলজীনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লাগলো।

বিশপ ভলজীনকে বল্লেন, "বন্ধু, এখন স্বচ্ছন্দে চলে যাও, আর যদি কখন এস তবে বাগানের ভেতর দিয়ে চ'লে যাবার দরকার নেই। আমার সদর দরজা সব সময়েই খোলা থাকে।"

জীন ভলজীনের মনে হ'ল—সে বুঝি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে! বিশপ আর একটু এগিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, "ভলজীন্, ভাই আমার, তুমি আর এখন শয়তানের নও। তুমি ঈশ্বরের। তোমার আত্মা আমি শয়তানের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ভগবানের চরণে অর্পণ করেছি।"

শ্রীশ্যামাশঙ্কর মৈত্র, এম-এ

খাসিয়া জাতি

হাজার হাজার বৎসর আগে সেই আদিম মানুষের অবস্থা কেমন ছিল তোমরা অনেক জানিতে পারিয়াছ। তাহাদের ভাষা, তাহাদের বাড়ী, খাদ্য ইত্যাদি সবই কেমন এক রকমের ছিল। তোমাদের ইহাও বেশ মনে আছে, এই যে বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থা তা একই কালে সকল দেশে সমানভাবে আসে নাই। এক এক স্থানের এক এক জাতি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আজ এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের ইহাও বেশ মনে আছে বোধ হয় যে, আমাদের এই ভারতই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সকল বিষয়ে সভ্য হইয়া অন্যান্য দেশগুলিকেও সভ্য করিয়াছে। তাই বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে, ভারতের প্রত্যেকেই একই সঙ্গে সমান সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে আফ্রিকা দেশের আরেস-মাসিক পর্ব্বতমালার লোকদের কথায় তোমরা বেশ জানিয়াছ যে, পৃথিবীর সকল জাতি একই সময়ে উন্নত হয় নাই। আজ আমাদের দেশেরও একটি জাতির কথা বলিব। তাহাতে জানিতে পারিবে যে, যে দেশের তুলনা কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি সভ্যতায় অন্য কোনো দেশের তুলনা হয় না, সেই ভারতেরই একটি জাতি কেমন অন্ধকারে বাস করিত। ইহাদের অবস্থা ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বেও ঐরূপই ছিল।

আমাদের এই দেশ সকল দিক দিয়া সুন্দর বলিয়া সেই অতি পুরাতন কাল হইতেই বাহিরের কত জাতিই এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। আজ তাহারা আমাদেরই ভাই হইয়া গিয়াছে। মঙ্গোলীয় জাতি নামে একটি জাতি এমনি আমাদের দেশে আসে। সে আজ হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী। তাহাদেরই এক শাখা খাসিয়া জাতি। আসাম দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে ইহাদের বাস সেই স্থানটি জেলা খাসিয়া পাহাড় বলিয়াই এখন পরিচিত।

শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী (১৯১৪); জন্ম ১০ই জুন—১৮৫৯

নামেতেই বুঝিতেছ ঐখানে অনেক পাহাড় আছে। কি সুন্দর দৃশ্য ঐ জেলার! কত ছোট বড় পাহাড় চারিদিকে; কত নদী, কত ঝরণা পাহাড়ের গা বহিয়া নামিয়া গিয়াছে। ঘন-নিবিড় বন; সু-শ্যামল প্রান্তর; শান্ত-শীতল বাতাস। ঐ সমস্ত দেখিয়া মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। পাহাড়-তলীতে যাহারা বাস করে তাহারা কতই সুখী! বর্ষার ঘন অন্ধকারে কাল কাল দৈত্যের মত মেঘ এসে চারিদিক হ'তে পাহাড়গুলিকে ঘিরে ফেলে, তখন সে কি সুন্দর শোভাময়; আবার

বোঝাবহন

চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রম

শরতের দিনে সাদা সাদা মেঘগুলি অলসে আবেশে আসিয়া এই পাহাড়ের মাথাগুলিকে আলিঙ্গন করে, তাহাদের শরীরে নিজের দেহ এলাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী অচীন-পথে ক্ষণিক থামিয়া যায়, তখন সে দৃশ্য কি সুন্দর! এমন জায়গায় যাহাদের বাস তাহারাও ঐ মেঘের মত হাল্‌কা; সদাই সরল প্রাণে, সরল মনে দিন

খাসিয়া গৃহ

কাটায়। পাহাড়ের মত নির্ভীক, কর্ম্মঠ শক্তিশালী তাহাদের দেহ। মেঘের মত সরল সুন্দর তাহাদের প্রাণ; নদীর মত খল-চাতুরীহীন তাহাদের মন। হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়। তাহারা পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, নদীর ধারে ধারে, খোলা মাঠে ময়দানে জোয়ার, ভুট্টা, কচু, মিষ্টি আলুর চাষ করিত, ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। তখন আগুন ছিল, হাঁড়িও ছিল, কিন্তু তাহারা রাঁধিতে জানিত না। কাঁচা বাঁশের চোঙায় চাল আর জল দিয়া আগুনে ফেলিয়া দিত; বাঁশ আধ-পোড়া হইলে তাহা চিরিয়া ভাত বাহির করিত। তবে অনেকে আবার হাঁড়িও ব্যবহার করিত। খাইবার পাত্র কাঠের। ইহাতে খাওয়া ও বসা দুই কাজই চলিত। খাইবার পর উল্টাইয়া পিঁড়ি করিয়া লইত।

তিন চারি গাঁইট লম্বা বাঁশ জল রাখিবার পাত্র এবং এক গাঁইট লম্বা বাঁশ জল খাইবার গ্লাস। আমাদের যে একটি প্রধান খাদ্য দুধ তাহা তাহারা ঘৃণায় স্পর্শও করিত না। ছোট ছোট ছেলেদের তাহারা পাকা কলা খাওয়াইত।

এই ত গেল খাওয়া। তাহাদের ঘরবাড়ীও তেমন কিছু নয়। বাঁশ বা কাঠের বেড়া দিয়া ছাওয়া কুটীর।

ঘরে কোন জানালা রাখা হইত না। চালগুলি অতি নীচু। যে সকল স্থানে খুব বর্ষা

সেখানে পাথরের বাড়ী। কিন্তু তাহাতেও জানালা রাখা হয় না। দিনের বেলায়ও গৃহের ভিতর বেশ অন্ধকার থাকে।

পরিবার কাপড়ও তাহাদের তেমন কিছুই ছিল না। খাসিয়াদের মধ্যে সন, মাস, তারিখ, বার, ঘণ্টা প্রভৃতি কিছুই নাই। জেলার দুইটী ভিন্ন অংশে নিকটবর্ত্তী আটটী গ্রামে পর পর আটটী হাট হয়। ঐ আটটী হাটের নামই তাহাদের বারের নাম; এই জন্য আটদিনে তাহাদের এক সপ্তাহ হয়।

পাইয়াছে। তাহারা ভূত যেমন বিশ্বাস করে, ভয়ও করে তেমনি। এইজন্যই তাহারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নানা রকমে পূজা দিয়া থাকে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র ভগবান আছেন; কিন্তু ভূত তাঁহার অপেক্ষাও শক্তিশালী। তাহারা বলে সেই আদিতে ভগবান একদিন মানুষ সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে রাখিয়া দিলেন; কিন্তু ভূত তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ভগবান আবার সৃষ্টি করিলেন; ভূত আবার মারিয়া ফেলিল। তখন ভগবান বুদ্ধি

ডিম ভাঙিতে উদ্যত

চেরাপুঞ্জী ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

খাসিয়া জাতির লিখিবার অক্ষর বা অন্য কোনও চিহ্ন ছিল না। তাহাদের ভাষাও এমন যে, আমরা যে যে বিষয় জানি ঐ ভাষায় তাহাও প্রকাশ করা যায় না। তাহাদের মধ্যে ধোপা, নাপিত বা মুচি নাই। নিজের কাজ নিজেকেই করিয়া লইতে হয়।

তাহাদের মধ্যে আর একটি প্রধান দরকারী জিনিষ ছিল না—তাহা ঔষধ। কাহারও কোন অসুখ হইলে তাহারা মনে করিত তাহাকে ভূতে

করিয়া প্রথমে কুকুর সৃষ্টি করিয়া পরে পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করিলেন। কুকুর তাহাকে রক্ষা করিল, ভূত আর মারিতে পারিল না। আবার এই ভূতও অনেক রকমের। এক এক পীড়ার অধিপতি এক এক ভূত। মহামারীর ভূত—খ্লাম; ফোড়া ইত্যাদির—প্রোই; এই রকম। কোন্ ভূতের জন্য অসুখ হইয়াছে প্রথমে তাহারা ঠিক করিয়া লয়। মাঠের মাঝে একটী তক্তার উপর ডিম ভাঙিতে থাকে। ভাঙা ডিমের দাগ দেখিয়া

কোন্ ভূত বিরক্ত হইয়াছে তাহা স্থির করে। তাহা জানা হইলে সেই উপদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুরগী বা ছাগল বলি দেয়। সেই বলির পশু দেখিয়া আবার তাহারা স্থির করে ভূত সন্তুষ্ট হইয়াছে কি না, অর্থাৎ সেই পূজা লইয়াছে কি না।

কোন কোন লোককে খাসিয়ারা ডাইন বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহাদের কাজ অপরের উপর ভূত ছাড়িয়া দেওয়া। ইহারা ইচ্ছা করিলে অপরের ভূত ছাড়াইয়াও দিতে পারে এইরূপ

মুর্গী বলিদানের পর অন্ত্র পরীক্ষা

খাসিয়াদের বিশ্বাস। কিন্তু ডাইন অপেক্ষা তাহারা আর একটি কাল্পনিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করে। তাহারা মনে করে কতকগুলি পরিবার "থ্লেন" নামে এক ভীষণ সাপ পালন করে এবং এই সাপকে মানুষের রক্ত, নখ, চুল প্রভৃতি দিয়া গভীর রাত্রে পূজা করে। সাপটি পূজায় সন্তুষ্ট হইলে তাহাদিগকে ধন, সম্পদ, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি প্রদান করে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে খোরাক জোগাইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সে রক্ষকদিগকে সবংশে নিপাত করিবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। চৈত্র, বৈশাখ, এবং ভাদ্র আশ্বিন মাস প্রধানতঃ এই সাপের ক্ষুধা এবং পূজার সময়। এই সময় খাসিয়ারা ভয়ে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকে এবং একাকী কোন স্থানে যায় না। আবার এই সাপ নাকি ইচ্ছা করিলেই বড় বা ছোট হইতে পারে, কিংবা ইচ্ছামত বিড়াল বা অন্য কোন জন্তুর রূপ ধারণ করিতে পারে। ইহাই হইল খাসিয়া-ধর্ম্ম।

ঐ জেলার এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা বলা যায় না। বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট, তাহা যে গিয়াছে সেই মাত্র জানিয়াছে।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা নয় কোন জাতি এই প্রকার হীন থাকে। প্রত্যেক মানুষকেই তিনি জ্ঞান এবং ধর্ম্মে উন্নত করিতে চান। এই জন্য তিনি কত চেষ্টা করেন। ঐরূপ দেশে, ঐ রকম জাতির মধ্যে কত ধার্ম্মিক লোককে লইয়া যান। তিনি তথায় প্রাণপাত করিয়া ঐ জাতির সেবা করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে জাতি উন্নত হয়।

প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রথম ঐ স্থানে গিয়া খাসিয়াদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহারা স্কুল স্থাপন করেন। প্রথম আমাদের বাংলা অক্ষর দিয়া খাসিয়া ভাষায় বই লেখা হয়। কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ইংরাজী অক্ষর চলিত হয়। খাসিয়াগণ আমাদের প্রতিবেশী বলিয়া কাহারও কাহারও ইচ্ছা ছিল বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

ইহাদের দ্বারা উপকার যেমন হইয়াছে— অপকারও সেইরূপ কিছু কম হয় নাই। এখন যে উগ্রবীর্য্য মদে খাসিয়াদের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা প্রস্তুত এবং ব্যবহার করা তাহারা পূর্ব্বে একেবারেই জানিত না। জোন্স নামে একজন খৃষ্টান পাদ্রী তাহাদিগকে এই প্রকারের মদ

চোঁয়াইতে শিক্ষা দেয়। সেই হইতে ইহার ব্যবহারে খাসিয়া জাতি রোগ, দুর্নীতি এবং নানা-প্রকার পাপের মধ্যে ডুবিতেছে। খাসিয়ারা পূর্ব্বে তিন চার মণ ভারী বোঝা বহন করিতে পারিত; এখন সেরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। দীর্ঘজীবীলোকের সংখ্যাও খুব কমিয়া গিয়াছে। যাহারা মদ প্রস্তুত করে তাহাদের মৃত্যু আরও শীঘ্র হয়।

কোন লোক, কোন জাতি বা কোন দেশ কেবল ভালর পথে চলিয়াই একেবারে উন্নত হইতে পারে না। ভাল মন্দের ভিতর দিয়া যাইয়া উঠিয়া পড়িয়া ক্রমে তাহারা উন্নত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক খাসিয়া জাতির মধ্যে কাজ করিবার জন্য, তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের কিছু মঙ্গল যদি হয় এইজন্য খাসিয়া পাহাড়ে গমন করেন। তিনি এখনও সেইখানে কাজ করেন। যে জাতির কু-সংস্কার যত বেশী, যে জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রচার যত কম সেই জাতির মধ্যে কোন কাজ করা তত কষ্টকর। তিনি নানাস্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া, মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবানের নামে সকলকে ডাকিলেন। গরীবের খাবার জোগাড় করিয়া, দিয়া, পীড়িতকে ঔষধ দিয়া, যে বিপদে পড়িয়াছে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়া খাসিয়া জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রচার করিয়া, ধীরে ধীরে সে জাতির কল্যাণ করিতেছেন। ভূতের দ্বারাই অসুখ হয় এই বিশ্বাসে কেহই ঔষধ খাইত না। তাহাদের মধ্যে ঔষধের প্রচার করা যে কি ব্যাপার তাহা হয় ত কিছু বুঝিতে পারিতেছ। মদ যে খাসিয়া জাতির কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। এই মদ যাহাতে বেশী প্রস্তুত না হয়---তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আশ্রমে যাহারা আসিল তাহারা ত মদ ছাড়িলই। কয়েকজনকে কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠান হল। একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া গেল। স্বর্গীয় জীবন রায় নিজের উদ্যম ও প্রতিভা বলে খাসিয়াদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট লইয়াছিলেন। নিজ জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য বহু চেষ্টা ও টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বেশ শিক্ষিত। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নানাপ্রকার কাজ করিতেছেন। একটি ছাপাখানা করিয়া খাসিয়া ভাষায় ভাল ভাল বই প্রকাশ করিতে-ছেন, একখানি মাসিক পত্রিকাও চালাইতেছেন। খাসিয়াদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। *

* শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আত্মজীবনী অবলম্বনে লিখিত।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

নেমি হ্রদের রহস্য আবিষ্কার—

পৃথিবীর পুরাতন অনেক সভ্যদেশের কথা তোমরা শুনেছ। আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষের মতন রোমসাম্রাজ্য একসময় খুব সভ্য শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ দেশ ছিল। রোমদেশের অধিবাসীরা যেমন সুসভ্য ছিল, তাদের চেহারাও ছিল তেমনি সুন্দর আর প্রত্যেকের সেই সুন্দর সমুন্নত দেহে ভীমের মত

নেমি হ্রদে পুলিশ পাহারা

পরাক্রম ছিল। বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে আর সিংহের সঙ্গে তারা শুধু হাতে শুধু গায়ে লড়াই করত; তাদের একটুও ভয় করত না। তারা যে কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যে আর পরাক্রমেই শ্রেষ্ঠ ছিল তা নয়, তাদের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, বিজ্ঞান এবং সঙ্গীতের চর্চাও খুব উন্নতিলাভ করেছিল।

ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই রোম দেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও অপূর্ব্ব। এখানকার পাহাড়-পর্ব্বত হ্রদ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, উপাসনামন্দির, নানাদেব-দেবীর অতুলনীয় সুন্দর মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখবার জন্যে—দেশ দেশান্তর থেকে কত শত পর্য্যটক প্রতি বৎসর এখানে আসেন।

পৃথিবীতে যে সব দেশ অতি প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সভ্যতা, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে অনেক দেশ এখন লুপ্ত হয়ে
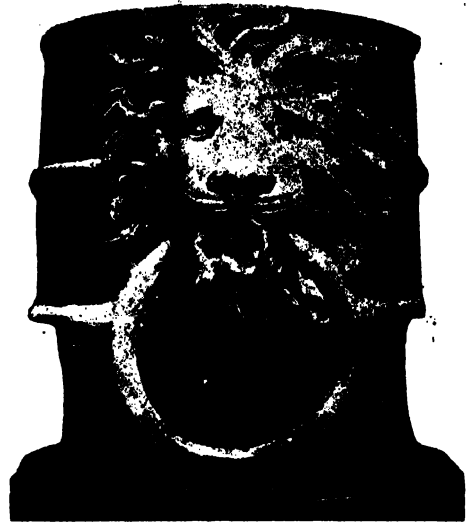
নেমি হ্রদে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের সিংহমূর্ত্তি

গেছে আবার অনেক দেশের বিরাট রাজপ্রাসাদসমূহের, ভাস্কর্য্যশিল্পের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকদের মানসলোকে অতীতের গৌরবময় স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

পুরাকালের এই সব মহান্ দেশের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, নদ নদীর এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কত যে লুপ্ত ঐশ্বর্য্য সমাহিত হয়ে রয়েছে তা কে জানে! বহু বৈজ্ঞানিকের আর প্রত্নতাত্ত্বিকের অসীম সাহস ও চেষ্টায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সব লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে।

রোম শহরেও সম্প্রতি এরূপ চেষ্টা হচ্ছে। অতীতের স্মৃতি অতীতের লুক্কায়িত মানুষের কাছে ঐশ্বর্য্য সকলের চেয়ে লোভনীয়, তাই সে যেখানেই লক্কায়িত কোনও ঐশ্বর্য্যের সংবাদ পায় সেইখানে অদম্য উৎসাহে ছুটে যায় তাকে পাবার জন্যে।

রোম শহরের নেমি হ্রদের অভ্যন্তরে এইরূপ একটি অভিযান সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে।

নেমি হ্রদ রোম শহর থেকে প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে আল্‌বান্ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। হাজার

ব্রঞ্জের রেলিং

হাজার বছর আগে এই হ্রদের সঙ্গে অনেকগুলি সুড়ঙ্গের দ্বারা রোম দেশের যোগ ছিল। এই নেমি হ্রদকেই মিরর্ অফ্ ডায়ানা বলা হয়। পাহাড়ের উপর এই হ্রদ অনুচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির মাঝখান দিয়ে আপনার মর্ম্মর ছন্দের তালে তালে এই হ্রদ বয়ে চলেছে। চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। বহু প্রাচীনকালে সম্রাট কালিগুলা মনোরম নৌকায় চ'ড়ে স্নিগ্ধ সান্ধ্যমলয়ে এই হ্রদে জলবিহার করতেন। রোম-দেশের প্রাচীনকালের নানাপ্রকার ঐতিহাসিক বহুমূল্য জিনিষ এই হ্রদের অতল জলরাশির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সেই সমস্ত লুকান ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করবার জন্যে সম্প্রতি একদল বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে নেমি হ্রদকে মন্থন করতে আরম্ভ করেছেন। তার সমস্ত জল এমনি করে সেচন করে ফেলে তার বুকে যে সব ঐশ্বর্য্য লুকান আছে তাই উদ্ধার করা হবে।

নেমি হ্রদের জল পাম্প করা হইতেছে

ইতিমধ্যে ডুবুরির সাহায্যে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের এই চেষ্টা সফল হলে প্রাচীনকালের কত যে অপূর্ব্ব বিস্ময়কর জিনিষের আবিষ্কার হবে তাহা কে বলতে পারে?

—

হেলান টাওয়ারের কথা—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের তৈরী এমন সব সুন্দর অভ্রভেদী
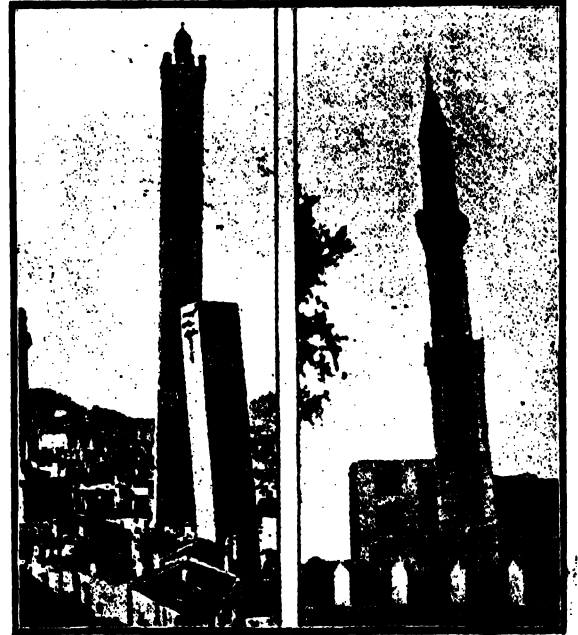
বলোনিয়ার দুইটি হেলান বুরুজ—
বামে, আসিনেলি টাওয়ার; দক্ষিণে, গারিসেন্দা টাওয়ার

উপাসনা-মন্দির, বুরুজ বা Tower আছে, তা'দের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখ্‌লে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। এই সব

ইউরোপের নানাদেশের কয়েকটি হেলান বুরুজ—(১) পিসার ; (২) সেণ্টমরিট্সের ; (৩) এম্‌সের ; (৪) উল্‌মের

গির্জ্জা বা টাওয়ারের চূড়া মাটি থেকে উঠে আকাশের দিকে সোজা ভাবে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই রকমই তোমরা দেখেছ, কিন্তু, ইউরোপের অনেকদেশে প্রায় তিন চারশ বছর আগের তৈরী এমন অনেক টাওয়ার আছে যাদের দেহটি হেলান। খুব উঁচু বলে বহু বৎসর ধরে একটু একটু ক'রে বেঁকে বেঁকে তারা এখন হেলান অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে আছে।

এই সব টাওয়ারের নির্ম্মাণ-কৌশল এত চমৎকার যে এগুলি নষ্ট হ'য়ে গেলে পৃথিবী থেকে স্থাপত্যশিল্পের অনেক দর্শনীয় দ্রব্য নষ্ট হ'য়ে যাবে।

পাশ্চাত্যদেশের যতগুলি প্রসিদ্ধ হেলান টাওয়ার বর্ত্তমানে আছে, তাদের মধ্যে পিসার লিনিং টাওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

প্রায় তিনশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে 'সেণ্ট মরিট্‌স' টাওয়ার নির্ম্মিত হয়। এখন এই টাওয়ারটি বাঁকা অবস্থায় আছে। এই টাওয়ারটি গির্জ্জার অংশ, গির্জ্জাটি বহুপূর্ব্বেই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বর্ত্তমানে এই টাওয়ারটিকে সোজা করবার অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে।

পিসার লিনিং টাওয়ারের নির্ম্মাণ কার্য্য ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়, শেষ হয় চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে। তৃতীয় তলা নির্ম্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ারটি বাঁকতে আরম্ভ করে ; হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি ২৫ বছরে এই পিসার লিনিং টাওয়ার এক ইঞ্চি ক'রে বেঁকে যাচ্ছে।

ইটালির বোলোনিয়া শহরে ও এইরকম একটা লিনিং অর্থাৎ হেলান টাওয়ার আছে ; এই বুরুজটি দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে এটি প্রায় চারফুট বেঁকে গিয়েছে। ১৪৮৮ সালে এই টাওয়ারের ভিৎ দৃঢ় করে দেওয়ার পর থেকে আর বাঁকেনি।

এদের সকলের ওপরে যায় গারিসেন্দা টাওয়ার। বর্ত্তমানে এই টাওয়ারটি এত বেঁকে গেছে যে, তার চূড়া থেকে মাটি পর্য্যন্ত সোজা রেখা টান্‌লে সেটি মূল ভিত্তি থেকে ৪ ফিট ২ ইঞ্চি দূরে পড়ে। গারিসেন্দা টাওয়ারের ওপরের খানিকটা অংশ টাওয়ারটিকে রক্ষা করবার জন্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

—

ট্যাঙ্কের লড়াই—

দু'জন বড় বড় কুস্তিগীর পালোয়ানে অথবা দু'টি প্রকাণ্ড পশুর মধ্যে যখন ভীষণ লড়াই বাধে সেটা একটা
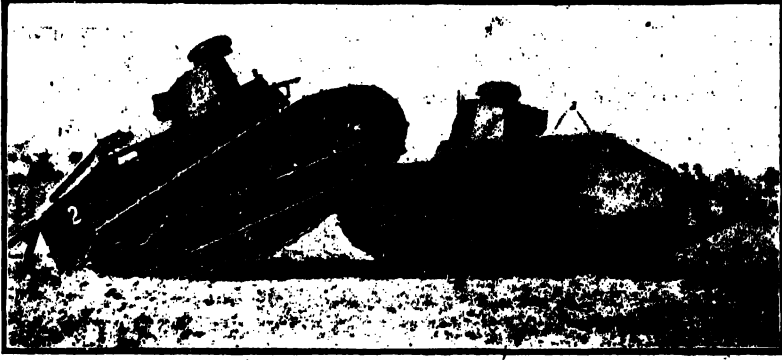
দুইটি ট্যাঙ্কের লড়াই

দেখবার জিনিষ হয়; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী মজার একটা ঘটনার কথা এখানে বলছি। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কের ষ্টার্টেন আইল্যাণ্ডে দু'টি প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে ঠিক দু'টি জীবিত জানোয়ারের মত ভীষণ লড়াই হয়ে গেছে। দু'জনে তারা সামনাসামনি এসে ভয়ানক ঠোকাঠুকি আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট আওয়াজ হয় তা বর্ণনা করা যায় না। যেন দুটো প্রকাণ্ড দানবের লড়াই চলেছে। কিছুক্ষণ এইরকম সংঘর্ষ চল্‌বার পর অবশেষে তাদের মধ্যে একটা ট্যাঙ্ক পরাজিত হল। বিজেতা ট্যাঙ্ক তাকে ভীষণ বেগে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে তুলে পেছনে ঠেলে ফেলে দিল। পরাজিত ট্যাঙ্কের সম্মুখের দিকটা তখন বিজেতার পিঠের ওপর প্রায় উঠে পড়েছে, সে অবশেষে বাধ্য হয়ে পিছু হটে পরাজিত ট্যাঙ্ক্‌কে অসহায় অবস্থায় মাটিতে নামিয়ে দিয়ে তবে শান্ত হয়।

—
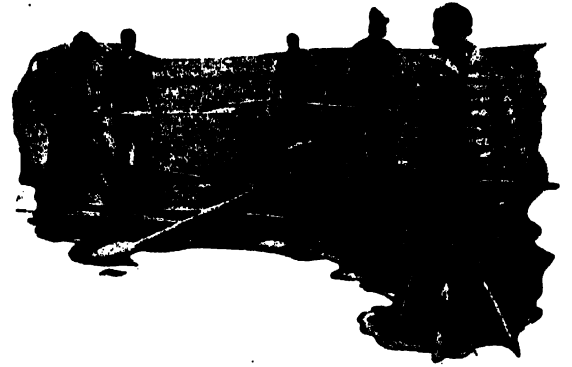
জলের ওপর হাঁটা—

ড্যাঙ্গার মতন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানর আনন্দ উপভোগ করতে মাঝে মাঝে অনেকেরই ইচ্ছে হয় কিন্তু কাজটি ভয়ানক বিপজ্জনক ও প্রাণ রক্ষা অসম্ভব ব'লে কেউই চেষ্টা করে না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কোন কাজ অসম্ভব বলে মনে করে চুপ করে বসে থাকে না, নতুন কিছু আবিষ্কার করবার সম্ভাবনা দেখলেই তারা প্রাণপণ শক্তিতে সেজন্যে চেষ্টা করে। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ার কতক-গুলি অধিবাসী মাথা খাটিয়ে এমন একটি বিশেষ কলাযুক্ত প্যাডেল্ আবিষ্কার করেছেন যে, সেগুলি পায়ে দিয়ে জলের ওপর অনায়াসে হাঁটা যায়। ঐ দেশের নানা স্থানে—বিশেষ, ড্যানিয়ুব নদীতে—প্রায়ই এই অভিনব প্যাডেল পায়ে দিয়ে অনেক লোক জলের ওপর দিব্যি

জলের উপরে হাঁটা

আমোদ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তোমাদের দেশের কেউ যদি এই রকম অদ্ভুত কোনও জিনিষ মাথা খাটিয়ে বের করতে পারেন তবে গঙ্গার উপর এবং আরও কত বড় বড় নদীর বুকের ওপর আরামে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

—

সুবৃহৎ গির্জ্জাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরান—

আমেরিকা দেশের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। এ দেশের লোকেদের মত ধনী এবং খামখেয়ালী মেজাজের লোক পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মাথায় সময়ে সময়ে এমন সব অদ্ভুত খেয়াল চাপে
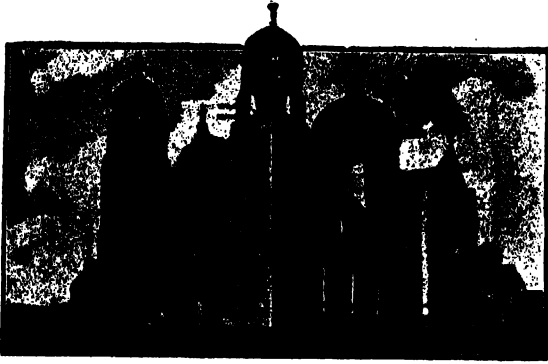
শিকাগোর এই বৃহৎ গির্জ্জাটিকে একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে

যে, তোমরা তা শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে। কখনও এদের ইচ্ছে হয় পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু একশ দু'শ তালা একটা বাড়ী তৈরী করবে আর তার ভেতর আরামে আহার বিহার সব করবে, কখনও আবার চন্দ্রলোকে কি করে যেতে পারা যায় তাই নিয়ে এরা মাথা ঘামায়।

সম্প্রতি এদের দেশের ধনী লোকদের মধ্যে একটা খেয়াল দেখা দিয়েছে, এঁরা বড় বড় বাড়ী গির্জ্জা প্রভৃতি ভিৎশুদ্ধ এক জায়গা থেকে তুলে অপর জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ীগুলা এমন সাবধানে এবং কৌশলে স্থানান্তরিত করা হয় যে, তাদের চুণবালিও খসে না; অনেক সময় তাদের বৈদ্যুতিক, এমন কি, টেলিফোন্-যোগেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

সম্প্রতি আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৫ ফুট লম্বা আর ১১৫ ফুট চওড়া একটা গির্জ্জাকে তার মূলভিত্তি থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই গির্জ্জাটির ওজন ৬০০০ টন্। শুধু তাই নয়, গির্জ্জাটিকে দুভাগে বিভক্ত করে মাঝখানে আর একটি ত্রিশ ফুট্ অংশ যোগ করে নেওয়া হয় এই রকম ক'রে ভিৎশুদ্ধ এই গির্জ্জাটিকে রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটিকে সরাবার তোড়জোড় করতেই প্রায় আটমাস সময় লাগে।

স্থান পরিবর্ত্তন করবার সময় কোথাও একটু চুণ বালিও খসেনি; দুয়ার জানালা যেখানকার যেমন ঠিক তেমনি আছে। স্থান পরিবর্ত্তন করতে মোট আটঘণ্টা সময় লেগেছিল। এতবড় একটা কাজ করতে মাত্র চার জোড়া ঘোড়া এবং পঞ্চাশ জনেরও কম লোকের দরকার হয়। ৫০,০০০ ফুট্ ভারী শক্ত তক্তা, ৪০০০ জ্যাক্, ৩০০০ রোলার এবং ৪০০ টন লোহার রেল এই কাজে দরকার হয়েছিল।

চারিটি গল্প

(স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের রচনা হইতে
বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত)

(১) রাজমিস্ত্রী

এক ছিল রাজমিস্ত্রী। সে এক ধনী ব্যক্তির দালান মেরামত করিতে গিয়া হঠাৎ ছাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। পড়িয়া সে সমস্ত শরীরে ত আঘাত পাইলই; তা ছাড়া, তার একখানা পা একেবারে ভাঙিয়া গেল। গুরুতর বেদনায় অস্থির হইয়া সে ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। বলিল, "হে ঈশ্বর! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তুমি মানুষকে এমন অজ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ যে, একটা বিষম বিপদে পড়িবার পূর্ব্বক্ষণেও জানিতে পারা যায় না যে, বিপদ আসিতেছে। আমি ছাত হইতে পড়িবার এক মিনিট আগেও যদি জানিতাম যে পড়িব, তবে সাবধান হইতাম। আর, তুমি মানুষকে এমন অক্ষম করিয়াছ যে, যখন জানিলাম পড়িয়া যাইতেছি, তখনও এই পতন নিবারণ করিতে পারিলাম না। কে বলে তোমার নিয়মসকল মঙ্গলময়?"

পরমেশ্বর রাজমিস্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষ দিতেছ, বল দেখি। আমি তাহা সংশোধন করিব।"

রাজমিস্ত্রী বলিল, "যে নিয়ম থাকাতে কোনও জিনিস উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে মাটিতে পড়িয়া যায়, স্কুলের ছেলেরা যাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলে, তারই ফলে আমি পড়িয়া গিয়াছি। আমি দালানের কার্ণিসে বসিয়া নিজের কাজ করিতেছিলাম; হঠাৎ একখানা আল্‌গা ইটের উপর পা রাখাতেই আমার এই বিপদ ঘটিয়াছে। হায়! বিনা দোষে, কেবল তোমার ঐ নিয়মটার অত্যাচারে, দেখ, আমি মরিতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, "বাছা! আমি ত তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এই নিয়মটি করিয়াছি। তুমি যখন ইহাতে সন্তুষ্ট হইতেছ না, তখন বল আমায় কি করিতে হইবে। তুমি যে বর চাও, আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।"

রাজমিস্ত্রী খুব খুসি হইয়া নিবেদন করিল, "করুণাময় পরমেশ্বর! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, প্রথম বরে তাহা দূর করিয়া দাও। আর, দ্বিতীয় বর এই দাও, আমি যেন আজ হইতে তোমার এই দুরন্ত মাধ্যাকর্ষণের অধীন না থাকি।"

ভগবান্ বলিলেন, "তথাস্তু।"

রাজমিস্ত্রী এই দুই বর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং বিধাতা-পুরুষকে বার বার ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "পরমেশ্বর বড়ই দয়ালু; তিনি আমাকে মাধ্যাকর্ষণের নিষ্ঠুর নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। আমি আর কখনও ছাত হইতে পড়িয়া যাইব না।"

তাহার বেদনার শান্তি হইল; ভাঙা পা জোড়া লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে দেখিল, সে সুস্থশরীরে আবার ছাতের উপর স্থাপিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া সে চারিদিকে চাহিতে

লাগিল; এবং এত শীঘ্র তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে দেখিয়া পুলকিত হইল।

আনন্দের আবেগ কিছু শান্ত হইলে, সে কাজে মন দিল। কিন্তু ছাতের উপর পা ফেলিতে গিয়া দেখে, আগের মত আর চলিতে পারে না। এখন সে ত আর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন নয়! শরীরের ভার থাকাতে মাটিতে পা ফেলা যায়; আর মাধ্যাকর্ষণেই শরীরের ভার হয়। অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পা ফেলিয়া হাঁটিবে কিরূপে?

হাঁটিতে না পারিয়া সে আবার বসিল; এবং কর্ণিকায় করিয়া ছাতের উপর চূণ শুর্‌কি দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! চূণশুর্‌কি ছাতে না পড়িয়া শূন্যেই রহিয়া গেল! কারণ পৃথিবী আকর্ষণ না করিলে চূণ শুর্‌কি কর্ণিকা হইতে পড়িবে কেন?

এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাজমিস্ত্রী অত্যন্ত ভয় পাইল; এবং মই বাহিয়া ছাত হইতে নামিয়া আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণের অধীন না থাকাতে নামা সম্ভব হইল না। তখন সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ছাত হইতে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে বিপদ বাড়িল – সে নীচে না পড়িয়া শূন্যে রহিয়া গেল!

এইরূপে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ও ভীত হইয়া সে 'হে ভগবান্! হে ভগবান্'! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন দয়াময় পরমেশ্বর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আবার তোমার কি বিপদ ঘটিল? তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন থাকাতে ছাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে। সেই নিয়ম ত তোমার পক্ষে রহিত করিয়া দিয়াছি। তোমার গায়ের বেদনাও দূর হইয়াছে। আর কখনও হাত-পা ভাঙিবার সম্ভাবনা নাই। তবে তুমি আবার হাহাকার করিতেছ কেন?"

রাজমিস্ত্রী বলিল, "প্রভু! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি অজ্ঞান ও অহঙ্কারী বলিয়াই তোমার মঙ্গলকর নিয়মের দোষ দিয়াছিলাম; আর, আমার পক্ষে সেই নিয়ম স্থগিত করিয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এখন আমার ভ্রম বুঝিয়াছি। আমার শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় বেদনা দিতে হয়, দাও। পা ভাঙা থাকে থাক্। তথাপি শীঘ্র আমাকে আবার মাধ্যাকর্ষণের অধীন কর। আমি যে এ ভাবে আর শূন্যে থাকিতে পারি না!"

বিধাতা আবার "তথাস্তু" বলিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। রাজমিস্ত্রী তখনই পূর্ব্বের ন্যায় বেদনায় অধীর হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অসাবধান হওয়ার ফল স্বরূপ অনেকদিন কষ্ট ভোগ করিয়া, ক্রমে সুস্থ হইল; ও কিছুকাল পরে আবার ছাতে উঠিয়া নিজের ব্যবসায় আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যে পরম উপকারী, ইহা দ্বারাই যে মানুষের চলাফেরা কাজকর্ম্ম সব সম্ভব হয়, এই তত্ত্ব জানিয়া সে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিল। আর, সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলিয়া সুখে জীবন কাটাইতে লাগিল।

(৩) বাতের রোগী

এক ছিল বাতের রোগী। সে একদিন বাতের বেদনায় অস্থির হইয়া, 'হা বিধাতা, হা বিধাতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। বিধাতা তার

আর্ত্তনাদ শুনিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি কেন আক্ষেপ করিতেছ, বল দেখি।"

সে বলিল, "প্রভু! আমার পিতা স্বাস্থ্যের নানা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ও অনেক পাপ করিয়া নিজের শরীরটি নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁর দুষ্কর্ম্মের ফলে, আমি বাত-রোগে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছি। আমার হাড়গুলোতে পর্য্যন্ত গুরুতর যাতনা হইতেছে। তুমি একের দোষে অন্যকে কষ্ট দাও, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। লোকে তোমাকে ন্যায়বান্ ও দয়ালু ঈশ্বর বলে। তুমি যদি সত্যই ন্যায়বান্ ও দয়ালু হও, তবে আমাকে আর অপরের দোষে শাস্তি দিও না! আমাকে এই কঠিন বাত-রোগ হইতে রক্ষা কর।"

বিধাতা রোগীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "পিতামাতার শরীরের ও মনের দোষগুণ সন্তান পায়, আমি এই যে নিয়ম করিয়াছি, তুমি তার দোষ দিতেছ। আচ্ছা বল দেখি, তুমি পিতা হইতে বাত-রোগ ভিন্ন আর কি কিছুই পাও নাই?"

রোগী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ, পাইয়াছি বই কি? আমার মাংস-পেশী, ধমনী প্রভৃতি শরীরের সকল জিনিস এবং মনের সকল বৃত্তি পিতা হইতেই পাইয়াছি।"

"যতক্ষণ বাতের বেদনা না থাকে, ততক্ষণ কি তুমি ঐ সকল মাংস-পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে এবং মনের বৃত্তি সকল হইতে কোনও সুখ পাও?"

"হাঁ, প্রভু। বাতের বেদনা না থাকিলে, আমি শরীরে ও মনে বেশ স্ফূর্ত্তি পাই; তখন সকল সুখই বেশ ভোগ করি। তখন আমার ইচ্ছামাত্র মাংসপেশী সকল কাজ করে; ইন্দ্রিয় সকল সুখভোগ করে; মনের বৃত্তি সকল দ্বারা জ্ঞান-ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া কত আনন্দ পাই। কিন্তু এই বাত রোগে আমার সকল সুখ নষ্ট করিয়াছে। হে নির্দ্দয় বিধাতা! তুমি কেন আমাকে পিতার দোষে এই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করাইতেছ?"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত অবিবেচক। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন। তুমি তাঁর রুগ্ন শরীর হইতে তোমার এই রুগ্ন শরীর পাইয়াছ। যে নিয়মে তাঁর ধমনী-মাংসপেশী, বল-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল পাইয়াছ। সেই নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগও পাইয়াছ, যদি এই নিয়মটিকে অনিষ্টকর মনে কর, বল আমি এখনই ইহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া দিই।"

রোগী বলিল, "হে বিধাতা! আগে জিজ্ঞাসা করি, এই নিয়ম স্থগিত করিলে কি আমি শরীরের ও মনের সকল বৃত্তিগুলি হারাইব? বল-বীর্য্য সবই যাইবে?"

বিধাতা বলিলেন, "তার আর সন্দেহ কি? যে নিয়মে রোগটি পাইয়াছ, সেই নিয়মে এই সবও ত পাইয়াছ। রোগটি ফিরাইয়া দিলে, সবই ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

তখন রোগী ব্যগ্রভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দোহাই প্রভু! নিয়ম স্থগিত করিবার দরকার নাই। আমি তোমার নিয়মের অধীন হইয়া যেমন নানা সুখ ভোগ করিতেছি, তেমনি রোগের কষ্টও ভোগ করিব। পিতার সম্পত্তি ভোগ করিব, অথচ তাঁর ঋণটি লইব না, এটা ঠিক নয়। কিন্তু প্রভু, এখন বল, আমার পিতা যে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজে শাস্তি পাইয়াছেন এবং আমাকেও কষ্টে ফেলিয়াছেন, আমি যদি আজ

হইতে সেই নিয়ম পালন করি, তবে কি আমার রোগের যাতনা কমিবে না?”

বিধাতা বলিলেন, “নিশ্চয় কমিবে। ক্লেশ কমান ও ক্লেশ দূর করাই আমার সকল নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার মত কেবলই নিয়ম ভঙ্গ করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর সকল রকম রোগের বাসা হইত। তোমাকে পিতার পাপ-পথ হইতে ফিরাইবার জন্যই এই রোগ দিয়াছি। রোগের যাতনা তোমাকে সাবধান না করিলে তুমিও পাপ করিয়া আরও অধিক দুঃখ পাইতে। এখন হইতে তুমি যদি আমার নিয়ম সকল পালন করিতে থাক, তবে তোমারও কষ্ট কমিবে; আর তোমার সন্তানেরাও সুস্থ শরীর ও সৎ স্বভাব পাইয়া সুখে জীবন কাটাইবে।”

রোগী পরমেশ্বরের এই সকল কথা শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিল, এবং সেই দিন হইতে তাঁর নিয়মের অতিশয় বাধ্য হইল। তাহার রোগ ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল। পরিশেষে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ করিতে করিতে সুখে জীবন কাটাইল। তাহার সন্তানেরাও সুস্থ শরীরে ও শুদ্ধ মনে চিরজীবন সুখে যাপন করিল।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নববর্ষ

ওই যে নবীন বর্ষ আজি
আসছে মোদের দ্বারে,
আজ বরষের আগমনী
বাজ্‌ছে বীণার তারে।
কানন ভরা ফুলের হাসি
দখিন বাতাস বাজায় বাঁশী,
উৎসবের আজ পড়ছে সারা
নিখিল ভুবন জুড়ে,
বর্ষ আজি নবীন বাণী
এনেছে মোদের তরে।

২

আসছে আজি বর্ষ নবীন
বিদায়—পুরাতন!
নবীনকে আজ করতে বরণ
বিপুল আয়োজন।
বেণুর তানে পাখীর গানে
হরষ জাগায় প্রাণে প্রাণে,
বনে বনে ফুলের খেলা
ঝিঁঝির গুঞ্জরণ,
আজ নূতনের পরশ পেয়ে
মুগ্ধ সবার মন।

৩

যাও পুরাতন, চাই না তোমায়
বিদায়, নমস্কার!
নূতন অতিথ্‌ আসছে দ্বারে
করব বরণ তার।
এবার হতে নূতন জীবন
নূতন ভাবে করব যাপন
সময় মোটেই ফাঁকি দিতে
পারবে না কো আর,
এবার মোরা করব সাধন
সকল কার্য্যভার।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর নাম শোনেনি এমন কেউ বোধ হয় তোমাদের মধ্যে নেই। বর্ত্তমান যুগে তাঁকে পৃথিবীর 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলা হয়। তাঁর মত ত্যাগী, স্বদেশভক্ত এবং সত্যনিষ্ঠ লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছেন। ভারতবাসীর অন্তরে প্রকৃত আত্মনির্ভরতা এবং দেশভক্তি জাগিয়ে তোলবার জন্যে তিনি প্রাণপণ সাধনা করছেন; স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য তিনি সারা জীবন ধরে কত নির্যাতন যে সহ্য করে এসেছেন সে কথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই শুনেছ। তাঁর সমস্ত জীবনটি যেন একটি ব্যথার ইতিহাস।

পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তা'দের মধ্যে আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত হীন। আমাদের দেশের মত এত দুঃখ, দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। কোটি কোটি লোক এখানে অর্দ্ধাহারে থাকে, এমন কি, কত লোকের কত দিন অনাহারেই কেটে যায়, সুখে থাকা ত' দূরের কথা। সাধারণতঃ এদেশের লোকেদের আয় অন্য সব দেশের অধিবাসীদের চেয়ে কম, অথচ খাওয়া-পরার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় যে সব জিনিষের আবশ্যক গভর্ণমেণ্ট থেকে তার মধ্যে অনেকগুলির ওপর (tax) ট্যাক্স বসান আছে বলে গরীব লোকে তত দাম দিয়ে আবশ্যকীয় জিনিষও সব সময়ে কিনতে পারে না। তারপর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, শারীরিক দুর্ব্বলতা—এসব ত আছেই। তোমরা দুবেলা পেট ভরে কত ভাল ভাল জিনিষ খাও; সুন্দর বিছানায় শুয়ে আরামে নিদ্রা যাও, কিন্তু তোমাদের দেশের কত লোক যে না খেয়ে রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে দিন কাটায় তাদের কথা কি তোমরা একবার ভাব?

দেশের এত দুঃখ দেখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের প্রথম যৌবনেই অত্যন্ত আঘাত পান, আর তার পর থেকেই তিনি মনেমনে দৃঢ় পণ করেন যে, যেমন করেই হউক দেশবাসীর সমস্ত দুঃখ তাঁকে দূর করতেই হবে। তিনি যা সত্য বলে মনে করেন, যে উপদেশ তিনি অপরকে দেন তাহা তিনি নিজে আগে পালন করেন। তাঁর যা-কিছু সুখ, ঐশ্বর্য্য তিনি সব একে একে ত্যাগ করেছেন। এখন তাঁর সম্বল মাত্র হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একখানি খদ্দর, আর সারা দিন রাত্রিতে তাঁর আহারের জন্য মাত্র তিন আনা পয়সা।

তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও নিশ্চিন্ত হননি; স্বদেশবাসীর সমস্ত দুঃখ কিরূপে দূর করা যায়, কি উপায়ে দেশকে স্বাধীন করা যায়, দিনরাত্রি সেইজন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে দেশ যদি অধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে তাহ্‌লেই তাঁর সমস্ত দুঃখের অবসান হবে।

ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন হ'লেও ইংরাজের উপর, অর্থাৎ ইংলণ্ডবাসী কোনও মানুষের ওপরই তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। নিজের দেশবাসীর মতন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের মতন পৃথিবীর সব মানুষকেই তিনি আন্তরিক ভালবাসেন; তাঁর অতিবড় শত্রুকেও তিনি এত ভালবাসেন যে, প্রয়োজন হ'লে তার মঙ্গলের

জন্যে তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন। ইংরাজ জাতি আমাদের দেশের শাসন-ভার হাতে নেবার পর থেকে অনেক কু-প্রথা, কু-সংস্কার দূর করেছেন—অনেক সুবিধাজনক ভাল ভাল জিনিষের প্রচলন করেছেন একথা মহাত্মা গান্ধী অনেকবার স্বীকার করেছেন; কিন্তু, বর্ত্তমানে প্রচুর অর্থলাভ হবে মনে করে সরকার এমন কতকগুলি আইন-কানুন করেছেন এবং আমাদের দেশকে শাসন করবার জন্যে এমন সব প্রণালী নির্ণয় করেছেন যেগুলি পৃথিবীর কোনও জাতির উপরই চালান কোন সভ্যজাতির উচিত নয়। অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর অযথা এমন সব ট্যাক্স (tax) বসান হয়েছে যে, আমাদের মতন দরিদ্র দেশ তা বহন করতে একেবারে অক্ষম।

এই-সব আইনগুলির উপরই হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধ। তিনি চান দেশ স্বাধীন হোক্; কারণ দেশ স্বাধীন না হ'লে এই সমস্ত আইন-কানুন, এই সমস্ত অন্যায় শাসন-প্রণালীর উপর, আমরা কলম চালাতে পারবো না। আমাদের দেশশাসনের জন্যে আইন-প্রণালী প্রস্তুত করবার ক্ষমতা যতদিন না আমরা নিজেদের হাতে পাচ্ছি ততদিন আমাদের এই দারিদ্র্য ভোগ থেকে নিষ্কৃতি নেই। অথচ এই সব অন্যায় আইনগুলি ভারতসরকার অতি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করলেই উঠিয়ে দিতে পারেন।

এসব নিয়মগুলি যতই অন্যায় হোক্, সেগুলি না মানিলেই গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে। অথচ এগুলি একেবারে ভেঙে ফেলতেই হবে। বহু দিন ধরে চিন্তা এবং সাধনা করে মহাত্মা গান্ধী দেখলেন এই সব অন্যায় আইন, এই দুঃখপূর্ণ শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে এখনি যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন। যুদ্ধ ঘোষণা শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ! সত্যই ত ইংরেজদের হাজার হাজার সৈন্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধের জাহাজ, এরোপ্লেন কত কি রয়েছে, আমাদের কিছুই নেই; যুদ্ধ আবার কি ক'রে সম্ভব?

মহাত্মা গান্ধী আমাদের চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধিমান এবং তিনি ভালরূপ জানেন যে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কল্পনা করাই পাগলামি, অথচ শীঘ্র আমাদের এমন একটি সুশৃঙ্খলিত শক্তির প্রয়োজন, যার কাছে কামানের গোলা, এরোপ্লেন—সব হার মেনে যায়। তাছাড়া কোনও রকম অস্ত্রের ব্যবহার করে যুদ্ধ করা, বা কোন মানুষের রক্তপাত করে দেশের স্বাধীনতাও তিনি চান না। তাই তিনি অনেক চিন্তা ও সাধনা করে এমন একটি অভিনব প্রণালী আবিষ্কার করলেন, যেটি দুর্ব্বল নিরস্ত্র জাতির একমাত্র অস্ত্র—যার কাছে কামানের গোলাগুলিও হার মেনে যায়। এর নাম তিনি দিয়াছেন 'civil disobedience' বা নিরুপদ্রব আইন-অমান্য। নিরুপদ্রব আইন অমান্য করতে হ'লে প্রথমেই দরকার মনের বল আর অহিংসা, তার উপর প্রয়োজন দৃঢ়তা। কাহারও প্রতিষ্ঠিত কোনও আইন অন্যায় ও মিথ্যা ব'লে আমার মনে হচ্ছে তখনি আমি সেটা অমান্য করলাম অথচ যে আইনের কর্ত্তা তাকে আমি হিংসা বা ঘৃণা করতে পারব না, আর তাঁর সেই আইন অমান্য করার জন্য তিনি যত শাস্তিই দিন, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি হয় তাহ'লেও নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ অহিংসভাবে আমি অমান্য করেই চলব, যতদিন না আইন প্রবর্ত্তকের মনে ন্যায়পরায়ণতা জাগে

মহাত্মা গান্ধী

এবং সেই আইনটি না তুলে দেওয়া হয়। এরই নাম 'civil disobedience', এর আর একটি নাম হচ্ছে 'সত্যাগ্রহ'। এই সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে মহাত্মা গান্ধী ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনেক অন্যায় আইন উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এখনও আমাদের দেশের শাসন-প্রণালীর মধ্যে এমন অনেক আইন আছে সেগুলি এখনি উঠিয়ে না দিলে লক্ষ লক্ষ লোক দারিদ্র্যে এবং অনশনে তিল তিল করে মরে যাবে।

তিনি ঠিক করেছেন, ঠিক দৃঢ়তা এবং সুশৃঙ্খলার সহিত 'সত্যাগ্রহ' করে তিনি এক একটি করে অত্যাচারমূলক সমস্ত আইন উঠিয়ে দিতে সক্ষম হবেন; অনেক অন্যায় কর (tax) গভর্ণমেণ্ট তুলে দিতে বাধ্য হবেন।

আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হ'ল তিনি লবণ-শুল্কের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহের অভিযান সুরু করেছেন। গবর্ণমেণ্টের আইন সমুদ্রের ধারে বা নদীর ধারে যেখানে সহজেই লোকে লবণ তৈরী করতে পারে, সেখানেও কেউ যদি বিক্রী করবার জন্যে—এমন কি খাবার জন্যেও—লবণ তৈরী করে তাহলে তার শাস্তি হবে; অথচ এদিকে লবণের উপর গবর্ণমেণ্ট একটা নতুন কর বসিয়ে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে গরীবলোকে প্রয়োজনমত লবণ কিনে খেতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী এই অন্যায় রোধ করিবার জন্যে সবরমতীর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বাহাত্তরটি সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছেন। রোজ দশ মাইল করে হেঁটে তাঁরা ব্রোচ, কাঁয়রা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জালালপুর তালুক বলে একটি গ্রামে যাবেন, সেখানে গিয়ে সমুদ্রকূলে লবণ তৈরী করবেন। এই কাজে কত বিপদ আছে, তা তোমরা বুঝতে পারছ। প্রথমতঃ, তাঁরা রোজ পায়ে হেঁটে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছেন, নিয়মিত আহার নিদ্রা কিছুই নাই। তার ওপর জালালপুরে পৌঁছে তাঁরা যখন নুণ তৈরী করবেন তখন হয়ত পুলিশের লোকে তাঁদের প্রহার করবে, রক্তপাত করবে, জেলে দেবে, তবুও তিনি চলেছেন নির্ভীক পদবিক্ষেপে, দৃঢ় বিশ্বাসে; ভয় নেই, ক্লান্তি নেই! সমস্ত জগৎবাসীর সম্মুখে আজ তাঁর দৃঢ় পরীক্ষা। বিশ্ববাসী উন্মুক্তচিত্তে তাঁর এই অভিনব যুদ্ধ-যাত্রার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে। ১২ই মার্চ্চ ১৩৩০ সালটা জগতের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিনের শুভ প্রভাতেই তিনি তাঁর বাছা বাছা বাহাত্তরটি শিষ্যকে নিয়ে এই যাত্রা সুরু করেছেন একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে! এখনও তাঁরা চলেছেন। ব্রোচ, কায়রা, অঙ্কলেশ্বর প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে। জালালপুরে পৌঁছতে আরও চার পাঁচদিন লাগবে। অদ্ভুত কঠিন এই যুদ্ধযাত্রা! ফলাফল ভগবানের হাতে!

শ্রীনীরোদবিহারী সেনগুপ্ত

কুড়ালিয়া বা কাঠঠোকরা পাখীর কথা

[বাখরগঞ্জে কাঠঠোকরা পাখীকে কুড়ালিয়া বলে। তাহার সম্বন্ধে গল্পটি এই:—কুড়ালিয়া মায়ের রন্ধনের জন্য সর্ব্বদা কাঠ কাটিয়া আনিত। যে দিন সে বিবাহ করিয়া বরের বেশে বাড়ী ফিরিয়াছে, সেদিনও মা তাহাকে কাঠ কাটিতে আদেশ করেন। ইহাতে সে কুড়াল লইয়া বাহিরে গিয়া অভিমানে পাখী হইয়া চলিয়া যায়। তাহার কুড়ালখানা এখন তাহার মুখে, তাহা দিয়া সে সর্ব্বদাই কাঠ ফাঁড়িবার চেষ্টা করে।]

বড় গরীব বিধবা মা কষ্টে দিন যায়,
কাঠ কেটে আনে ছেলে তবে রাঁধে খায়।
রূপবান পুত্র তার বসে' বসে' ভাবে
দুঃখের দশা কত দিনে, কেমন করে' যাবে।
দূর গাঁয়ে, এক ধনী ছিল, দেবে মেয়ের বিয়ে;
ঘটকেরা খুঁজ্‌ছে বর নানান দেশে গিয়ে,
দেখ্‌তে পেলে যেতে যেতে বিধবার এই ছেলে,
বললে—"এমন গঠন, বরণ এক মানুষে মেলে?
কুমার-গড়া কার্ত্তিক হবে, প্রতিমা নিখুঁত,—
না, না, রক্ত মাংসেরি এ মানুষ মজবুত।
কুড়াল মারে, ফাঁড়ে কাঠ, গায়ে রাখে বল,
এরে নিয়ে দেখাই গিয়ে। চল্ বাবাজী চল্।"
"গরীব আমি কোথায় যাব?"—সুধায় ছেলে সেই।
"বিয়ে যদি কর আর কোন ভাবনা নেই।
অনেক হবে টাকা কড়ি, পাবে বাড়ী ঘর,
শ্বশুর যদি হয় তোমার গোলক সদাগর।"
সুঠাম তার সবল দেহ দেখেই সদাগর
খুসী হয়ে করলেন তাকে আপন মেয়ের বর।
বিয়ে করে এল ফিরে, মাথায় সোনার ছাতি
সঙ্গে লয়ে লোক লস্কর, কত ঘোড়া হাতী।
খানিক দূরে রেখে সব, বৌয়ের হাতটি ধরে'
হেঁটে চল্‌ল মায়ের কাছে, মাথা নীচু করে'
পায়ের ধূলা শিরে লয়ে বল্‌ল হাসি-মুখে,
"অনেক খাটনি গেছে, মাগো, এবার রবে সুখে;

বউ এনেছি ক'রবে সেবা, তুমি বসে' রবে ,—
বলে বুড়ী—"আজকের মত রান্না কিসে হবে ?
চটকরে যাও কুড়ুল নিয়ে ; কাঠ তো কিছু চাই,
হাঁড়ি যে চড়েনি আজ, বৌকে কি খাওয়াই ?"
মায়ের আজ্ঞা—হাতে কুড়াল বিয়ের টোপর শিরে,
বাহির হ'ল। লোক লস্কর দাঁড়িয়ে কুঁড়ে৷ ঘিরে।
হঠাৎ এল লজ্জা আর বিষম অভিমান
মায়ের উপর ; আজকের দিনও কাঠ কাটাতে চান !
হাতের কুড়াল কামড়ে দাঁতে উড়ে বসল গাছে,
শ্বশুরবাড়ীর লোকলস্কর চিনে ফেলে পাছে।
বুদ্ধির ভুলে আপন ভাগ্যে জোরে দিল গাল,
সে দিন থেকে কুড়ালিয়া গাছে কাটায় কাল—
বিয়ের টোপর মাথায়, আর মুখেতে কুড়াল।

শ্রীকামিনী রায়

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন।

১। আগামী বৈশাখ মাস হইতে "মুকুল" নূতন সাজে বিবিধ মনোরম প্রবন্ধ, মজার মজার গল্প ভ্রমণ-কাহিনী, কবিতা, ধাঁধা ও চিত্রে শোভিত হইয়া প্রতিমাসের ৭ই তারিখ নিয়মিত রূপে বাহির হইবে।

২। বৈশাখ মাস হইতে শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, মুকুলের সম্পাদনভার গ্রহণ করিবেন ও বাঙ্গালা দেশের অনেক বিখ্যাত লেখক ও লেখিকা মুকুলে লিখিবেন।

৩। মুকুলের গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের লেখাও মুকুলে বাহির হইবে। তাহাদের রচনার প্রতিযোগিতা হইবে ও শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

৪। ১৩৩১ সনের মুকুলের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা নীচের ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে বৈশাখ মাস মধ্যেই পাঠাইতে হইবে। বৈশাখ মাস মধ্যে মূল্য না পাইলে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মুকুল ভি পি ডাকে পাঠান, হইবে। আগামী বৎসরে যাহারা মুকুল রাখিতে চাহেন না, তাহারা বৈশাখ মাস মধ্যেই আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইবেন। নতুবা জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকা ভি পি-তে যাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
"মুকুল" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯৪ দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।